সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি

প্রাচীন মায়াপুর ॥ নবদ্বীপ

সম্পাদনা

তাপস বসু

বরুণ সাহা

প্রকাশক □
রামনারায়ণ ঘোষ
সম্পাদক,
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি
প্রাচীন মায়াপুর । নবদ্বীপ । নদীয়া

প্রকাশকাল □
পৌষ, ১৩৯৪
ডিসেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ শিল্পী □
অমিয় ভট্টাচার্য

অলংকরণ □
তপনকুমার ভট্টাচার্য

মুদ্রণালয় □
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২, বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

ব্লক মুদ্রণ □
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
কলকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

সূচীপত্র

□ প্রসঙ্গ ঃ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

□ প্রসঙ্গ ঃ স্বামী বিবেকানন্দ

□ আশ্রমিকী

□ চিত্র সূচী

□ প্রচ্ছদ পরিচিতি

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব একই অনন্ত থেকে এবং তা একই সূত্রে গ্রথিত। দুটি পদ্মের মধ্য দিয়ে সেই কথাই প্রকাশিত। এঁদের দু'জনের ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি। তাই পদ্মের উপরেই তাই আশ্রমের অবস্থান। এই সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি প্রসঙ্গটি সমগ্র পটে স্বর্ণাভচ্ছটার প্রলেপ।

সম্পাদকীয়

দু-পাঁচ, দশ নয়, পঞ্চাশ ; পঞ্চাশটি বছর সার্থক অস্তিত্বে অতিক্রান্ত হল নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির। একটি প্রতিষ্ঠান যখন অর্ধশতাব্দী সময়কাল অতিক্রম করে তখন আমাদের পিছন ফিরে তাকাতেই হয়, পূর্বসূরীদের ভাবনা-চিন্তার উৎসে পৌঁছে তার অস্তিত্ব চোখের মণির মত আগলে আগামী দিনের জন্যে যত্নে, পরিশ্রমে অযুত নিষ্ঠায়, প্রশস্ত পথ তৈরী করতেই হয়, শতফুলের বিকশিত রূপটি বহুজন প্রত্যক্ষ করবে বলে, আপন অনুভবকে প্রসারিত করতে হয় সেই কর্ষণভূমিতে যা সমগ্রতাকে আপন লালিত্যে স্থান দেয়, শক্তি যোগায়, সাহসী করে, নব নব সৃষ্টির উল্লাসে যুক্ত করে, সর্বোপরি আত্মায় আত্মা যোগ করতে শেখায়।

তাই আমরা পিছন ফিরে উৎসে পৌঁছতে চেয়েছি। নবদ্বীপের আর্দ্র-পেলব মাটিতে যাঁর চরণচিহ্ন আজও মুক্তির চিহ্ন হয়ে আছে দৃপ্তভাবে ; সে মুক্তি সংস্কারের অচলায়তন থেকে মুক্তি, অ-ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে মুক্তি, বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, অমানবিক, অনৈতিক চেতনা থেকে মুক্তি। আত্মায় আত্মা যোগ করার পরিপন্থী থেকে মুক্তি। শ্রীচৈতন্য মুক্তিপথের প্রথম হদিশ দিয়েছিলেন নবদ্বীপে ; আজ তা বিশ্বে সম্প্রসারিত। সেই সম্প্রসারণে আধুনিক কালের সহস্রধারার সংকট মোচনে যুগোপযোগী মাত্রা যুক্ত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে-দেশান্তরে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ চর্চা ব্যাপ্তি লাভ করেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এই চর্চার পুরোভাগে আছে। এছাড়া অগণিত প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চা-চর্যায় ব্যাপৃত। মানুষকে সুস্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ; সকলের মধ্যে ঈশ্বরানুভবে শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ বাস্তবায়িত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করে চলেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি সেই প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রীচৈতন্যের পুণ্য জন্মভূমি নবদ্বীপের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। শ্রীরামকৃষ্ণ এই নবদ্বীপেই সশরীরে উপস্থিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রগাঢ় অনুভবের শিখরে পৌঁছে সম্মিলিত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে । পুঁথিপত্রে এই কাহিনী শুধু সীমায়িত হয়ে থাকতে পারে না ; সব মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী মেলে ধরে চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের সমন্বিত রূপটি তুলে ধরতে হাতে হাত মিলিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নির্দেশ শিরোধার্য করে, শিবজ্ঞানে জীব সেবা, মানুষের আত্মিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সমিতি। কাগজে-কলমে, কিছু নাম আর ভাবী পরিকল্পনায় থেমে থাকেনি এই সমিতি। মন্দির তৈরী হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিত্য পূজার্চনার মধ্য দিয়ে, নানা কার্যসূচী রূপায়ণের দ্রুত অগ্রগতিও ঘটেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে নানা কর্মসূচীর মধ্যে মননঋদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ ছিল অন্যতম। আজ সেই স্মরণিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। এই স্মরণিকায়

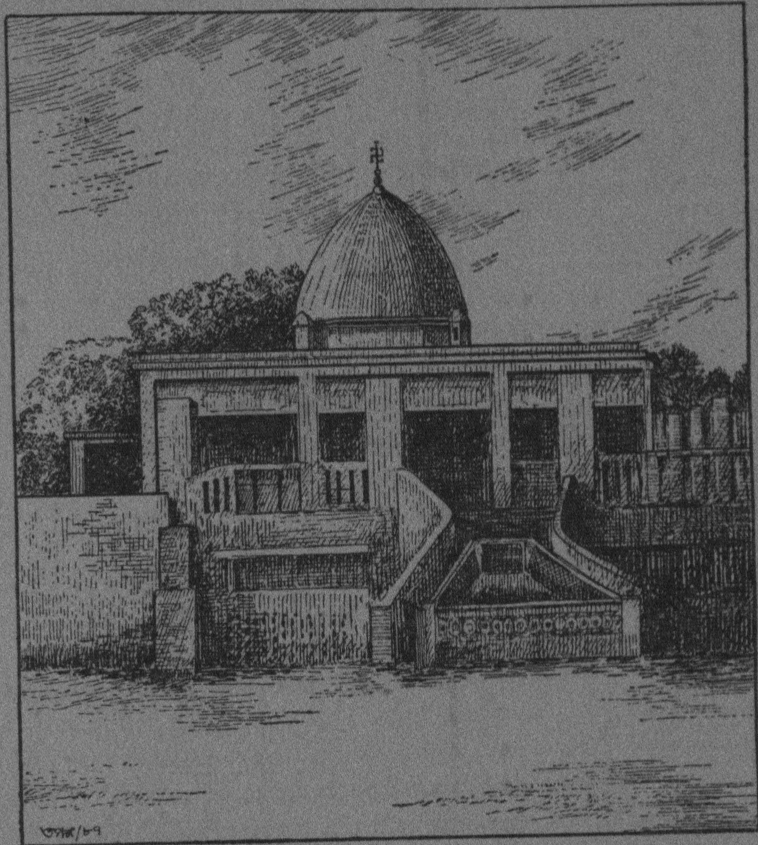
নবদ্বীপের ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বিত রূপ, স্বামী বিবেকানন্দ চর্চার প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিভাগে বিদগ্ধ জনেরা, পূজনীয় সন্ন্যাসীবৃন্দের চিন্তাশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হল। এই স্মরণিকার প্রকাশ বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের অনুমতি-ক্রমে একটি প্রবন্ধের পুনঃপ্রকাশে ; এবং পূজনীয় সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণীতে।

এই মননঋদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দুজন নবীন সন্ন্যাসী-শ্রীমৎ স্বামী অনঘানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজের নিরলস প্রয়াস, পল্লবিত সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাছে আমরা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ! স্মরণিকা প্রকাশের নানা স্তরে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতার পুস্তক বিপণি প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার, যুগান্তর পত্রিকার তরুণ শিল্পী শ্রীতপনকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীস্বপন কুমার কয়াল, শ্রী বিশ্বনাথ মণ্ডল শিবদুর্গা প্রেসের নবীন কর্ণধার শ্রীনারায়ণ ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম শিল্পী শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের কাছেও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, নির্দ্বিধায় সমস্ত কাজ, ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে মননঋদ্ধ প্রবন্ধগুলি লিখে দিয়েছেন, নানা পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন—তাঁদের কাছেও আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই পঞ্চাশ বছরে যাঁদের আমরা হারিয়েছি, তাঁদের স্মরণ করছি অন্তরের উৎস থেকে উৎসারিত অনুভবে-অনুভাবে।

পরিশেষে যে কথাটি বলতেই হবে—তা হল, এ ধরনের মননঋদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশে যে প্রস্তুতি, সময়, সম্মিলিত প্রয়াস, লোকবল ও পর্যাপ্ত অর্থবলের প্রয়োজন তা আমাদের কখনই ছিল না। এই সব নানা অসুবিধের মধ্যে, স্বল্প সময়ে এই স্মরণিকা প্রকাশের সামগ্রিক কাজ করতে হয়েছে। তার উপর ছিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছাপাখানা ধর্মঘটের আশংকা। স্বভাবতই আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও ঐ সব কারণে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ, ছোটখাটো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেল। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এসব সত্ত্বেও সুধীবৃন্দের কাছে এই স্মরণিকা গ্রহণযোগ্য হবে এই আশা আমরা অবশ্যই করতে পারি!

শ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৫তম জন্মতিথি
২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪
১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

বিনীত
তাপস বসু
বরুণ সাহা



□ আশীর্বাণী,
প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক পরিচয়

সেবার মর্মকথা

স্বামী গম্ভীরানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

[এই প্রবন্ধটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের 'ক: পন্থা:' নামক গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্তকরণের মধ্য দিয়ে গৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে পরম পূজ্যপাদ মহারাজ যে অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন—তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নবদ্বীপের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি। ১৯৩৬এ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকীতে রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে সেবামূলক কাজের উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিতে পরম পূজ্যপাদ মহারাজের প্রবন্ধটি আমরা তাঁর অনুমতিক্রমে আশীর্বাণীরূপেই পুনঃপ্রকাশ করলাম।]

ক্রমবিকাশবাদীদের অভিমত—প্রাণিজগতের উন্নতি হয় বেঁচে থাকার জন্যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভেতর দিয়ে এবং যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—ঠিক তা নয়, প্রেমের ভেতর দিয়েই মানুষ এগিয়ে যায়; প্রেমের বন্ধনে সমাজ একত্র হয়ে আছে এবং প্রেমকে অবলম্বন ক'রেই সমাজের অগ্রগতি হচ্ছে। তিনি বললেন—'প্রেম, প্রেম—এই মাত্র ধন।' বললেন—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

এই ভাবধারা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদ প্রান্তে ব'সে। দু-একটি ঘটনা বললে আপনারা বিষয়টি বুঝতে পারবেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে—'তুই কি চাস্?' নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আমি নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই। তারপর শরীররক্ষার জন্যে খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যেতে চাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট না হয়ে বলেছিলেন—'ছিঃ ছিঃ, তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, তুই তো একটা মস্ত বড় বট গাছের মতো বেড়ে উঠবি, যার তলায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে তুই কিনা স্বার্থপর হয়ে শুধু নিজের মুক্তি চাস্।' মানুষের প্রতি তাঁর বুকভরা দরদ—যা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে পেয়ে কাজে পরিণত করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিয়েছেন শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্থদর্শনে। গিয়ে উপস্থিত হলেন দেওঘরের কাছে। গরিব লোকেরা সেখানে—খেতে পায় না, পরতে পায় না, জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা, উসকো-খুসকো চুল। তাদের দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—'এদের একমাথা

ক'রে তেল দাও, একখানা ক'রে নতুন কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে খাইয়ে দাও।' মথুরবাবু বিষয়ীলোক। শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন—'বাবা, এদের সংখ্যা ত নেহাত কম নয়। এত টাকা যদি এখানে খরচ করি, তা হ'লে তীর্থদর্শন হবে কি ক'রে?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তোর কাশী আমি যাবো না, আমি এদের কাছেই থাকবো। এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাবো না।'

কথাটা ভেবে দেখতে হবে। কথাটা শ্রীরামকৃষ্ণের, যিনি মৃণ্ময়ী দেবীতে চিন্ময়ীকে দর্শন করেছিলেন এবং হাতে-নাতে দেখিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুরা পৌত্তলিক নয়, তারা প্রতিমাকে পুজো করে না, প্রতিমাতে ভগবানকেই পুজো করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি এটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন বলেই হিন্দুধর্ম আজও বেঁচে আছে।

জীবকল্যাণের এই পথই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসরণ করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই পথ অবলম্বন ক'রে জগতের কল্যাণসাধন করতে। অবশ্য প্রচলিত কথা হিসাবেই আমরা বলছি, 'জগতের কল্যাণসাধন'। কিন্তু ঠাকুরের ভাব ছিল অন্য রকম।

বাস্তবিক জগতের উপকার করতে পারেন একমাত্র ভগবান। তবে আমরা কি করতে পারি? আমরা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে পারি। একথা স্বামীজী শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন একটা বিশেষ ধর্মমতের কথা তুলে বলেছিলেন, ঐ মতে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে—জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন। 'নামে রুচি' ঠিক বুঝলেন, 'বৈষ্ণবসেবন' ঠিক বুঝলেন, কিন্তু 'জীবে দয়া' বলতেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন—'জীবে দয়া—জীবে দয়া? কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না—না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

দয়া মানে কি? আমি বড় আর তুমি ছোট। আমার দেবার মতো কিছু আছে, আমি দিচ্ছি, তুমি নতমস্তকে গ্রহণ করো এবং চিরজীবন আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকো। এই হ'ল দয়ার ভেতরের ভাব। ঠাকুর বললেন, 'না, না—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। এরা সব শিব, এরা সব নারায়ণ। এই নারায়ণবুদ্ধিতে, এই শিববুদ্ধিতে এদের সেবা করতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে স্বামীজী—তখন নরেন্দ্রনাথ—সেবার নিগূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং এই সেবাদর্শ রূপায়িত করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। সারা ভারত তিনি ঘুরেছিলেন। পথ খুঁজে তিনি পাননি। অবশেষে কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষ সপ্তাহে, হয়তো বা যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে, ব'সে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। সত্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'ল। তিনি জানলেন—ভারতের উন্নতি ততদিন কিছুতেই হতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত না জনগণের জাগরণ হয়—যত দিন পর্যন্ত না তাদের উন্নতি হয়। কিন্তু সে উন্নতি হবে ধর্মের ভেতর দিয়ে—ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়।

তারপর স্বামীজী পাশ্চাত্যে গেলেন অদ্বৈত-বেদান্তের বার্তা বহন ক'রে। ওদেশে আধ্যাত্মিকতার অভাব। সে অভাব পূরণ ক'রে বিনিময়ে যদি কিছু পাওয়া যায়, তাই দিয়ে ভারতবর্ষের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল, ভারতেও উন্নতির বীজ উপ্ত হয়েছিল তাঁর চেষ্টায়।

এদেশে সন্ন্যাসীরা বনে-জঙ্গলে পর্বতে সাধনা করেছেন নিজেদের মুক্তির জন্যে। পরের সেবাতে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেননি—অবশ্য সব সময়ে নয়। কেননা আমরা জানি বৌদ্ধসমাজে সেবাব্রত প্রচলিত ছিল। আপনারা জানেন বাসবদত্তাকে সেবা করেছিলেন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কিন্তু অতীত যুগের সেকথা আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল। স্বামীজী সেই সেবাব্রত পুনরুজ্জীবিত করলেন।

স্বামীজী বললেন—এই সেবাব্রত গ্রহণ করতে হবে সন্ন্যাসীদের। শুধু নিজের মুক্তির জন্যে নয়, পরের কল্যাণের জন্যেও এবং তাতে নিজেরও মুক্তি সহজ হয়ে যাবে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং

জগদ্ধিতায় চ'—এই ছিল তাঁর মন্ত্র। পরকে পর ভেবে তার কল্যাণ করা নয়—আমি পূজো করছি পরকে নারায়ণ ভেবে। বস্তুতঃ তখন আর পর ব'লে কেউ নেই—মানুষরূপে ভগবানই রয়েছেন সামনে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজো হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হয় না!' আমরা ভগবতীর পূজো ক'রে থাকি কুমারীতে। আমরা জানি, গৃহস্থ যাঁরা ভক্তিমান, তাঁরা এ সমস্ত বিশ্বাস করেন—তাঁরা পতি ও পত্নীকে শিব ও শক্তিরূপে ধারণা ক'রে থাকেন। একটা ধর্মভাব নিয়ে আসেন জীবনে। তেমনি ভাবে, আমরা অপরের সেবা করি একটি ধর্মভাব অবলম্বন ক'রে—ভগবানকে অবলম্বন ক'রে। আমরা ভাবি নারায়ণ আমাদের সামনে উপস্থিত, আমাদের সেবা নেবার জন্যে। যার যা অভাব আছে যে ক্ষেত্রে হোক না কেন—বিদ্যার অভাব হোক, শারীরিক অভাব হোক, আধ্যাত্মিক অভাব হোক সব রকমের অভাব মেটাবার জন্যে আমাদের প্রযত্ন করতে হবে। আমরা তা-ই করে চলেছি—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন 'জীবে দয়া' প্রসঙ্গে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেছিলেন, সেদিন সেই কথা শুনে স্বামী বিবেকানন্দ—(তখন নরেন্দ্রনাথ) বলেছিলেন, 'আজকে একটা নতুন কথা শুনেছি, যদি ভগবান দিন দেন, তবে আমি কাজে পরিণত ক'রে দেখাব এটি। আর এরই ভেতর আমি সমন্বয় দেখছি সমস্ত সাধনপথের। কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ রাজযোগ বা ধ্যানযোগ—সব এখানে সম্মিলিত হচ্ছে।'

স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবধারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে ব'সে লাভ করেছিলেন, তা-ই তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। এখানে একটি কথা বিশেষ ক'রে বলা দরকার। স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ ক'রে, তার নিয়মাবলী রচনা ক'রে আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন কাজে নামতে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুটি কথা বলেছিলেন—'তোমরা রাজনীতির সঙ্গে কখনো জড়িত হবে না এবং সমাজ সংস্কারে কখনো যাবে না।'

স্বামীজীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সমাজের সেবা করে যাই। রাজনীতিকে আমরা অবজ্ঞা করি না, সমাজ-সংস্কারকে অবহেলা করি না। প্রয়োজন প্রত্যেকটিরই আছে। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতাবলীতে কত কথা ব'লে গেছেন, কত দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়ে গেছেন—কোন্ দিকে গেলে দেশের মঙ্গল হবে। কিন্তু আমরা যারা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভেতর দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, আমরা কখনো রাজনীতিতে জড়িত হতে চাই না, আমরা কখনো সমাজ-সংস্কারে যেতে চাই না। আমাদের সন্ন্যাসীরা কেউ কখনো ভোট দিতে যান না অথবা কোন পার্টির হয়ে প্রচার করতে যান না।

স্বামীজী এই বার্তা দিয়ে গেছেন, বাণী দিয়ে গেছেন, পথ আমাদের নির্দেশ ক'রে গেছেন। আমরা চেষ্টা করছি তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে। এই পথকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং কাজ চলেছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা কম হতে পারে, কিন্তু এতে আমাদের প্রাণের টান আছে। আমরা চাই, কাজটা ভালভাবে হোক। ভগবানের দেওয়া যে কাজ আমাদের উপরে পড়েছে, আমরা চাই তা যেন ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হয়, যাতে সেবার একটা model বা আদর্শ দেখে অন্যেরাও নানা জায়গায় নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে এবং সমাজের ও জগতের সত্যিকার কল্যাণ হয়। □

Phone : *35-2928 & 36-6000*

RAMAKRISHNA YOGODYAN MATH
7, YOGODYAN LANE, KANKURGACHHI
CALCUTTA-700 054
INDIA

৮. ৮. ৮৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ, সুবর্ণজয়ন্তী বৎসর সমাপ্ত করেছে গত বছর ঐ বৎসরটিকে স্মরণীয় করার জন্য একটি স্মরণিকা প্রকাশ হবে জেনে সুখী হলাম।

আধ্যাত্মিক নবজাগরণের পীঠস্থান এই নবদ্বীপ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীহরির নাম প্রচার করে ধর্মের বন্যায় এই স্থানকে ভাসিয়ে ছিলেন। সেই পুণ্যভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে একটি আশ্রম দীর্ঘদিন থেকে ধর্মের এই ভাবটিকে ভক্তগণের মধ্যে প্রচার করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আশা করি এই আশ্রম থেকে প্রকাশিতব্য স্মরণিকাটি সকল স্তরের জনসাধারণের মধ্যে এই ভাবটিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে।

আমি স্মরণিকা প্রকাশনের সম্পূর্ণ সাফল্য শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করি।

স্বামী ভূতেশানন্দ

সহাধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

সম্পাদক
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি
প্রাচীন মায়াপুর
নবদ্বীপ, নদীয়া।

RAMAKRISHNA MATH
P. O. BELUR MATH, DT. HOWRAH
WEST BENGAL 711 202

Headquaters
Phone-66-2391

২১. ৭. ৮৭

নবদ্বীপে প্রাচীন মায়াপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে উক্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ একটি "সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা" প্রকাশে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়েছেন জেনে আনন্দিত হলাম। আশা করি এই স্মরণিকা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্বারা সুসমৃদ্ধ হবে।

উদ্যোক্তাদের এই শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে এই প্রার্থনা করি।

ইতি—
শুভাকাঙ্ক্ষী,

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন

সম্পাদক
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি
নবদ্বীপ, নদীয়া।

□ কুমুদ নাথ মল্লিক

নদীয়ার অন্যতম প্রাচীন মল্লিক পরিবারের সন্তান। নদীয়া জেলার ইতিহাসকার। নদীয়া জেলার ইতিহাস—'নদীয়া কাহিনী' গ্রন্থের রচয়িতা। নবদ্বীপের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে 'নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধটিতে। প্রয়াত লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ—'হজরত মহম্মদ', 'শ্রীগৌরাঙ্গ', 'সতীদাহ', 'শ্রীচৈতন্য', 'মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র'।

□ ড. সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে নবদ্বীপে। বৈষ্ণবসমাজ-সাহিত্য, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। আলোচ্য প্রবন্ধে বিতর্কিত শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান সম্পর্কে নানা তথ্য উপস্থাপনায় চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান নির্দেশিত হয়েছে।

□ ড. জয়গুরু গোস্বামী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ। শৈশব, কৈশোর নবদ্বীপে অতিবাহিত করেছেন। নবদ্বীপের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকতা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত 'ভাগবত শাস্ত্রী' সহ অন্যান্য উপাধির অধিকারী। 'স্বভাবকবি গোবিন্দদাস', 'চারণ কবি মুকুন্দদাস' সহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে জনজীবন, জনরুচি, সামাজিক রীতিনীতি কেমন ছিল তা নিয়েই লেখা হয়েছে 'শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক নবদ্বীপের জীবনচর্যা' প্রবন্ধটি।

□ মিহিরকান্তি রায়

নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্কের সম্পাদক। শ্রীহট্ট জেলার অনুসন্ধিৎসু গবেষক। বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত। 'সাহিত্য-সঞ্চয়ন', ও 'গৌড়ীয় বৈষ্ণববাণী' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদেরা নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করে যেসব মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন তা নিয়েই লেখা হয়েছে আলোচ্য নিবন্ধটি।

□ ড. স্বপন বসু

হুগলী মহসীন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট গবেষক। 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', 'সতী', 'গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। ন্যায়-চর্চার অন্যতম পীঠস্থান নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ উনবিংশ শতাব্দীতে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিয়েই লেখা হয়েছে 'উনিশ শতকের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ' প্রবন্ধটি।

□ জ্ঞানাঙ্কুর গোস্বামী

বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক। শৈশব, যৌবন অতিবাহিত করেছেন নবদ্বীপে। বাংলা ও সংস্কৃত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষক। সাম্প্রতিক কালের নবদ্বীপের জনজীবন, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখেছেন 'সাম্প্রতিক নবদ্বীপ : একটি পরিক্রমা' প্রবন্ধটি

□ কৃষ্ণকুমার পাল চৌধুরী

প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীহট্ট মদন মোহন কলেজ। বাংলাদেশ ড. কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন, বাংলাদেশ সরকার গঠিত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। Modern functional English, 'পথের সন্ধান', 'সসীমে অসীমে,' সৈনিক জীবন কথা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মমতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা 'শ্রীচৈতন্য নির্দেশিত মত ও পথ' প্রবন্ধটিতে স্থান পেয়েছে।

□ স্বামী বিমলাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরুণ সন্ন্যাসী। বর্তমানে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশন প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ বিষয়ে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রচয়িতা। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসজীবন ও সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রীচৈতন্যের নানা নির্দেশ—শ্রীচৈতন্যের অনালোচিত এই বিষয়টি নিয়েই আলোচ্য প্রবন্ধ 'সন্ন্যাসীর আদর্শ : শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'।

□ ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। বিশিষ্ট গবেষক। 'হিন্দু দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', (তিন খণ্ড) গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। সংস্কৃত বাংলা ও ইতিহাসে তাঁর পাণ্ডিত্য সুবিদিত। প্রকাশিত গ্রন্থ—'যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তার সম্প্রদায়', 'রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্যপ্রভাব', 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ধারা,' 'বাংলা নাট্য সাহিত্য পরিচয়,' 'যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,' রবীন্দ্র সাহিত্যাবিধান (দু-খণ্ড) 'মন্দির ত্যাজি যব' (উপন্যাস) 'সিন্ধু তরঙ্গ' (উপন্যাস)। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীচৈতন্য কিভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন সে বিষয়ে তথ্যমূলক মননঋদ্ধ প্রবন্ধ 'শ্রীচৈতন্যের ভারত পরিক্রমা'।

□ সাধনচন্দ্র সামুই

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ ও পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে নবদ্বীপের হিন্দু স্কুলের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম শিক্ষক। 'শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য' প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্য কিরূপে, কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

□ পরিমল কান্তি দাস

নির্বাহী বাস্তুকার। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন সহ রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত নানা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ উপদেষ্টা। সাহিত্য জিজ্ঞাসু মন নিয়ে 'উদ্বোধন', 'বিশ্ববাণী' ইত্যাদি পত্রিকায় নানা সময় প্রবন্ধ লিখেছেন। 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য' কিভাবে প্রকাশিত হয়েছেন সে বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি।

□ সাহাজাদা শেখ

নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। মুসলমান সমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব, মুসলমান ভক্তদের কাছে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে।

□ ড. অরুণা চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহ্যপূর্ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক। শ্রীচৈতন্যজীবনে লক্ষ্মীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভূমিকা নিরূপণ করার প্রয়াস—'শ্রীচৈতন্য জীবনে দুই নারী' প্রবন্ধটি।

□ ড. সবিতা মিশ্র

কলকাতা বেথুন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা। শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক কালের নারীসমাজ সম্পর্কে লেখা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি।

□ ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ও প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। আগরতলাস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কেন্দ্রের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ-কালীন অধ্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। বাংলাদেশের সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্যের অবদান কতটা যুগান্তকারী তা নিয়েই আলোচ্য নিবন্ধ 'বাংলা সমাজ-সাহিত্য সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্য'।

❑ স্বামী গহনানন্দ

সহঃ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। বিশিষ্ট আলোচক বর্তমান সমস্যা জর্জরিত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সমাজকে কিভাবে আলোকিত করতে পারে সেই বিষয়ের আন্তরিক আলোচনা 'বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী'।

❑ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটুট অব্‌ কালচারের সম্পাদক। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সম্পাদক। বিশিষ্ট আলোচক ও প্রাবন্ধিক। সম্পাদিত গ্রন্থ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ', 'শতরূপে সারদা', world thinkers on Ramakrishna—Vivekananda ইত্যাদি। 'তব কথামৃতম্‌' গ্রন্থের প্রণেতা। শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন 'সারদাদেবী' নিবন্ধটি।

❑ ড. সচ্চিদানন্দ ধর

জঙ্গীপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। নেতাজী ইন্‌স্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো। আমদের প্রতিদিনের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভুমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ সরল ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ 'দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ।'

❑ প্রেমবল্লভ সেন

কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। বিশিষ্ট আলোচক। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগান্তকারী আবির্ভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন—'ইতিহাসের আলোক শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটিতে।

প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক পরিচয়

❑ ড. সুভাষ বন্দোপাধ্যায়

সচিব, কলা ও বাণিজ্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। লোকসাহিত্যের গবেষক এবং লোকসাহিতা বিষয়ক নানা গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সাম্প্রতিক কালে কতটা তাৎপর্যবাহী সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর তাৎপর্য" প্রবন্ধটিতে।

❑ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'প্রসঙ্গ অলংকার', 'বাংলা কবিতার আধুনিকতা ও শব্দানুষঙ্গ', 'সুধীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' (সম্পাদিত) 'অভিপ্রেত শব্দের নাম' (কাব্য) ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ চর্চা কিভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে সে বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে 'প্রণাম আনিল টানি' প্রবন্ধটি।

❑ সুদীপ বসু

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতোকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা সংকট মোচনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভুমিকা সম্পর্কে তারুণ্যদীপ্ত প্রবন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ 'আন্তর্জাতিক সংকট ও ঃ সমাধান' প্রবন্ধটি

❑ রামনারায়ণ ঘোষ

নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষার শিক্ষক। সম্পাদক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, নবদ্বীপ। অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার সহজ সরল মূল্যায়ন করা হয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ পার্ষদদের দৃষ্টিতে' প্রবন্ধটিতে।

❑ সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ, বেথুন কলেজ। সম্পাদিকা 'নিবেদিতা ব্রতী সংঘ' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষক। নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা 'নিবেদিতা মানসে শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি।

☐ ড. বন্দিতা ভট্টাচার্য

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, লেডি ব্রেবোন কলেজ, কলকাতা। শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের নানা ঘটনার উল্লেখে লেখা প্রবন্ধটিতে শ্রীমা সারদাদেবীর স্বরূপটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

☐ নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থের প্রণেতা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—An Introduction to Sweet's Anglo Saxon primer, An introduction to Shakesperarean Studieo. 'ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি।

☐ ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক। মোহিতলালের কবিতা, নাট্যতত্ত্ব নাট্যমঞ্চ ও বাংলা নাটক—ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সাযুজ্যের ছবিটি তুলে ধরেছেন 'শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে।

☐ ড. অসিত সরকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অজৈব রসায়ন বিভাগের রীডার। শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের অনেকটা সময় নবদ্বীপে অতিবাহিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই সত্তার ভিন্ন প্রকাশ এবং যুগ প্রয়োজনে তাঁদের আবির্ভাব —'শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নিবন্ধে সেই কথাই তুলে ধরেছেন।

☐ বরুণ সাহা

নবদ্বীপ জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজী ও জীব-বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক। শৈশব থেকেই নবদ্বীপের জল-হাওয়ায়, ধর্ম, সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বিত রূপটি 'সমন্বয় সাধক শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন।

☐ সরস্বতী মিশ্র

সহঃ গ্রন্থাগারিক, হুগলী মহসীন কলেজ। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও সারদাদেবীর জীবন নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে 'বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও সারদাদেবী' প্রবন্ধে।

☐ ড. তাপস বসু

কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের তরুণ অধ্যাপক। সাহিত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক, গবেষক। সম্পাদক, জীবনানন্দ কবিতা আকাদেমী, কলকাতা। ডিরেক্টর, বিবেকানন্দ ইনসটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েনস, কলকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ—'ভাঙনের থিয়েটার', 'সমকালীন ভাবনাক্রম ও জীবনানন্দ' (সম্পাদিত) অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' (কাব্যগ্রন্থ) বিশ্ব মনীষায় শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান নিরূপণের তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ 'ভুবনজোড়া আসনখানি।'

☐ স্বামী আত্মস্থানন্দ

সহঃ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আলোচক। বর্তমান সমস্যা জর্জরিত ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দকে কেন প্রয়োজন সেই বিষয় নিয়ে রচিত 'আধুনিক ভারতবর্ষের সংকট সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজনীয়তা' প্রবন্ধটি।

□ স্বামী প্রভানন্দ

সহঃ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক, প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ—সমূহ 'আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা' (২ খণ্ড), First meetting with Sri Ramakrishna ইত্যাদি। যুবকদের কাছে দেশ গঠনে, দারিদ্র্য মোচনে, শিক্ষা সম্প্রারণে 'স্বামীজীর আহ্বান' নিয়ে রচিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি।

□ শঙ্করীপ্রসাদ বসু

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। ভারত বিখ্যাত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক—আলোচক। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', (১-৬ খণ্ড) গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। এছাড়া বিবেকানন্দ পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। প্রকাশিত অন্যান্যউল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ—'নিবেদিতা লোকমাতা'—(১-২ খণ্ড), 'আমাদের নিবেদিতা' 'সমুদ্রের উর্বশী', 'সহাস্য বিবেকানন্দ', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' 'ভারতচন্দ্র,' 'লালবল লারউড', 'ক্রিকেট অমনিবাস,'—ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতবর্ষ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে বিষয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ 'স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতবর্ষ।'

□ স্বামী ঈশাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরুণ সন্ন্যাসী। বর্তমানে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে যুক্ত। যুব জাগরণের স্বামী বিবেকানন্দের দৃপ্ত ভূমিকার কথা নানা তথ্য সহযোগে আলোচিত হয়েছে 'যুবজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে।

□ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রকাশিত বাংলা মাসিক পত্রিকা, 'উদ্বোধন' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক-আলোচক। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শের রূপটি নিয়েই মনোজ্ঞ প্রবন্ধ 'স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘ ও মানবসেবা।'

□ স্বামী অনঘানন্দ

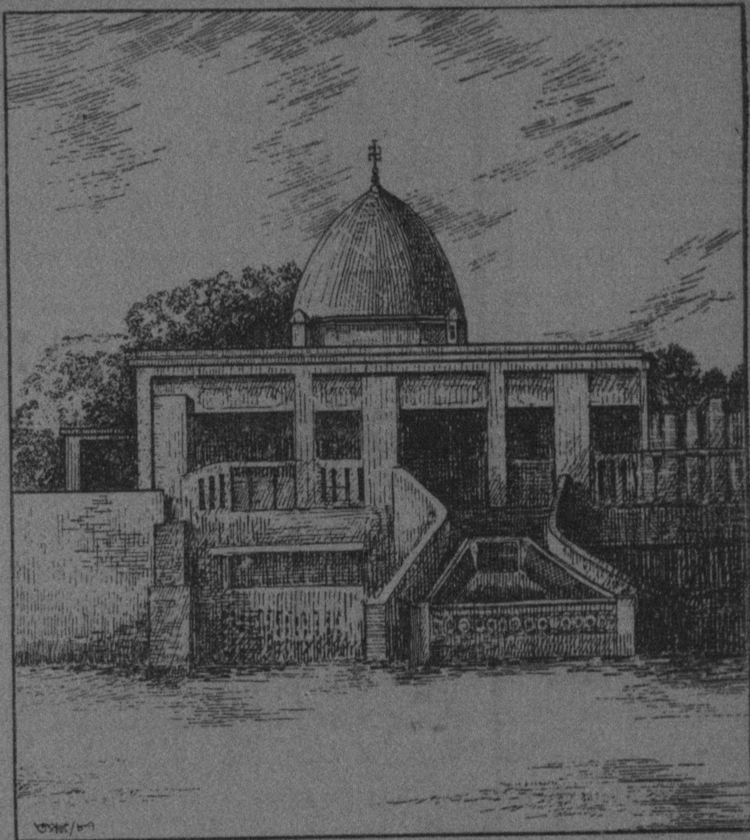
মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

□ প্রশান্ত সিংহ

জঙ্গীপুর মহকুমার সরকারী অভিশংসক। সম্পাদক, জঙ্গীপুর রামকৃষ্ণ বিবেকনেন্দ সেবা কেন্দ্র। বিবেকানন্দের চিন্তায় নারী কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়টির সঙ্গে আধুনিক কালে আইনের ধারা ও নারী সমাজের দুর্ভোগের স্বরূপটি আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন নানা দৃষ্টান্ত সহ।

□ গৌরগোপাল সাহা

দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজে যুক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই যুক্ত। বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ও সাম্প্রতিক কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন সংশ্লিষ্ট রচনাটিতে।



□ প্রসঙ্গ ঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত

কুমুদনাথ মল্লিক

নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসংগে বর্তমান গ্রামখানি যাহা এক্ষণে নবদ্বীপ নামে পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ কি না, এবং তাহা না হইলে ঐ প্রাচীন নবদ্বীপের স্থানই বা কোথায়, এবং স্থান সম্বন্ধে কোনও পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলে, তাহাই বা কবে হইয়াছে, অথবা আদৌ ঐরূপ কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে বহুদিন হইতে বহু বাদানুবাদ হইলেও এ সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত সত্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে স্থূলতঃ আদি নবদ্বীপের যে বহুবার স্থান পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং কিছুদিন পূর্বেও যে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান গুলি গঙ্গার পূর্বকূলে স্থাপিত ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি পাশ্চাত্য জাতীয়গণের অঙ্কিত নানা ভাষায় লিখিত মানচিত্রেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নবদ্বীপেই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার আসিয়া লক্ষ্মণ সেন দেবকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত করেন।

এই নবদ্বীপেই বাসুদেব সার্বভৌম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, বাণভট্ট শিরোমণি, স্মার্ত প্রধান রঘুনন্দন, তন্ত্রবিৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শঙ্কর তর্কবাগীশ, আনন্দরাম তর্কবাগীশ (যিনি অর্ঘ্যদানের সুবিধার জন্য কোশার মুখ বিস্তারিত করিয়া ছিলেন এবং সেই জন্য কোশার নাম আনন্দার্ঘ্য হয়) প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যশঃ ও খ্যাতি জগৎব্যাপী করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইঁহাদের কে কোথায় কোন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বা বাস করিতেন সে সকলের সঠিক নিদর্শন পাইবার কোনও উপায় নাই, এমনকি ইহাদের অধিকাংশের বংশ পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটা আবিষ্কারের চেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেহ কেহ বর্তমান নবদ্বীপের পরপারে মায়াপুর নামক স্থানে তাঁহার জন্মভূমি নির্দেশ করিয়া তথায় তাঁহার শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

নবদ্বীপের তলবাহিনী ভাগিরথী ও জলাঙ্গী বহু প্রাচীনকাল হইতে এত অধিকবার স্থান পরিবর্তন করিয়াছে যে নবদ্বীপ-মণ্ডলের চতুঃসীমান্তবর্তী ৮/১০ মাইলের মধ্যে কোথায় গঙ্গা বা জলাঙ্গী বা তাহাদের শাখা ছিল এবং কোথায় না ছিল তাহা বলা সুকঠিন। এই ৮/১০ মাইলের মধ্যে অসংখ্য স্রোত ও জলহীন খাদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বর্তমান নবদ্বীপ গ্রামখানিতে যেবার একটু অধিক পরিমাণে বনার জল বৃদ্ধি পায় সেই বারই জলে পূর্ণ হইয়া যায়। এই প্লাবন নিবারণার্থ কোনও সময়ে গ্রামের চতুষ্পার্শে বাঁধ বাধা হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে ঐ বাঁধের অবস্থা অতি শোচনীয়; ভুতপূর্ব ছোটলাট সার জন উড্‌বারণ বাহাদুর যখন নবদ্বীপ পরিদর্শনে আগমন করেন তখন ঐ বাঁধ মেরামতের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে তিনি গ্রামের লোক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিলে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু উভয় পক্ষই এ বিষয়ে তদবধি আর কোনওরূপ মনোযোগ প্রদান করেন নাই।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতেই এই স্থানটি হিন্দু বৈষ্ণবগণের নিকট পরম সমাদরের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের চক্ষে ইহার মহিমা শ্রীবৃন্দাবনের তুল্যানুতুল্য এবং সেই কারণে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে এই স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল বাস করিতে দেখা যায়। হেষ্টিংসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষজীবনে সোপার্জ্জিত অতুল বিত্ত বৈভব, নিজ পুত্র লালাবাবুকে অর্পণ করিয়া দুই তিন শত বৈরাগী সঙ্গে এই নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ সন্নিহিত রামচন্দ্রপুরে একটি ৬০ ফুট উচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষ্ণবাদির সেবার বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় উহা চিহ্নরহিত হইয়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেনসিয়া একটি মুসলমান কলেজ দেখিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত শ্রীমন্দিরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখা যায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এইখানেই সর্বপ্রথম কলেরা রোগের সৃষ্টি হইয়া ক্রমে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উহা ভারতব্যাপী এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চীনে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আরব ও পারস্য, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া, প্রাশিয়া এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বিস্তারিত হইয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব গ্রন্থ সমুদয়ের নবদ্বীপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে, তদানীন্তন নবদ্বীপকে অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সেই পূর্ব সমৃদ্ধির সহস্রাংশের এক অংশও অধুনা বিদ্যমান নাই। নদীর গতি পরিবর্তনের সহিত নগরের সর্ববিধ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং কালের ক্রীড়ায় ইহা একরূপ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে একজন সাহেব এখানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উপদ্রবের কথা লিখিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ডরাটর লেডন, যিনি কয়েক মাস নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সার এস ব্ল্যাকোল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি এখানে সর্বদাই ব্যাঘ্রাদি শিকারে নিযুক্ত রহিতেন।

নবদ্বীপের নিকটবর্তী জহ্নু নগরে পূর্বে প্রতিবৎসর ভাদ্রীয় সংক্রান্তিতে একটি বৃহতী মেলা হইত, এখনও উহা গাছপূজা নামে প্রচলিত এবং প্রতি বৎসর ঐ দিনেই হইয়া থাকে। কথিত আছে, এই স্থানেই জহ্নুমুনি একগণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। এখানে এক গৃহস্থের বাটীতে একটি কামধেনু ছিল এবং বহু লোকে উহার পূজা করিত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে অনূন্য ৩০টি সুন্দর শ্রীমন্দির ও একশত সংস্কৃত টোল বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে মন্দিরের সংখ্যাও অতি অল্প এবং টোলের সংখ্যা মাত্র পঞ্চদশ। পণ্ডিতের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

১২২১ সালের হটু ঘটকের তত্ত্বাবধানে এক বিরাট কালিকা মূর্তি গঠন করিয়া বহু

জাঁকজমকের সহিত এক বিরাট বারোয়ারী পূজা হইয়াছিল ইহা অদ্যাবধি এখানে ছটুঘটু পূজা বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এখানে খৃষ্টান পাদরী সাহেবগণ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। তৎপূর্বে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ ডিয়ার সাহেব এখানে কোন কোন বালককে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে এখানে বহু কীর্তনীয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে এখানকার বিখ্যাত কীর্তনীয়াগণের মধ্যে শ্যামা বাউলের নাম সুপ্রসিদ্ধ। শ্যামা নবদ্বীপাধিপতি গিরীশচন্দ্রের সমসাময়িক। প্রেমিক ভক্ত শ্যামের মধুর কণ্ঠে তদানীন্তন আবাল বৃদ্ধ বনিতা মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রাচীনাদের নিকট শুনা যায়—

"বাজলো শ্যাম বাউলের খোল,
যত মাগী চরকা তোল।"

এখানকার উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বরেণ্য ঋষিকল্প পণ্ডিত মণ্ডলীর মহিমান্বিত নামাবলী ও সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়াদি নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এখানকার গোস্বামী মহোদয়গণ শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈত বংশের শাখা, ভক্তশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় ব্রজানন্দ গোস্বামী প্রভুর বংশ, মণিপুরের রাজবংশ, কাংশ্যবণিক কুলোদ্ভব কীর্তিমান গুরুদাস মহাশয়ের বংশ, রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের বংশ, বাবু তারিণীচরণের বংশ, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার পণ্ডিত মতিলাল রায় ও তৎপুত্র কৃতী ধর্ম্মদাস রায় প্রভৃতির বংশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য, যথা—অত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিভিন্ন চতুষ্পাঠী সকল, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন স্থাপিত হরিসভা ও চতুষ্পাঠী, পোড়ামাতা সিদ্ধেশ্বরী, ভবতারণ ও ভবতারিণীর মন্দির, বুড়োশিব, আগমেশ্বরী মাতা, শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির, শ্রীবাস আঙ্গিনা প্রভৃতি। বিভিন্ন বৈষ্ণবপাটাবলী এবং গঙ্গার পরপারস্থিত মায়াপুর ও তথাকার শ্রীমন্দিরাদি, চাঁদ কাজীর কবর; বল্লাল দিঘী ও ঢিবী ও সুবর্ণ বিহার ও তত্রস্থ প্রাচীন রাজবাটীর লুপ্ত ধ্বংসাবশেষ।

সভাসমিতির মধ্যে "বঙ্গবিবুধজননী সভা ও গঙ্গাটিকুরী-বাসী স্বনাম-খ্যাত ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাপিত "নবদ্বীপ সমাজ" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবিবুধজননী সভার পূর্ব নাম সংস্কৃত বিদগ্ধ-জননী সভা। ইহা প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন এম. এ. ডি. এল কর্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ইহার সভাপতি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, সম্পাদক সর্বেশ্বর সাবভৌম ছিলেন। পরে মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর ঐ সভা বঙ্গ বিধুবজননী সভা নামে খ্যাত হয় এবং নদীয়াধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ঐ সভার সভাপতি হয়েন। পরে সভ্যগণের সহিত মহারাজের কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিলে ৪/৫ বৎসর ইহা স্থানীয় পণ্ডিতমন্ডলীর সাহায্যে রক্ষিত হয় তৎপরে বঙ্গের সুকৃতি সন্তান সুপণ্ডিত, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী এম এ; ডি, এল; এফ, আর, এস, ই, মহোদয় ঐ সভার সভাপতি হইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য, সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। ইহার বর্তমান সম্পাদক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ।

নবদ্বীপ সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুসমাজের সর্বাঙ্গীন সংস্কারসাধন ও ব্রাহ্মণেতর জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন। ইহার বর্তমান মন্ত্রী শ্রীহরিদাস ন্যায় সিদ্ধান্ত।

নবদ্বীপের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিত্তল কাংস্যের সামগ্রী, মাটির বাসন, তুলসীর মালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নদীয়ার নিকটবর্তী স্থান সমূহের মধ্যে মায়াপুর, স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য। একশ্রেণীর ব্যক্তি বিশেষের নিকট মায়াপুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া পূজিত। তাঁহাদের মতে ইহা অষ্টক্রোশ পরিমিত নবদ্বীপ মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নদীর গতি পরিবর্তনাদি নানা কারণে ইহা কিছু কাল পরিত্যক্ত পল্লীর ন্যায় লুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে; এই মতের পরিপোষকগণের মধ্যে স্বনামখ্যাত শিশির কুমার ঘোষ, শ্রীকেদার নাথ দত্ত প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি শ্রীশ্রীগৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য সেবা এখানে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মযাত্রা উপলক্ষ্যে কয়েক বৎসর হইতে একটি মেলা আরম্ভ হইয়াছে। এখানে বিখ্যাত চাঁদ কাজির সমাধির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এখানে অসংখ্য তুলসীবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উহা বিনা আয়াসে, আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে।

মহেশগঞ্জ খড়িয়া (জলাঙ্গী) নদীর উপরেই স্থাপিত। উপস্থিত ইহা একটি ক্ষুদ্র পল্লী, জমিদার নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও ইংলণ্ড প্রত্যাগত কৃতবিদ্য ও স্বদেশহিতৈষী জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের পিতা স্বর্গীয় মহেশ বাবুর নামে স্থাপিত, এখানে বিপ্রদাস বাবু নূতন আবাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, এবং তিনি এখানে কল কারখানা স্থাপিত করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় বাসনের কারখানা ও নদীয়া টেনারী নামে জুতার কারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। মেহেরপুর হইতে এই স্থান পর্যন্ত রেল খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে; এই রেল গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়া রেলের সহিত সংযুক্ত হইবে।

স্বরূপগঞ্জ জলাঙ্গীর উপরে স্থাপিত, ইহা শিবনিবাসের জমিদার স্বর্গীয় স্বরূপচন্দ্র সরকার চৌধুরীর নামে স্থাপিত। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ মহোদয় এখানে একটি আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সুখদ-কুঞ্জ নামে অভিহিত করিয়াছেন ও তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময় অভিহিত করিয়া থাকেন।

বিল্বপুষ্করিণী একটি ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও এখানে পূর্বে বহু পণ্ডিতের আবাসস্থান ছিল, এক্ষণে পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। অধুনা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ তর্করত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভাজনঘাট নদীয়া জেলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান; এখানে পূর্বে বহু বৈদ্যের বাস ছিল, এক্ষণেও বহু বৈদ্য এখানে বাস করিয়া থাকেন। রাই-উন্মাদিনীপ্রণেতা প্রেমিক কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর আবাসস্থল। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণের নাম উল্লেখযোগ্য সুলেখক ও সুচিকিৎসক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধন্বন্তরীকল্প কবিরাজ স্বর্গীয় লক্ষ্মণ চন্দ্র কবিভূষণ, এবং স্বনামখ্যাত শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি। □

□ এই প্রবন্ধটি নদীয়া জেলার ইতিহাসকার কুমুদনাথ মল্লিকের রচিত 'নদীয়া কাহিনী' থেকে গৃহীত। প্রবন্ধটি এখন থেকে প্রায় একশো বছর আগে রচিত।

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয়

ড. সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬ খ্রীঃ—১৫৩৩ খ্রীঃ) নদীয়া জেলার নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। কিন্তু এই নবদ্বীপের অবস্থিতি এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থল সম্পর্কে চৈতন্যভক্তবৃন্দ, পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে নানা মত লক্ষ্য করা যায়। কারও কারও মতে বর্তমান নবদ্বীপ শহরের উত্তরাঞ্চলের রামচন্দ্রপুর ছিল প্রাচীন নবদ্বীপ—শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি। কারও ধারণা প্রাচীন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য জন্মভূমি গঙ্গাগর্ভে বিলীন। কোনও পণ্ডিতের অভিমত এই যে, বর্তমান নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলী রেল স্টেশনের সমদূরধর্মী স্থানে গঙ্গার অপর তীরে প্রাচীন নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র ছিল। অতি সম্প্রতি কোনও সুধী ব্যক্তি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন মায়াপুর বলে পরিচিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের (ইস্কন) কার্যভূমিই আসল নবদ্বীপ ; শ্রীচৈতন্যদেব এখানেই আবির্ভূত হন।

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রাচীন নবদ্বীপের অস্তিত্ব বিষয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ আজ লুপ্ত প্রায়। গঙ্গানদীর গতি পথ এই পাঁচশো বছরে এতবার পরিবর্তিত হয়েছে যে আজ আর প্রাচীন নবদ্বীপ সম্পর্কে শেষকথা বলার অধিকার বোধ করি কারও নেই। তাই পণ্ডিতেরা নিজের মতো করে নবদ্বীপের অবস্থিতি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার মধ্যে আংশিক সত্য—অবশ্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। আসল সত্য আবিষ্কারের জন্য গবেষকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে সেই সব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণপত্রের প্রতি যা আজও লুপ্ত হয়ে যায় নি, দেখতে হবে বিদেশীদের আঁকা প্রাচীন নবদ্বীপের মানচিত্র সমূহ, পড়তে হবে নদীয়া জেলার প্রাচীন বিবরণীগুলি, বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রাদি, শুনতে হবে প্রাচীন-নবদ্বীপবাসীর কাছে সেই সব প্রবাদ প্রবচন, জন্মকাহিনী যা আজ প্রায় কিংবদন্তীর রূপ নিতে চলেছে। এই সব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত করতে হবে। কিন্তু আসল সত্য উদ্ভাসিত হবে তখনই যখন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের সাহায্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে ; উৎখননের সাহায্যে নবদ্বীপের মহান ঐতিহ্যকে উদ্ধার করে তাকে সময়াতীত প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তাও আছে। এই কাজের সহায়তা হতে পারে ভেবে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা গেল।

আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগেই একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন—

বর্তমান নবদ্বীপ শহর কী প্রাচীন নবদ্বীপ ? এর উত্তর-না। তাহলে আজকের মায়াপুরই কি প্রাচীন নবদ্বীপ? তার উত্তরও না। তবে আজকের নবদ্বীপ ধাম প্রাচীন নবদ্বীপেরই দক্ষিণ অঞ্চল, যেমন প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশ বর্তমান মায়াপুরের অন্তর্গত। আজকের নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত হলেও পূর্বে তার পশ্চিম দিক দিয়েই গঙ্গা প্রবাহিত হত, তার সে খাদচিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। পুরোনো দিনের মানচিত্র এবং নক্সা সমূহে গঙ্গার গতিপথের যে ভৌগোলিক বিবরণটুকু পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় গঙ্গা—যা প্রাচীনকালে নবদ্বীপের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে তাকে কতকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে প্রবাহিত হ'ত। তা কালে গতি পরিবর্তন করে এর উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে তার পূর্ব পারে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। প্রাচীন নবদ্বীপের উভয় প্রান্তবাহিনী গঙ্গার স্রোতোধারা চিরদিন সমানভাবে প্রবাহিত হয় নি। কখনও এর পূর্ব-ধারার স্রোত মন্দীভূত হয়ে পূর্বদিকে চর উৎপন্ন করেছিল, কখনও বা পশ্চিমের স্রোত প্রবল হয়ে এই নগরীর পশ্চিমাংশ গ্রাস করতে করতে পূর্বদিকে সরে এসেছে। বর্তমান নবদ্বীপের চতুর্দিকে প্রাচীন গঙ্গার যে সব খাদ আছে সেগুলি বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হলে নবদ্বীপ যে সুরধুনীবেষ্টিত কয়েক খণ্ডে বিভক্ত এক বিশাল মহানগরী ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গার গতিপথের চিহ্ন বুকে নিয়ে যে সব খাদ আজকের নবদ্বীপে বর্তমান আছে তাদের সর্বোত্তর খাদটি বর্তমান ও অতীতের সংস্থানিক অঞ্চল মালঞ্চ পাড়ার দক্ষিণ দিয়ে বেণে-পাড়ার দক্ষিণ হয়ে বঙ্গপাড়ার মধ্য দিয়ে দণ্ডপাণিতলা ঘাটের কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে মণিপুরের পূর্বদিক দিয়ে গদখালি মহীশুরের (মোশুরো) মধ্য দিয়ে বর্তমান বহতা গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। মনে হয় এটাই ছিল তদানীন্তন নবদ্বীপের দক্ষিণাংশ বাহিনী গঙ্গা। এর উত্তরাংশের গতির বর্ণনায় বলা যায়—মালঞ্চ পাড়ায় পশ্চিমাংশে তা ছাড়া গঙ্গা বা পোলতা নামে শ্রীরামপুর গ্রামকে পশ্চিমে রেখে নবদ্বীপকে পূর্বে রেখে ক্রমোত্তরে থেকে 'চাঁদের বিল' হয়ে সোলের হাটের দক্ষিণ পাশ দিয়ে কিঞ্চিৎ পূর্ব মুখে চলে পরে আবার উত্তর মুখে গিয়ে পূর্বস্থলীর পাশ দিয়ে ক্রমিক উত্তরাভিমুখে চলে দাঁইহাট মেটিয়ারীর মধ্য দিয়ে কাটোয়া বা ইন্দ্রানী হয়ে প্রবাহিত ছিল।

নবদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তবাহিনী গঙ্গা যে পূর্বে খুবই বিশাল ও গভীর ছিল তার প্রমাণ প্রসিদ্ধ বণিক চাঁদসদাগর সিংহল যাত্রাকালে এই ধারা দিয়েই তাঁর বাণিজ্যতরীগুলিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঝড়বৃষ্টির জন্য তিনি বিদ্যানগরে তরীগুলিকে থামিয়ে ছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষদিকে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও দেখি অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল ইন্দ্রানীনগর থেকে ক্রমিক দক্ষিণাভিমুখী গতিতে সমুদ্রযাত্রার যে বর্ণনা আছে তাতে পুরধলী বা পূর্বস্থলী পর্যন্ত বর্ণনার পরে নবদ্বীপের উল্লেখ আছে ; তারপর পাড়পুর ও কুলিয়ার এবং তৎপর সমুদ্রগড়ের নাম পাওয়া যায়।

পাঁচশত বছর আগে গঙ্গার গতি ঠিক কি রকম ছিল বলা না গেলেও গঙ্গা যে তখন নবদ্বীপের উভয়প্রান্ত দিয়েই বইছিল তা অনুমান করা যায় ; কারণ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিতে নিদয়ার ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়া গেছেন এবং শান্তিপুরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নবদ্বীপবাসীকেও গঙ্গা পার হয়েই যেতে হয়েছিল। কাটোয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে, ফুলিয়া (শান্তিপুর) তার পূর্বপারে অবস্থিত ছিল। গঙ্গা তখন পর্যন্ত নবদ্বীপ নগরকে বেষ্টন করে উভয়প্রান্তেই তুল্য-প্রবাহিত ছিল। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে নবদ্বীপ গঙ্গার

পূর্বতীরে এবং ফুলিয়া ও বিদ্যানগর ছিল পশ্চিমতীরে। তার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অধ্যয়নের জন্য যেতেন গঙ্গা পার হয়ে কিন্তু এই শতকেই গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় কুলিয়া গঙ্গার পূর্বতীরস্থ হয়, বিদ্যানগর পশ্চিমেই থেকে যায়। গঙ্গার প্রাচীন খাদ এখনও পূর্বাবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীগৌরাঙ্গের সমকালেই যে কুলিয়া নবদ্বীপের সমপারে এসে পড়ে তার প্রমাণ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন নবদ্বীপে আসেন তখন তিনি কুলিয়াতেই মাধবদাসের বাড়ীতে ওঠেন ; শচীমাতা বৃদ্ধা, তাঁর পক্ষে নগরীর জনস্রোতে মিশে এখানে গৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়েছিল। 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকে বলা হয়েছে "নবদ্বীপস্য-পারে কুলিয়া নামে গ্রামে মাধবদাস বাট্যাং উত্তীর্ণবান" (৯ম অঙ্ক)। আরও একটি বিশেষ কারণে আমরা এই অনুমান করতে পারি। কুলিয়া গ্রামে বংশীবদনানন্দ সূত্রধরের বাড়ি ছিল। বংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন। মহাপ্রভু বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া কিভাবে কাল যাপন করবেন তদর্থে মহাপ্রভু তাঁকে নিজের উপানযুগলই শুধু দান করেন নি, তাঁর প্রতিমূর্ত্তি নিমাণেরও নির্দেশ দেন। এইজন্য মহাপ্রভুর উপদেশে তাঁরই জন্মভূমির নিম্ববৃক্ষ দ্বারা তাঁর শ্রীমূর্তির প্রতীক বিগ্রহ যিনি নির্মাণ করেছিলেন সেই বংশীবদনানন্দের পক্ষে বৃক্ষকর্তন গৃহে বহন ও মূর্তি গঠন ও পরে বিষ্ণুপ্রিয়া সমীপে উপস্থাপন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে হলে সম্ভবপর হত না। মনে রাখতে হবে বৃদ্ধ বংশীবদন ঐ শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করে স্বয়ং বহন করে বিষ্ণুপ্রিয়া সমীপে উপস্থিত হন।

শুধু কুলিয়া নয়, শ্রীচৈতন্যের ২৪ বৎসর বয়সের নগর ভ্রমণের কালে অনেকগুলি স্থান এক সমতলভুমির অন্তর্ভুক্ত ছিল ; চৈতন্য সমকালীন একজন পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস ; তিনি তাঁর পদে কাজীদলন-সূত্রে নগর সংকীর্তন পরিক্র মার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই রকম—

যে দিনেতে গৌরহরি কাজিরে দলন করি
নবদ্বীপে করিলা ভ্রমণ।
চারিঘাট উত্তরিয়া গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া
পথে জলাশত সুশোভন॥
জলাশয় ঐশান্যেতে চাঁদকাজী করে স্থিতে
সিমুলিয়া নামে সেই স্থান।
কাজীর দলন করি ভক্তসঙ্গে গৌরহরি
দক্ষিণ দিশা করিলা গমন॥
সংকীর্ত্তনে মত্ত হই শঙ্খ, তন্তু পল্লীদুই
মনানন্দে করিলা ভ্রমণ।
শ্রীধরের গৃহ হইয়া গাছাগাছা মজিদা দিয়া
পশ্চিম দিশ পারডাঙ্গা স্থান॥
তাহার উত্তর দিয়া রাজপণ্ডিতের গৃহ হৈয়া
ভক্তগণে মহামুখী করি।
বায়ুকোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজগৃহে গেলা গৌরহরি॥

উত্তরেতে নিজ ঘাট   তার পূর্বে মাধাইর ঘাট
নিকটেতে শ্রীনিবাস অঙ্গন।
তাহার ঐশান্য কোণে   বারকোণা ঘাট নামে
যাহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম ॥
তার উত্তরে কিছুদূরে   নগরিয়া ঘাট পরে
তার উত্তরে গঙ্গানগর গ্রাম।
এ উদ্ধব মন্দগতি   শোধিতে আপন মতি
নগর ভ্রমণ বিরচিল গান।

শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপের যে পাড়ায় বা পল্লীতে বাস করতেন, জনশ্রুতি অনুসারে তার নাম ছিল বৈদিক পাড়া। যে ঘাটে তাঁরা স্নান করতেন তাকে নিজঘাট বা চৈতন্যঘাট নামকরণ করে চৈতন্য পরিচালিত তাঁর নিজগৃহে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বিরাট সংকীর্তন দলের যে যাত্রার বর্ণনা এই পদে আছে তা 'চৈতন্য ভাগবতে'র মধ্য খণ্ড, ২৩ অধ্যায়েরই অনুরূপ। চৈতন্য ঘাট থেকে সংকীর্তন দল যাত্রা শুরু করে পূর্বমুখে গিয়ে ক্রমে মাধাই-এর ঘাটে উপস্থিত হয়। মাধাই-এর ঘাট থেকে কিছুটা ঈশান কোণে নদীতীর পথে গমন করে বারকোণা ঘাটে সংকীর্তন দল উপস্থিত হয়। এখানে শ্রীচৈতন্যের এক প্রিয় পাত্র বৈষ্ণব সাধু শুক্লাম্বরের আশ্রম ছিল। তারপর উত্তরাভিমুখী হয়ে ঐ দল নাগরিয়াঘাটে উপনীত হল। এই চারটি ঘাট অন্তর্দ্বীপ নবদ্বীপেরই প্রসিদ্ধ চারটি ঘাট ছিল। এই চার ঘাট পার হয়ে নদীতীর বর্জন করে প্রান্তরবর্তী পথে ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করে সংকীর্তন দল গঙ্গানগরে প্রবেশ করে। সেখান থেকে তা এক সুশোভন জলাশয় সম্ভবতঃ বল্লালসেনের-স্মারক বল্লালদিঘির পাশ দিয়ে দিঘির ঈশান কোণে অবস্থিত সিমুলিয়া পল্লীতে প্রবেশ করে। সিমুলিয়ার কাজীর বাসস্থান ছিল কাজীপাড়ায়। সংকীর্তন দল কাজীর বাড়ির উদ্দেশ্যে পথ ধরে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হল। চাঁদকাজী—(আসল নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন) তখন নবদ্বীপের প্রতিরক্ষক ও বিচারক। তাঁর উপরওয়ালা মুলুকপতি তখন থাকতেন অম্বিকা বা অম্বিয়া কালনায়। কাজীকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হত। তারজন্য একটি রাজপথও ছিল। এই রাজপথ মেদিনীপুর বর্দ্ধমান হয়ে অম্বিকা কালনার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সম্ভবতঃ এই রাস্তাটি ফুলিয়ার পাশ দিয়ে এসে পোড়ামা তলা থেকে কিছুটা দক্ষিণে কোন স্থানে নদী পার হয়ে বর্তমান পোড়ামাতলা থেকে কিছুটা দক্ষিণে কোন স্থানে নদী পার হয়ে বর্তমান পোড়ামাতলা রোড হয়ে উত্তরাভিমুখে গিয়েছিল। বর্তমানে যে রাস্তাটি মাতপুর বা মাধাইপুরের দিকে গিয়েছে অতীতে তা হয়তো কাজীর বাড়ীর নিকট দিয়ে নিদয়া বা বারকোণা ঘাটে গিয়ে নবদ্বীপ অতিক্রম করে কাটোয়াভিমুখী হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যদেব কাজী দলন করে সিমুলিয়া থেকে কীর্তনদল নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। এই সময় প্রথমেই শঙ্খপল্লী পরে তন্তু তন্তুপল্লীতে উপনীত হয়ে পল্লীপ্রান্তে শ্রীধরগৃহে উপস্থিত হন। এই শ্রীধর খোলা বেচা শ্রীধর নামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তার গৃহের বাইরে রক্ষিত জলপাত্র থেকে জলপান করে আদিগাছা অভিমুখে অগ্রসর হন, তৎপর মাজিদা হয়ে পাড়ডাঙ্গা গমন করেন। পাড়ডাঙ্গা মাজিদার পশ্চিমে ছিল। অতঃপর দক্ষিণা-গতি ত্যাগ করে কীর্তনদল পশ্চিমাভিমুখী হয়, পরে পাড়ডাঙ্গা থেকে সংকীর্তনদল উত্তরাভিমুখী অন্তর্দ্বীপে প্রবেশ করে এবং কিছুটা পশ্চিমে চলে রাজপণ্ডিতের অর্থাৎ

চৈতন্যের শ্বশুরালয় সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে সংকীর্তন করে সেখান থেকে বায়ুকোণাভিমুখে শ্রীচৈতন্যের নিজগৃহে গমন করেও কীর্তনান্ত ঘটায়।

শ্রীচৈতন্য পরিচালিত কীর্তন সম্প্রদায় অন্তর্দ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি ঘুরেছিল, সমগ্র নবদ্বীপ পরিক্রমা করে নি। কাজী দলনই এখানে লক্ষ্য ছিল, সমগ্র নবদ্বীপ বা বৃহত্তর নবদ্বীপের পরিক্রমা নয়।

সমগ্র নবদ্বীপ পরিক্রমার একটি প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' দ্বাদশ তরঙ্গে। তাঁর বর্ণনায় দেখি গঙ্গাবেষ্ঠিত প্রাচীন নবদ্বীপ নামক ভূখণ্ডটি ছোট বড় নটি দ্বীপে বিভক্ত ছিল ঃ

গঙ্গাপূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্ঠয়॥
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

নরহরির বর্ণনায় দ্বীপ শব্দে স্থানগুলি লক্ষ্য করে কথ্য শব্দের—সংস্কৃত রূপ ব্যবহৃত হলেও এবং ক্রম বর্ণনায় কিছুটা অদল বদল ঘটলেও আজ পর্যন্ত ঐ সব নামের অপভ্রংশ শব্দে অনেক কটি স্থানই প্রাচীন নবদ্বীপের সীমাভুক্ত এলাকাধীন আছে তা বুঝতে পারা যায়। গঙ্গার পশ্চিম শাখার পশ্চিম পারে মামগাছি, জাননগর বা পোলের হাট প্রভৃতি গ্রামগুলি যেমন আছে পূর্বদিকের শাখার পূর্বপারে সিমুলিয়া, পাদিগাছা, মাজিদা প্রভৃতি এখনও বর্তমান। নবদ্বীপ পরিক্রমার সময়ে নবদ্বীপের এই নটি পল্লী অঞ্চল এক অখণ্ড অঞ্চল ছিল বলেই মনে হয়। ঐসব দ্বীপের মধ্যে গঙ্গার অন্তরস্থ ছিল বলেই তখন বর্তমান নবদ্বীপের অন্য নাম ছিল অন্তর্দ্বীপ। এই অন্তর্দ্বীপকে আতোপুর বা প্রাচীন মায়াপুর বা রামচন্দ্রপুর নামে আজও চিনে নেওয়া যায়। অন্তর্দ্বীপকে কেন্দ্রে রেখে আরও আটটি দ্বীপ পরিক্রমা করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ও রামচন্দ্র কবিরাজ; তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অদ্বৈত আচার্যশিষ্য ও শ্রীচৈতন্যের গৃহ পরিরক্ষক ঈশান নাগর। অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি শ্রীনিবাসাদিকে নিয়ে নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন। কুলিয়া যেতে পথে তাঁদের কোনো নদী পার হতে হয়েছিল বলে 'ভক্তিরত্নাকর'-কার উল্লেখ করেন নি। এই পরিক্রমার কাল আনুমানিক ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদ।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত হয়। শ্রীচৈতন্যের নিজঘাটের কিছুটা পশ্চিম অঞ্চল হ'তে এই প্রবাহ উত্তারঞ্চলে গুধাভিমুখী গতি নেয়। সম্ভবতঃ গঙ্গার এই গতিপরিবর্তনের ফলেই সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে শ্রীচৈতন্যের বাসভূমি ও ভালো পাথরে নির্মিত বীর হাম্বীরের মন্দিরটি প্লাবনের বেগে নষ্ট হয়ে যায়—অবশ্য যদি সেই মন্দির আগে নির্মিত হয়ে থাকে।[৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পূর্বস্থলীর কিছুটা দক্ষিণ থেকে পূর্বপাদ পরিত্যাগ করে কিছুটা পূর্বাঞ্চল দিয়ে বরাবর দক্ষিণমুখে চলে রাবকোণাঘাটের সমস্থানকে প্রবাহ হতে পূর্বাভিমুখী হয়ে গঙ্গা আবার যখন খাদ পরিবর্তন করে তখন পূর্বখাদটি যা নবদ্বীপের পশ্চিমে ছিল ও যা বাস্তুভিটাটি ভাসিয়েছিল শুষ্ক হয়ে যায়। অতপর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে মুর্শিদাবাদের মহারাজের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মুর্শিদাবাদ থেকে বর্ষাকালীন জলভ্রমণে বের হয়ে

তৎকালীন নবদ্বীপের কোনও এক ঘাটে বজরা বেঁধে মহাপ্রভুর বসত ভিটার সন্ধান করেন। জগন্নাথ মিশ্রের বসতবাড়ির পরিচয় জানা অনেক ব্যক্তি তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁদের কারও কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে যথোপযুক্ত প্রমাণাদি পেয়ে কয়েক বৎসর পরে মহাপ্রভুর সর্মভিটায় তিনি একটি ৪০ হাত উঁচু নবরত্নচূড়া বিশিষ্ট মন্দির নির্মাণ করিয়ে পুরীর জগন্নাথদেবের বেদীতে যে রকম কালোপাথর আছে সেই রকম কালোপাথর (Basalt) বিশিষ্ট এক বেদীতে মহাপ্রভুর প্রাণমূর্তিটি স্থাপন করেন। ঊনিশ শতকের তৃতীয় পাদারম্ভে আবার বহতা গঙ্গা প্রবাহ শ্রীচৈতন্যের গৃহসংলগ্ন খাদে পরিবর্তিত হয়, ফলে গঙ্গাগোবিন্দ নির্মিত মন্দির ভূতলশায়ী হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা কোনও রকমে মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহটি রক্ষা করতে সমর্থ হন এবং বর্তমান নবদ্বীপধর্মের মালঞ্চপাড়া বাসী সনাতন মিশ্রের বংশধরদের হাতে ঐ মূর্ত্তিটি অর্পণ করেন। মন্দির ওঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। পরবর্ত্তীকালে মাটি চাপা পড়ে থেকেও তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি অনেকটা নৈরাশ্যের জন্য কতকটা অসামর্থ্যের জন্য, কিছুটা বা বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ায়।

যাহোক ঐ বিগ্রহটি বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা সম্পর্কের যাদবানন্দ ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদি মাধবানন্দ প্রভৃতির বংশধরদের দ্বারা আজ পর্যন্ত পূজিত হয়ে আসছেন। গোস্বামীগণের বংশ বৃদ্ধি সূত্রে সেবার পালাক্রমে সেবাইতদের গৃহে টানাটানি করে নিয়ে যাওয়ার কারণে ঐ শ্রীবিগ্রহের একটি বাহু (বামবাহু) বাহুমূলের কাছে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈষ্ণব গোস্বামী ও সাধারণ ভক্ত সম্প্রদায়ের সমর্থনে কাঠে গড়া শ্রীমূর্তির ঊর্ধ্ব বাহু দুটি ছেদন করে কিছুটা কোণাকুনি বাদ দিয়ে নীচের দিকে সংযোজিত হয়। ফলে যে মূর্তি আদিতে ছিল ঊর্ধ্ববাহু (যেভাবে মহাপ্রভু নদীয়ার পথে সংকীর্তন করে বেড়াতেন) তা বর্তমান আকার লাভ করে। এই অঙ্গ সংস্কারের জন্য বাহু দুটির কাঁধের কাছে তৎকালীন কামার নির্মিত লৌহ কীলক এঁটে দেওয়া হয়। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তির অঙ্গরাগকালে লক্ষ্য করলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে এবং সেই সঙ্গে মূর্তির পাদপাদমূলের নীচের অংশ যা ভূমি সংলগ্ন থাকে তা লক্ষ্য করলেই মূর্তি নির্মাতা বংশীবদনের নাম দেখা যাবে সুতরাং বর্তমানে নবদ্বীপ ধামে মহাপ্রভু পাড়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের যে বিগ্রহ বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত বলা হয় তা যে আসল বিগ্রহ তাতে সন্দেহ নেই।

মহাপ্রভুর মূর্তি যে আদিতে ঊর্ধ্ববাহুই ছিল তার সুস্পষ্ট উল্লেখ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তিতেও আছে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" (স্বামী সারদানন্দ) দ্বিতীয়ভাগ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল—

"মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ (দেবভাবের) দেখবার জন্য এখানে ওখানে বড় গোসাঁইয়ের বাড়ি, ছোট গোসাঁইদের বাড়ি, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না! - সব জায়গাতেহ এক এক কাঠের মুরদ হাতে তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম। দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল ; ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময়ে দেখতে পেলুম অদ্ভুত দর্শন। দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখন দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মতো রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা ক'রে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসচে। অমনি 'ঐলোরে, এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম।

ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজশরীর দেখাইয়া) এর ভেতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম! জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেলল।" (পৃঃ ১৩১)

হাত তোলা গৌরাঙ্গ মূর্তির উল্লেখ ছাড়াও এখানে আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত আছে। প্রথমতঃ গঙ্গার অতলে বিলুপ্ত গৌরাঙ্গের তখনকার জন্মভিটার নির্দেশ—যা পরে গঙ্গার স্রোত সরে যাওয়ার ফলে বর্তমানে যেখানে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলে নির্দেশ করা হচ্ছে সেই প্রাচীন মায়াপুর তথা রামচন্দ্রপুর চরভূমির দিকেই ইঙ্গিত করে।

দ্বিতীয়তঃ গৌর-নিতাই এর ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখেই বলে গেলেন তিনিই একাধারে চৈতন্য-নিত্যানন্দ। তাঁর এই উক্তি যে অযথার্থ নয় তার প্রমাণ কথামৃতের নানা স্থানে আছে।

শ্রীচৈতন্যদেবকে ঠাকুর ঈশ্বরের অবতার বলে দৃঢ় বিশ্বাস করতেন—"চৈতন্যদেব অবতার ঈশ্বর অবতীর্ণ"। কিংবা "তিনি ঈশ্বরের অবতার! তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ।" ঠাকুর আরও বলতেন—"অদ্বৈত জ্ঞান না হলে চৈতন্য দর্শন হয় না। চৈতন্য দর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ।" অদ্বৈত চৈতন্য নিত্যানন্দের এই অপূর্ব তাৎপর্যময় ব্যাখ্যা সত্যিই অভিনব। আবার ঐ তিনকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা অবতার পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বমুখেই বলে গেছেন—"আমি অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ—একাধারে তিন।"

শ্রীচৈতন্যদেবের মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভগবানের নামগান করতে করতে মহাভাবাবিষ্ট হয়ে প্রায়ই সমাধিমগ্ন হয়ে যেতেন। সময় সময় শ্রীচৈতন্যের ভাবাবস্থার সঙ্গে ঠাকুরের ভাবাবস্থার কোনও পার্থক্যই থাকত না। তখন ভক্তগণ তাঁকে শ্রীগৌরাঙ্গ বলেই মনে করতেন। গৌরাঙ্গের যেমন ঈশ্বরাবেশ হত শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন চৈতন্যাবেশ। কীর্তনের আসরে ঠাকুর যখন সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন তখন ভক্তেরা দেখতেন—"যেন শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। গভীর ভাবসমাধি নিমগ্ন।" কলুটোলায় চৈতন্য "সভাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।" যেমন শ্রীচৈতন্য সময় সময় ভাবাবিষ্ট হয়ে বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট হতেন।

সুতরাং নবদ্বীপ-দর্শনে এসে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ইঙ্গিতটুকু দিয়ে গেছেন তা অসত্য হতে পারে না। অবতার পুরুষ কখনও বৃথা বাক্য ব্যয় করেন না।

অতঃপর গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রসঙ্গেই আসা যাক।

সিদ্ধ-চৈতন্যদাস বাবাজী নামে এক সাধক সিদ্ধ পুরুষ (জ. ১১৭৫ সনে), যিনি পীরতলা খালের দক্ষিণে ভজন কুটির নির্মাণ করে বাস করতেন, এবং প্রতি রাত্র শেষে "নদীয়া নাগরী গো তোদের নাগর বুঝি যায়" বলে টহল দিয়ে নবদ্বীপের পথে পথে নিত্য চলতেন। তিনিই বিগ্রহ সংস্কারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বিগ্রহ সংস্কার ছাড়াও আর একটি বড় কাজ তিনি করেন। শ্রীবিগ্রহটি একটি স্থানে নিয়ত রেখে সেবা করার জন্য তদানীন্তন জনগণের সহায়তায় ক্ষুদ্রকার হলেও একটি মন্দির নির্মান করেন। এই মন্দির নবদ্বীপস্থ মহাপ্রভু মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের পূর্ব দিকে ডান হাতে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়। এই গঠন প্রণালী জগন্নাথপুরী মন্দির শিল্পের ধরনে এবং প্রাচীন পাতলা ইটে মন্দিরটি

তৈরী। মূল মন্দির আরও কিছুকাল পরে তোতারাম দাস বাবাজী নামে মহাপ্রভুর আর এক ভক্তের চেষ্টায় জনগণের বিশেষতঃ ধনী ও রাজপুরুষদের সহায়তায় সম্পূর্ণ নয়। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর তিরোভাব ঘটে ১৮৭৭ খ্রীঃ (বাংলা ১২৮৪ অগ্রহায়ণ) স্থানীয় পীরতলা অঞ্চলে সমাধি-মঠে তাঁর অস্থির সমাধি দেওয়া হয়েছিল পরে বিশেষ কারণে সেই অস্থিখণ্ড উঠিয়ে বর্তমান মহাপ্রভু মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে সমাধিত করা হয়।

উনিশ শতকের শেষদিকে (১৮৭২, এপ্রিল মাসে) গঙ্গাপ্রবাহ আবার পূর্বস্থলে ফিরে গেলে স্থানীয় জনসারণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রত্যক্ষ করেন, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অনেকেই এ কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু মন্দির উদ্ধার করার কিংবা চৈতন্যদেবের জন্মভূমির স্থান চিহ্নিত করার কেনও চেষ্টা তখন কেউ করেন নি। সেই কাজ শুরু করেন প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন থেকে ব্রজমোহন দাস বাবাজী (প্রাক্তন ইঞ্জিনীয়ার) নামে এক চৈতন্যভক্ত এসে। তিনি যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে (একান্ত নিজস্ব অর্থ) মহাপ্রভুর জন্মস্থান অন্বেষণের কাজে ব্রতী হন। এই কাজে তিনি এক সন্ন্যাসীর সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। বর্তমানে প্রাচীন মায়াপুর তথা রামচন্দ্রপুর আখ্যাত নবদ্বীপ শহরের উত্তরাঞ্চলের একটি স্থানকে উদ্দিষ্ট স্থান বলে সনাক্ত করা হয়। ঐ স্থানের পার্শ্ববর্তী জমির দখলদার অজিত ন্যায়রত্ন মশায়ের জমির একসীমায় জগন্নাথ মিশ্রের বসতবাড়ি ছিল বলে তিনি জানতে পারেন। বাবাজীমশায় বিশেষ অনুসন্ধানে নিঃসন্দেহ হয়ে জমিটি (২২ বিঘা) কিনে নেন এবং ড্রিলিং যন্ত্রের সাহায্যে গবেষণা কাজে অগ্রসর হন। তাঁর এই যন্ত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য গঙ্গাগোবিন্দ নির্মিত মহাপ্রভু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার। বোরিং করে ঐ মন্দিরের অস্তিত্ব তিনি অনুমানও করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফল নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে ১৯২৭ খ্রীঃ (১৩৩৪ চৈত্র মাসে) কাশীমবাজারের মহারাজ স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে কলকাতার এলবার্ট হলে "বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি" স্থাপিত হয়। শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজীর প্রচেষ্টায় এই সভার প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। বিপিনচন্দ্র পাল এই সভার উদ্বোধন করে তাঁর ভাষণে বলেন—"বঙ্গীয় সরকারের উচিত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ হইতে উপযুক্ত লোক প্রেরণ করিয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নির্মিত মহাপ্রভুর মন্দির আবিষ্কার করা। মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা উচিত।"[৫]

ঐ সভা যে সমিতি গঠন করেন শ্রীসতেন্দ্রনাথ বসু (তদানীন্তন বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক) তার সম্পাদক হন। ঐ 'শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি' ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রীঃ তাঁদের অনুসন্ধানের যে ফল প্রকাশ করেন তার উপসংহারে বলা হয়ঃ—

"শ্রীগৌরাঙ্গদেব মায়াপুর, নবদ্বীপ নদীয়া নগর বা অন্তর্দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মায়াপুর নবদ্বীপের মধ্যে, নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। জন্মভবন মায়াপুরে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব মায়াপুরের যে নিম্ব বৃক্ষের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেই বৃক্ষের দ্বারা মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় দারুময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া নিত্য সেবা করিতেন। ভক্ত রাজা হাম্বীর ঐ স্থানে কাল পাথরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া উক্ত বিগ্রহ স্থাপন করেন। কালক্রমে ঐ স্থান গঙ্গাগর্ভস্থ হইবার পূর্বে উক্ত বিগ্রহ

স্থানান্তরিত হন। ঐ কাল পাথরের মন্দিরের একখণ্ড পাথর এখনও মহাপ্রভু পাড়ায় মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত আছে। মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে ভাগীরথী যখন সরিয়া গেলেন, তখন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐ স্থানে ৬০ ফুট উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন। সেই মন্দির কালক্রমে গঙ্গাগর্ভস্থ হয় এবং পুনরায় গঙ্গার জল কমিয়া গেলে ১২৭৯ সালে (১৮৭২ খ্রীঃ) নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ও জনসাধারণ ঐ মন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এখন ঐ নবদ্বীপের উত্তরস্থিত চরভূমিতে ২০ হাত মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত।[৬]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে যাতে প্রাচীন নবদ্বীপের অনেকাংশ লোপ পেয়ে যায় কিম্বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গুড়গুড়ে নামে জলঙ্গীর একটি শাখা তদানীন্তন নবদ্বীপের উত্তরস্থিত বেলপুকুর (বিল্বগ্রাম নামে নবদ্বীপের উত্তরাঞ্চলের একটি পাড়া) পল্লীর পাশ দিয়ে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে আঠারো শতকের প্রবাহের সঙ্গে এসে একদিক থেকে মিলিত হয় এবং অন্য এক শাখা পূর্বোত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় এসে মিলিত হয়। এই জলঙ্গী প্রবাহে তৎকালীন শঙ্খপল্লী ও তন্তুপল্লী ধ্বংস হয় এবং গদখালি, মাজিদা, পারডাঙ্গাকে গঙ্গার পূর্বপারে বিভক্ত করে দেয়। বেলপুকুর, মামগাছি, গঙ্গানগর ও অন্তর্দ্বীপের কিছু পরিমাণ অংশ জলঙ্গীর পশ্চিম পারে থাকে আর রাতুপুর সিমুলিয়া, মিঞাপুর, বল্লাল দিঘি, শঙ্খপল্লী, তন্তুপল্লী, শ্রীধরের বাড়ি, অন্তর্দ্বীপের উত্তরাংশ পূর্বদিকে পৃথক হয়ে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ সমকালে নগর ভ্রমণের স্থানগুলি যা এক সমতল ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল, আজ ৪৭০ বৎসর পরে আমরা সে স্থানগুলিকে জলঙ্গী শাখা ও গঙ্গা দ্বারা তিন খণ্ডে বিভক্ত দেখতে পাই।

প্রাচীন নবদ্বীপ বা অন্তর্দ্বীপ আছে, কিন্তু দক্ষিণাংশ ও পশ্চিমাংশ মাত্র। যা আছে তা গ্রাম্যরূপে নেই পতিত প্রান্তররূপে, যদিও তাতে কিছু কিছু নবগ্রাম সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রাচীন বংশ নেই যদিবা কিছু পাওয়া যায় তবে তাঁরাও স্থান ত্যাগ করে গঙ্গানদীর প্রাচীন রূপের অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেবের সমকালীন গঙ্গার দক্ষিণ দিকে ও উত্তর দিকের প্রান্তর ভূমিতে নিজ নিজ বাস উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এতে প্রাচীন নবদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন নবদ্বীপের জন্ম হয়।

ব্রজমোহন দাস বাবাজী গবেষণার সাহায্যে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা হল—বর্তমান নবদ্বীপের উত্তরাঞ্চল রামচন্দ্রপুর নামক পল্লীর অন্তর্গত একটি স্থান আসল মায়াপুর—শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৭৯২ খ্রীঃ কোন মকর্দমার কাগজের নক্সার একটি মন্দির চিহ্নিত আছে যার পাশে রামচন্দ্রপুর নাম লেখা। বর্ণিত মন্দিরটি ১৭৯১ খ্রীঃ আগে প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্মিত মন্দির। ব্রজমোহন দাস এই মন্দিরের অস্তিত্বের কথা তদানীন্তন বিদ্বৎ-সমাজের অর্থাৎ 'বঙ্গবিবুধ জননী সভা'র সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থের কাছে ঘোষণা করেন ও বিপুল জনসমর্থন লাভ করেন।[৭] কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য লাভ না করায় তিনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন জানান। এই সময় (১৯২৭ খ্রীঃ ও পরবর্তীসময়ে) তন্তুপল্লী, শ্রীধরের বাড়ি, অন্তর্দ্বীপের সরকার দেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র পরিস্থিতির জন্য কিছুটা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তবু সাহায্য হয়তো মিলতো কিন্তু বাদ সাধলেন সরকারী এক উচ্চ-

পদস্থ কর্মচারী। ঝড়ের বেগে হঠাৎ নবদ্বীপে এসে কোনও বিশেষ কারণে। আহত বোধ করায় ঐ ভুজঙ্গটির রোষদৃষ্টি বাবাজীর উপরে পড়ে এবং যথালক্ষ্যে অভীষ্টপূরণ করতে না পেরে বাবাজীর একার চলার পথে ইনি বাধা সৃষ্টি করেন। বাবাজীর লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে তিনি নব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সেইদিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মায়াপুর অর্থাৎ প্রাচীন নবদ্বীপের গৌরব নাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গা ও জলঙ্গীর সংযোগস্থলের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত হুলোরঘাট নামক স্থলভাগের কিছুটা উত্তরে অবস্থিত তদানীন্তন 'মিঞাপুর'-কে (যা এখনও ঐ নামেই অনেকের কাছে পরিচিত) ইংরাজী বানানের হেরফের ঘটিয়ে মায়াপুর—মহাপ্রভুর পবিত্র জন্মস্থল বলে দাবী করেন এবং এই দাবী প্রতিষ্ঠার জন সরকারী অর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তির যথেষ্ট 'সদ্ব্যবহার' করেন। পিতার সঙ্গে তাঁর কৃতী পুত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রচারের প্রবল জোয়ারে ব্রজমোহন দাস বাবাজীর অল্পশক্তির ভেলাখানি অর্থ, বুদ্ধি ও মহৎ ব্যক্তিদের সহায়তার অভাবে ভেসে যায়। তাঁর পক্ষে কূল পাওয়া সম্ভব হয়নি। বাবাজী নির্দেশিত স্থানটির সংস্কার বা উৎখননও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি।[৮]

ফলে স্বদেশ ও বিদেশী সাহায্যপুষ্ট হয়ে মিঞাপুর আজ মায়াপুর নাম নিয়ে গরবিণী চালে বিশ্বসভায় নিজ পরিচয় জাহির করছে ; যদিও কাজীর বাড়ীর অত কাছে মহাপ্রভুর জন্মস্থান কেমন করে সম্ভব, কিংবা কাজীর সমাধির উপর পাঁচশ বছরের পুরোনো চাঁপাফুল গাছটি আজও কেমন করে টিঁকে আছে এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মায়াপুরীরা অর্থাৎ মিঞাপুরীরা দিতে পারেন না। ব্রজমোহন দাস বাবাজী আবিস্কৃত মায়াপুর মিঞাপুরীদের প্রচারিত শ্রীমায়াপুরের চেয়ে প্রাচীন প্রচেষ্টা—এইটুকু মাত্র আত্মতৃপ্তি বুকে নিয়ে "প্রাচীন মায়াপুর" রূপে আজও নবদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে শ্রীমায়াপুর থেকে এক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। কে জানে তার সত্য পরিচয় কোনও দিন উদ্ঘাটিত হবে কিনা। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ব্যতীত সত্যাসত্য নির্ধারণের উপায় নেই। যদি সত্য আবিষ্কৃত হয় তবে ভাল, না হলে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব বিবেচনায় নরহরি চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে হয়—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নাম স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

প্রভুর জন্ম মায়াপুরেই। প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর যেহেতু তার অস্তিত্ব অস্বীকার্য নয়। তার অবস্থিতি নির্ণয় আপাত অসম্ভব ব্যাপার। এর হয়তো কোন সত্য উপস্থাপনের নিদর্শনা আছে কিন্তু প্রকাশ নেই, যার প্রকাশ আছে তার সত্যতা নেই। যদি বা প্রাচীনতা থাকে তবে তা বিরূপ পরিচিতির বাহক। তাই বলি, যা সত্য বলে মনে হয় তা আপাত সত্য প্রতীতি ঘটালেও অসত্য—মায়াপুরিত। আসল সত্য কি অসত্য মায়ার আবরণে চিরকাল আবৃতই থাকবে, কোনদিন প্রকাশ পাবে না ? কি জানি হয়তো গুপ্ত বৃন্দাবন ব্যক্ত হবে, তবে বৃন্দাবনের মতোই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার স্থানগুলি যথাযথ ভাবে নির্দেশ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপে এসে গৌরাঙ্গের ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর জন্মভূমির সঠিক নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেই নির্দেশ আজও আমরা ধরতে পারিনি—ভবিষ্যতে পারব কি ? ☐

সূত্রনির্দেশিকা ঃ

১· সুবাদার টোডরমল্লের ১৫৮২ খ্রীঃ সুবা বাংলার ম্যাপ যা এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৯৬ খ্রীঃ জার্নালের ৮৮ পৃঃ মুদ্রিত আছে। মেজর রেণেলের ১৭৮৮ খ্রীঃ Rannel's Memoir of a Map of Hindusthan. কোল ব্রুকের মানচিত্র (১৭৯৩ খ্রীঃ) জন-থরনটনের তৈরি ম্যাপ (১৬৭৫) যা 'দি থার্ড বুক অফ দি ইংলিশ পাইলট'-বইয়ে মুদ্রিত আছে। District gazetter of Nadia, Garret (১৯১০ খ্রীঃ) প্রভৃতি।

২· নবদ্বীপের নামকরণ সম্পর্কে কারও মত গঙ্গা ও জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি নব উদ্ভূত দ্বীপ তাই নবদ্বীপ। কিন্তু তদানীন্তন কালে জলঙ্গী নবদ্বীপ থেকে অনেকদূরে অবস্থিত ছিল। এই সম্পর্কে একটি প্রবাদ এই যে— এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে নটি দীপ জ্বালিয়ে আপন ইষ্টদেবীর উপাসনা করতেন। এই আলোর সাহায্যে রাতে নদীপথকে নিরাপদ রাখাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে কোন নৌকো দিক ভুল করে চরে না ঠেকে যায়। তাঁর প্রজ্জ্বলিত নটি দীপকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন স্থানীয় অধিবাসিগণ নদীয়ার চর বলত। তার থেকেই নদীয়া নাম সৃষ্টি হয়। নবদীপের সমাহারে নবদ্বীপ কথাটাও হয়তো এই ভাবেই এসেছে।

৩· ১৫৮২ খ্রীঃ বীর হাম্বীর নাম গ্রহণ করেন ও পর বৎসর বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপর কোনও এক সময়ে ঐ কালো পাথরের মন্দির নির্মিত হয়। মন্দির সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে, আদৌ তা নির্মিত হয়েছিল কি না। কিন্তু যে কাল, পাথরটি পাওয়া গেছে তা এল কিভাবে?

৪· গৌরাঙ্গের প্রকটকালেই নানাস্থানে তাঁর ভক্তগণ কর্তৃক গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেই বিগ্রহের সেবাপূজা হত। ঢাকা দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মূর্তি বোধহয় সর্বপ্রাচীন। তারপর কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিত নিতাই-গৌর বিগ্রহ দুটি প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্থাপিত এই মূর্তিটি তৃতীয় স্থান অধিকার করতে পারে।

৫· শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভূমিকা পৃঃ ॥ ৯০ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৬· শ্রীচৈতন্যভাগবত ভূমিকা পৃঃ ৪০ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৭· নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস, (১ম) পরিশিষ্ট, গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ।

৮· এই ঘটনার বিবরণ নবদ্বীপবাসী মদীয় পিতৃদেব ৺কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, তত্ত্বশাস্ত্রীর মুখে শোনা, তিনি ব্রজমোহন দাস বাবাজীর নবদ্বীপ অনুসন্ধান কার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত ছিলেন। জন্মভূমির উদ্ধার কল্পে, নবদ্বীপধামবাসী-সহ ব্রজমোহন দাস বাবাজীর শিষ্যেরা এখনও সচেষ্ট আছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও এদিকে নজর দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক নবদ্বীপের জীবনচর্যা

ড. জয়গুরু গোস্বামী

"প্রেম পৃথিবীতে একবারই আসিয়াছে এবং তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে" —ঐতিহাসিকের এই মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমায় "সব অবতার সার গোরা অবতার" শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে, জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আবির্ভূত হন—কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য। সেদিন গ্রহণ ছিল—রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে, আর এদিকে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে আবির্ভূত হইতেছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই গাহিয়াছেন—

"বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"

—বাঙ্গালীর হৃদয়রূপ অমৃত মন্থন করিয়া যে রস উঠিয়াছে, তাহারই ঘনীভূত নির্যাস—শ্রীচৈতন্যদেব। পৃথিবীর যেমন তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থল—তেমনি সারা বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনভাগ রাধা এবং একভাগ "রাধাভাবমূর্তি সুবলিতং তনু" গৌরাঙ্গ সুন্দরের চোখের জল। এই চোখের জলে এবং আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণের ফলে জনগণ দেখিল—জানিল—বুঝিল—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

—নাম-নামী অভেদ। আগুনের সংগে দাহিকার যেমন সম্পর্ক, ভক্তের সংগে ভগবানের তেমনি সম্পর্ক। তাই নাম করলেই তিনি নামিয়া আসেন। অর্থাৎ হরি, বৈকুণ্ঠ হইতে নামেন, তাই "হরিনামের" এত মাধুর্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাই বলা হইয়াছে—

"নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥"

—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মহিমার পরিবর্তে সৃষ্টি হইল—শ্রীচৈতন্যের প্রেম-মহিমা! এতদিন যেখানে— "কানু ছাড়া গীত ছিল না," এখন সেখানে দেখা দিল—"গৌরগীতি ছাড়া কানুগীতি নাই।" সৃষ্টি হইল—শ্রীমদভাগবতের পরিবর্তে—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। শুধু তাহাই নহে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল—"জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভাল" এবং চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" চণ্ডাল ব্রাহ্মণের

চেয়েও শ্রেষ্ঠ হইবে—যদি তার মুখে হরিনাম থাকে এবং সে মানবতাবোধে উম্বুদ্ধ হয়। প্রাচীন-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র—মানুষের কৃত্রিম পরিচয়, মানুষের একমাত্র পরিচয়—সে মানুষ। এই মানবতাবোধ তখনই সার্থক হয়; যখন তাহার মধ্যে অনুসৃত হয়—"ভগবৎপ্রেম," এই প্রেমই আবার—"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"র মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করে। তাই কবিরা পৃথিবীও আঁকিয়াছেন; স্বর্গও আঁকিয়াছেন॥ কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া আঁকিয়াছেন। তাঁহাদের আঁকা ছবি শ্রীচৈতন্যদেবই তাহার প্রমাণ।

মূলতঃ, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় যুগ। এই যুগেই বাংলার সাহিত্য ও সমাজে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখাদিয়াছিল। ইহার মূলে ছিল—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যের আবিভাবের পূর্বে বাঙ্গালীর শিক্ষা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা অন্ধকারের কালো যবনিকা নামিয়া আসিয়াছিল। আর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে সেই অন্ধকার চলিয়া গেল এবং দেখা দিল বাঙ্গালার সমাজ জীবনে ও সাহিত্যে এক নবযুগের নূতন আলো। আর নবযুগের নবজাগরণের ফলে এই যুগের নূতন নামকরণ হইয়াছিল—"চৈতন্যযুগ" বা "চৈতন্য-রেনেসাঁস।" পরাধীন দেশের তো কথাই নাই, কোন স্বাধীনদেশের কোন ধর্মগুরু, কোন জাতির অদৃষ্ট বিধাতা বা দিগ্বিজয়ী বীর অথবা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা—বাংলার এই দরিদ্র গ্রামীণ সন্তানের মত জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে এমন আলোড়ন তুলিতে পারেন নাই। "যোগীপাল, ভোগীপাল—মহীপালের গীত"—আমরা পাই না; তাহা কি বস্তু ছিল তাহা বলিবার উপায়ও নাই, তবে যে কথাটি জোর করিয়া বলা যায়, তাহা হইতেছে—শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক চরিত্রজীবন ও আচরণ বাঙ্গালীর জনমনে এক বৃহত্তর মুক্তির ও আনন্দের পথ খুলিয়া দিয়াছিল। সনাতন অতীতের ধূলিতে রুদ্ধ সৃষ্টি যেন বর্তমানের রূপ রসের মহোৎসবে উম্মুক্ত হইল। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন। তিনি ছিলেন বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং নাগরীভাবের প্রবর্তক ও প্রচারক। "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" প্রণেতা কবি লোচনদাস ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য। এই নরহরি সরকার ঠাকুর গাহিলেন—

"যদি গৌরাঙ্গ না হৈত কেমনে হৈত
কেমনে ধরিতাম সে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে?"

—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই আপন জীবনে দেখাইয়াছেন যে, শ্রীরাধিকার দেবদুর্লভ প্রেম কবি কল্পনা মাত্র নহে; ইহা এই জগতের সত্যবস্তু। ইতিপূর্বে গোঁড়া ও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রচার করিয়াছিলেন যে—ভগবানকে পাইতে হইলে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে করিয়া একাকী গিরি গুহায় পর্বতে কন্দরে সাধন ভজন করিতে হইবে। এইভাবে তাঁহারা বৈরাগ্যময় পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে এই মনোভাবের পরিবর্তন হইল। জনগণ দেখিল ও বুঝিল—সংসার ত্যাগ না করিয়াও সাধন-ভজন করা যায়। কারণ—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেনুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলায় হয় অনুরূপ॥"

৩

কবি রবীন্দ্রনাথ ও বলিয়াছেন—

"হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম-মানুষজাতি।"

আর পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সৃষ্টির ফসল ভারত-পথিক বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।"

"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥"

—মানুষের মধ্য দিয়া এই যে ভগবানের প্রকাশ, ইহা 'বহিঃরাধাও অন্তঃকৃষ্ণের মিলিত রূপ গৌরাঙ্গ সুন্দরের আবির্ভাবের ফল। পদাবলীতে তাই "গৌরচন্দ্রিকার" আবির্ভাব। গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা কীর্তনের উদ্বোধন করা হয়। গৌরচন্দ্রিকা—রাধা ভাবের সহায় গৌরভাবের পদ। গৌরলীলা বৃন্দাবনলীলারই ভাব-প্রতিরূপ। এই গৌরলীলার প্রতিটি স্পন্দন ছন্দোবন্ধনে বাঁধাপড়িয়াছে—গৌরপদাবলীতে এই সকল পদের নাম—গৌরচন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্তনের অবতরণিকা রূপে কীর্তনের আসরে প্রথমে গীত হয়। মর্মজ্ঞ শ্রোতা এই গৌরচন্দ্রিকা জানিবার মাত্রই বুঝিতে পারেন—বৃন্দাবনলীলার কোন পর্য্যায়টি বর্তমান আসরের বিষয়বস্তু। কবি গাহিলেন—"প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগ সার"—এইখানেই বাঙ্গালীর সার্বজনীন নবীনতার বীজ উপ্ত হইল, প্রচারিত হইল—শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম। আশা উৎসাহী বাঙ্গালী এই প্রথম কাব্য-সাধনা-ধর্ম ও মনীষার মধ্যে তাহার অকল্পিত সম্ভাবনাকে খুঁজিয়া পাইল।

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালী সমাজে এমন একটা বড়ো আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না—যাহাকে অবলম্বন করিয়া জাতি মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারে। তখন বাংলা-সাহিত্যের বিষয় ছিল—মামুলি-পৌরাণিক আখ্যায়িকা, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনী, বড়জোর রাধা-কৃষ্ণলীলা পদাবলী। এইরূপ সংকীর্ণ বিষয়ে রসপিপাসুচিত্তে গভীরতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশের তেমন অবকাশ থাকিতে পারে না। নবদ্বীপ ছিল তখন শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু দেশের অগণিত মানুষের সঙ্গে সেই শিক্ষার কোন নাড়ীর যোগ ছিল না। ব্রাহ্মণরাই ছিলেন শিক্ষক ও সমাজপতি। তাই উচ্চকুলের সন্তানরাই কেবল সেই শিক্ষার সুযোগ পাইত। আচার-ব্যবহার সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণদের কঠোর বিধান পালিত হইত। শাক্তদের ধর্ম ছিল—মদ্য-মাংসাদি সেবনে। বর্ণাশ্রম ধর্মের শাসনে-পীড়নে এবং মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে একদিকে যেমন সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনই হিন্দুদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ নানা বিকৃত ও অশালীন আচার-ব্যবহারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের অত্যাচারে সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবনধারণ করা দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মের নামে পশুবলি ও সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার, মদ্য-মাংস আহার লাগিয়া থাকিত—

"মদ্য-মাংস দিয়া কেহ পূজয়ে বাশুলী।"

শুধু নিজেরা খাইত না, দেবতাকেও তাহারা মদ্য-মাংস উৎসর্গ করিত। উচ্চতর ধর্মের কথা ভুলিয়া লোকে তখন চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর উপাসনায় মত্ত থাকিত। তখন পূজার মধ্যে অর্থহীন অনুষ্ঠান আড়ম্বরেই প্রাধান্য ছিল বেশী। দেশে

তখন ধর্মের নামে বেসাতি, ভক্তির নামে ভণ্ডামি, 'জাতের নামে বজ্জাতি' এবং শাসনের নামে অত্যাচার বিরাজ করিতেছিল। ইহারই অবসান ঘটাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব ধর্মজীবনকে উন্নত করিলেন, দেশবাসীকে শেখাইলেন ভগবদ্ভক্তির মহিমা, সূচিত হইল এক নূতন যুগ। আর এই যুগে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন—নবাব হুসেন শাহ। বস্তুতঃ এর আগে আর বাংলাদেশে এমনভাবে মানবমুক্তির উদার আহ্বান কখনও ধ্বনিত হয় নাই। এই আহ্বান অনতিবিলম্বে সাড়া জাগাইল সমস্ত ভারতে, সমস্ত জাতির মধ্যে—শুধু চণ্ডালই নয়, যবনও পাইল প্রেমধর্মে আপনার অধিকার। ফলে সমগ্র দেশেই দেখা দিল এক অপূর্ব ভাববিপ্লব, যার মহানায়ক হইলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। অচৈতন্য জীবকে চৈতন্য নামে জাগাইবার যাঁহার আবির্ভাব—তিনিই তো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ-জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"···এখন আমরা চৈতন্যের জীবনে নব্য-মানবতা, সমাজ-সংস্কার, নীচ জাতিকে উচ্চশ্রেণীতে গ্রহণ করা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, পতিত-পতিতাকে পংক্তিতে স্থান দান ইত্যাদি আধুনিক সমাজ-মানসিকতার প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি।" চৈতন্যদেব মানবিক সম্পর্কের যে নব-মূল্যায়ন ঘটাইলেন, তাহারই ফলে মধ্যযুগের সাহিত্যে দেবতার স্থানে মানুষের আধিপত্য লাভ কতকাংশে সম্ভব হইয়াছে। অন্ত্যমধ্যযুগের সাহিত্যে এই মানবতাবোধই তথা নব-মানবতাবাদ স্পষ্টতঃই চৈতন্যের প্রভাবজাত। চৈতন্যদেবের প্রচেষ্টাতে এই যে বাহিরের দরজা খুলিয়া গেল, তার ফলে বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হইল—

"কীর্তনের আর বাউলের গানে আমরা দিয়াছি খুলি।
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।"

চৈতন্যদেব যুগসত্যকে উপলব্ধি করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমাজের বৃহত্তর অংশে যে ভাঙন দেখা দিয়াছিল, তাহা রোধ করিতে হইলে এমন এক মতবাদ প্রচার করিতে হইবে; যাহা সর্বজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও আচরণীয় হইয়া উঠিতে পারে। অতএব নিছক হৃদয়বৃত্তি হইতে উদ্ভূত প্রেমধর্মের প্রচারই চৈতন্যজীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ভক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত এই প্রেমধর্মে সর্বজীবে আশ্রয়লাভ করিতে পারে। সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় মতবাদের গোঁড়ামি, মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান আদি প্রেমধর্মে স্পষ্টতঃ না হইলেও কার্যতঃ অস্বীকৃত হইল। চৈতন্যদেব স্বয়ং যখন আচণ্ডালে ধরিয়া সেই কোল দিলেন, তখন সমাজের সর্বনাশা ভাঙ্গনের পথ আপনা থেকেই বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পরেই বাংলাদেশে মোঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনেকটা পরিবর্তন আনিয়াছিল। আবার মোগল প্রভাব যখন জাতির দৃষ্টিকে অনেকটা বহির্মুখী করিয়া তুলিয়াছিল, তখন বাংলাদেশে চৈতন্যপ্রভাবই তাহাকে সংযত ও সংহত রাখিয়াছে।

বাহ্যতঃ মনে হয়, চৈতন্যদেব ছিলেন—বৈষ্ণবধর্মের একজন রূপকার। কিন্তু তৎ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ছিল স্বরূপে পৃথক—"গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম" নামে ইহার একটা বিশিষ্ট সত্তা ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বৈদিক যাগযজ্ঞ সমন্বিত কর্মবাদ এবং শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত মায়াবাদকে প্রাধান্য না দিয়া ভক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে—"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"—চৈতন্যদেব নিজের জীবন ব্যাপী সাধনার দ্বারা এই সত্যই

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত এই মতবাদের পশ্চাতে নিহিত আছে এক বিরাট "যুগ সত্য"—যুগের প্রয়োজনে এবং জাতির প্রয়োজনেই এই সত্যদৃষ্টির উদ্ভব ঘটিয়াছিল—এই সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি—আচরণে যে কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার প্রয়োজন হইত, তাহা সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরও সাধ্য ছিল। বস্তুতঃ পরবর্তী যুগে বাংলাদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই ছিলেন—যজ্ঞাদি কর্মবাদের একমাত্র অধিকারী। শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত জ্ঞানবাদও সমাজের উচ্চকোটিতে ছিল সীমাবদ্ধ। শিক্ষা শাস্ত্র আদির চর্চায় সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের কোনই অধিকার ছিল না—অতএব কর্ম আর জ্ঞানের ধারা হইতে সমাজের বৃহত্তর অংশই ছিল রঞ্চিত। তাই নবদ্বীপে নাম-সংকীর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তবে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভু যে সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা করেন, তাহা ঠিক নগর সংকীর্তন নহে—

"দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করহ সভে।"

ইহাই মহাপ্রভুর নির্দেশ। "মৃদঙ্গমন্দিরা শঙ্খ"-সহযোগে দ্বারে দ্বারে পরমোৎসাহে কীর্তন আরম্ভ হইল। কিন্তু একদিন—

"যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে"॥

ইনি চাঁদ কাজী—নদীয়ার শাসনকর্তা, গৌড়ের হোসেন শাহের গুরু। কাজীর সহায় ছিল পাষণ্ডীরা—

"কৃষ্ণের কীর্তন করে নাচ বারবার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন॥"

'পাষণ্ডী'রা এই ভাবে কাজীর দরবারে নালিশ জানাইলে কাজী নাম-কীর্তন নিষিদ্ধ করিলেন। আর ধর্মাচরণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়াতে কাজীর আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন—স্বয়ং চৈতন্যদেব। যে সংকীর্তন ঘরে আবদ্ধ ছিল, তাহাকে তিনি নগর সংকীর্তনে রূপায়িত করিলেন। চৈতন্যদেবের নায়কত্বে সংকীর্তন দল কাজীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলে, ভয় পাইয়া কাজী নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন এবং চৈতন্যের নিকট শপথ করিলেন—

"মোর বংশে যত উপজীবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে॥"

আজকের দিনে আমরা যাহাকে ১৪৪ ধারা বলি, মহাপ্রভু সেদিন এই ধারাই লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুধু সর্বধর্মের মূর্ত প্রতীক ছিলেন না—ছিলেন প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক। আচার্য ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"চৈতন্যের এই উদ্যম ভারতবর্ষে বিরুদ্ধ শাসক শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ।" নামসূত্রেই মানুষে-মানুষে যে গ্রন্থিবন্ধন হইয়াছিল, তদানীন্তন জাতীয় জীবনে বাঙ্গালীর সে এক অপূর্ব প্রাপ্তি। এত বড় অসাধ্য সাধন শুধু ব্যাখ্যান ও প্রচারণার দ্বারা সম্ভব নহে। কবিরাজ-গোস্বামী কথা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

"আপনা আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এই মত ভক্তভাব করি অংগীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥"

গৌরচন্দ্রের মানবপ্রেম অতীব স্বাভাবিক, কারণ, তাঁহার ভগবান মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ। তাহা ছাড়া, মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বে ছিল—কোমল কঠোরের সমন্বয় প্রেমে মানুষকে তিনি যেমন মিলাইয়াছিলেন, তেমনি প্রচণ্ড বিক্রমে বিরুদ্ধ শক্তির পরাভবের দ্বারা তাহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভয়হীন জীবনে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছিলেন। এই শক্তি সঞ্চারের মূল কথা—"আচণ্ডালে কীর্তনসঞ্চার।" এই জন্যই গৌরচন্দ্রের প্রথম পরিচয়—"সংকীর্তন ধর্মের নিধান।" আজও পশ্চিম বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে গৌর-আবাহনে নগর-কীর্তনের আরম্ভ এবং "নগর ভ্রমণ করি গৌর এল ঘরে"তে সমাপ্ত।

সেনরাজগণের সময় হইতেই নবদ্বীপ একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয় এবং এখানকার ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালে নবদ্বীপ অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। "চৈতন্যভাগবত"-কার শ্রীবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাই ॥

*   *   *

নবদ্বীপের ঐশ্বর্য কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ্য লোক স্নান করে।"

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস "মহাবংশ"-এর বর্ণানুযায়ী ২৫০০ বছর পূর্বে শিক্ষায় সমৃদ্ধ নবদ্বীপের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। তখন বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যে নবদ্বীপ ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, স্মার্ত রঘুনন্দন, রামভদ্র সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ, রুদ্রেরাম তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ তর্কলঙ্কার, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি ন্যায়-স্মৃতি পঞ্চতন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ-জগজ্জয়ী পণ্ডিতগণের অধ্যাপনা ও জ্ঞানচর্চার জন্য নবদ্বীপের খ্যাতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুদূরে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুদূর দেশ হইতে ছাত্রগণ জ্ঞানলাভের জন্য নবদ্বীপে আসিত—

"নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥"

কেরী ও মার্শম্যানের ইতিহাস অনুসারে আদিশূর হইলেন—নবদ্বীপের রাজা এবং নবদ্বীপ তখন ছিল রাজধানী নগর। মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প, কাঁসা-পিতল শিল্প তখনকার সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার বুনিয়াদ সেখানকার ব্রাহ্মণরা ছিল শাস্ত্রবিদ। "...Brahmins well versed in the Hindu Shastras and observances" রাজপোষকতায় নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার উন্নতি হইতে লাগিল। রাজপ্রযত্নে কবি ভট্টনারায়ণ-

রচনা করিলেন—"বেণীসংহার" নাট্যকাব্য। ইতিহাসের তারপরের কয়েকটি পৃষ্ঠা হইল অন্ধকার। দেখা দিল দারুণ দুর্যোগ। মাৎসন্যায়। তারপর দীর্ঘদিন পরে নবদ্বীপের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন—পাল-নৃপতিরা। দেশে শান্তি ফিরিল। চতুর্দিকে ধ্বনিত হইল—বুদ্ধং শরণং গাচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। প্রতিষ্ঠিত হইল কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে বৌধচর্চা ও আরাধনার মঠ-সুবর্ণবিহার; কালের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। তারপর সেনরাজারা অধিষ্ঠিত হইলেন নবদ্বীপের ক্ষমতায় নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের সাহচর্যে নৃপতি বল্লালসেন রচনা করিলেন দুইখানি কালজয়ী গ্রন্থ—"অদ্ভুতসাগর" আর "দানসাগর" তাহার পর কালপ্রবাহে নবদ্বীপ তথা গোটা বাংলার বুকে নামিয়া আসিল—মধ্যাহ্নের অন্ধকার, তথা বখ্তিয়ার খিলজীর আবির্ভাব। ইতিহাসের ইহার পরের কয়েকটি পাতা—নির্যাতনপীড়ন আর রক্তরেখায় ক্ষিপ্ত—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ দেখিলে তার জাতিধর্ম লয়॥"

দেশে অরাজকতা আর অস্থিরতার জন্য বিদ্যাচর্চা জীবনচর্চা সঙ্কুচিত হইল, বিনষ্ট হইল পণ্ডিতদের অমূল্যসৃষ্টি হাজার হাজার পুঁথি। আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের সমগ্র জীবন-সাধনার ফল। শতাব্দী ঘুরিল। ইতিমধ্যে হাজার হাজার মানুষ জাতিচ্যুত অবস্থায় মন্দিরের দরজায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে মসজিদে। সনাতন জীবনের বুনিয়াদে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ। মানুষের জীবন পরিচয়ে নামিয়া আসিল ধর্মে, আর মহাপ্রভুর আবির্ভাবে তথা মানবধর্মে—"শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, নদে ভেসে যায়"—জনগণমনে সে এক অপূর্ব উম্মাদনা। নিরাভিমান মহাপণ্ডিত, সর্বত্যাগী অনিন্দ্যসুন্দর একটি তরুণ মানব-সন্তান একদিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া পরম প্রেমে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানবমাত্রকেই আপন বক্ষে টানিয়া লইতেছেন এবং বলিতেছেন—জীবে 'দয়া, নামে রুচি ও' তরোরিব সহিষ্ণুতার কথা—জ্ঞান নয়, ভক্তি, ঘৃণা নয়, প্রেমের কথা। অপরদিকে অখণ্ড ভগবৎপ্রেমে সাশ্রুনেত্রে রোমাঞ্চিত দেহে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন—মানুষের অন্তর্লোকে আলোড়ন তুলিতে ইহাই যথেষ্ট। এই নূতন ধর্মাদর্শের আকর্ষণ অনুভব করিলেন—বামুনপুকুরের চাঁদকাজী, ফুলিয়ার যবন হরিদাস শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য এবং আপামর জনসাধারণ ও শত শত পার্ষদ আর শিষ্যরা। গড়িয়া উঠিল সারা নদীয়ায় বৈষ্ণবতীর্থ। এই ভাবপ্লাবনের অভিঘাতে মনন ও চর্যার নানাঘাত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সূত্রপাত হইল ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনী সাহিত্যের—'কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন।' বন্ধ্যা গীতি সাহিত্যের খাতে প্রবাহিত হইল নূতন জোয়ার। তাহার কল্লোল আজও প্রতিধ্বনিত—

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" □

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের নবদ্বীপ পরিক্রমা

মিহিরকান্তি রায়

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাভূমি আর মানবাত্মার মুক্তিতীর্থ পুণ্যভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন মানসে এলেন পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। সঙ্গে এলেন ঠাকুরের ভাগনে হৃদয়রাম আর রাণী রাসমণি জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস। রামকৃষ্ণদেব যাচাই করতে এসেছিলেন চৈতন্য দেবের অবতারত্ব নিয়ে, জহুরী যেমন জহর যাচাই করে থাকে তেমন। ভাগবত কিংবা পুরাণ গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ নেই চৈতন্যদেব অবতার বলে। তাই শুরু থেকে ভেবেছিলেন বৈষ্ণবেরা তাঁকে টেনে-টুনে অবতার বানিয়েছে। যাক্ সংশয়ের দোলায় চেপে এ যুগের অবতার তাঁর বিগত যুগের অবতারের লীলাভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। একে একে সব ঠাকুর বাড়ী ঘুরেফিরে দেখলেন কিন্তু কোথাও অবতারত্বের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলেন না! শুধু দেখলেন সব জায়গায় এক এক কাঠের মূর্তি দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এতে তাঁর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল, ভাবলেন কেনইবা এখানে এলেন। বিষণ্ণ মনে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবার জন্য নৌকায় উঠতে যাচ্ছেন তখন এক অদ্ভুত দর্শন হল। দেখলেন—তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, একটা করে জ্যোতির মণ্ডল দু'টি কিশোর হাত তুলে তাঁর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসছেন। তিনিও অমনি "ঐ এলোরে—এলোরে" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ও'রা অমনি এসে ঠাকুরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করলো। ঠাকুর তখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন দেখে ভাগনে হৃদয় ধরে ফেললেন! এতে রামকৃষ্ণ দেবকে বুঝিয়ে দিলেন বাস্তবিকই তিনি অবতার আর এটা তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একবার মনে বাসনা হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজন মোহকর, নগর কীর্তন দেখতে। তাই জগন্মাতা তাঁর মনের অভিলাষ পূর্ণ করে দিয়েছিলেন তা দেখিয়ে। দক্ষিণেশ্বরে নিজ ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন—পঞ্চবটীর দিক থেকে ঐ অদ্ভুত সংকীর্তন তরঙ্গ তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে ধীরে ধীরে বাগানের দিকে যেয়ে গাছ-পালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এদের মাঝেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন নবদ্বীপ চন্দ্র গৌরকে, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুকে নিয়ে ঈশ্বর প্রেমে তন্ময় হয়ে ঐ জনতার মধ্যে ধীর পদে অগ্রসর হচ্ছেন। ঐ অদ্ভুত সংকীর্তন দলের মাঝে কয়েকটি মুখ ঠাকুরের স্মৃতি পটে উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল, যা থেকে পরবর্তীকালে ঠাকুরের নিজ লীলাপার্ষদদের মাঝে কয়েক জনকে পূর্ব জন্মে শ্রীচৈতন্য দেবের সাঙ্গো-পাঙ্গো ছিল বলে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

নবদ্বীপে চৈতন্য-লীলা প্রেম প্রবাহ দেখতে একে একে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদেরা। তাঁদের মাঝে রয়েছেন-স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ আর গৌরীমা। স্বামী বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য উদ্ধার মানসে চলে গেলেন দার্জিলিংএ আর মঠ প্রায় একে একে শূন্য হয়ে গেল। এই অবকাশে নবদ্বীপ দর্শন মানসে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের দোল পূর্ণিমায় চলে এলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ। তিনি কৃষ্ণনগর হয়ে নৌকা যোগে নবদ্বীপ ঘাটে নেমে গৌর গোপালের আখড়ায় এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

প্রথম দিনেই গৌর গোপাল আখড়ার সেবায়েত ব্রজবাসীর সংগে গেলেন তখনকার দিনের নামী শিক্ষায়তন 'পাকা-টোল' দেখতে। ঐ সময়ে পাকাটোলে বহু অবাংগালী সন্ন্যাসী ছাত্ররা ন্যায়-শাস্ত্র পড়ত। সেখানকার অধ্যক্ষ পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় স্বামীজীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা করে তাঁর সংগে অনেক শাস্ত্রলোচনা করেন।

এরপর তিনি টোলের অধ্যক্ষ মহাশয় সহ বর্তমান হরিসভা মন্দিরে গিয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহদ্বয়কে পরম শ্রদ্ধাভরে সাষ্টাংগ হয়ে প্রণাম করলেন আর তা'দেখে অধ্যক্ষ মহাশয় বলে উঠলেন—"আপনি সন্ন্যাসী হয়ে ও'দের যে রকম ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, আপনার পক্ষে তা শোভা পায়না" একথা বলার কারণ হ'ল তখনকার দিনের পণ্ডিতেরা মহাপ্রভুকে অবতার বলে মানতেন না, শুধু একজন বড়দরের ভক্ত বলেই গণ্য করতেন। স্বামীজী কিন্তু ওঁদের ধারণার প্রতি একমত হ'তে পারেননি।

আর একদিন স্বামীজী গিয়ে পড়লেন এক বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে। তখনকার দিনে সন্ধ্যাবেলা নবদ্বীপের বিদগ্ধ-জননী পোড়ামায়ের মন্দির চত্বরে পণ্ডিতদের জটলার আসর বসত। সেখানে স্বামীজীকে দেখে কয়েক জন পণ্ডিত এসে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—"মশায়, শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণকে পায়ের ধুলো দেওয়া যায় কি?" এখানে একজন অবধূত* আছেন, তিনি তাই করেন। স্বামীজী অবধূতের কাজে সায় দিলেন আর শুনে ওরা ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে গালা-গালি করতে লাগলেন, নবদ্বীপের ঐ এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অশোভন আচরণে দুঃখিত হয়ে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করে বাসস্থানে চলে এলেন।

এই ঘটনার চার-পাঁচদিন পর তিনি নবদ্বীপ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক তথা পৌরসভার উপ-সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী এবং আরো সুধীজনের সহিত পরিচিত হলেন, আর তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করলেন। সেই সময় এদের মাঝে নবদ্বীপের কেউই স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেন নি তাই ওঁরা স্বামী অখণ্ডানন্দকে দেখে ভেবে নিলেন নিশ্চয়ই স্বামী বিবেকানন্দ ছদ্মবেশে নবদ্বীপ দর্শনে এসেছেন। এইরূপ ভেবে নেবার একটি কারণ ছিল—স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মুখের অবয়ব এবং আলাপ আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। ওরা এসব কারণেই তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বলে ভুল করে ধরে নিয়েছিলেন। যাক পরে অখণ্ডানন্দজী তাদের ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন।

পরম সাধিকা শ্রীশ্রী গৌরীমা ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অন্যতমা শিষ্যা। তিনিও কয়েকবার নবদ্বীপে এসে এই পুণ্যতীর্থকে আরো মহিমান্বিত করেছেন। বৈষ্ণবদের মতে

* শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল অবধূত। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং কলিকাতা, নবদ্বীপ, নলহাটী, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে মহানির্বাণ মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন—"রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত ; নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্" (শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত) অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ ও রাধা একদেহে প্রকট হয়েছেন। তিনিই নিমাই, গোরা, গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—যা বৈষ্ণব মহাজনদের চরম কথা! তাই গৌরীমা গৌরাঙ্গদেবকে পতি ভাবে ভজনা করতেন আর বলতেন—ন'দে আমার শ্বশুরবাড়ী। চলতি পথে কোথাও যদি নিত্যানন্দের মূর্তি চোখে পড়ত তখন ভাশুর মনে করে অবগুণ্ঠন টেনে দিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মন্দিরে গিয়ে গৌরীমা কীর্ত্তনানন্দে গৌরপ্রেমে ভেসে যেতেন।

নবদ্বীপে গৌরীমায়ের সর্বপ্রধান কীর্তি হ'ল হিন্দুসমাজের আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য আবাসিক আশ্রম স্থাপন, যার মধ্যে রয়েছে মাতৃজাতির সেবাব্রত। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুপ্রেরণায় গুরুপত্নীর নামে "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম" নামকরণ করেছিলেন। এই আশ্রমের কর্মক্ষেত্র উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করায় শুধু যে নবদ্বীপবাসীরা উপকৃত হয়েছেন তা' নয়, দূরদূরান্তর থেকে এসে বহু ছাত্রীরা আশ্রয় পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রয়েছে এই আশ্রমে যা দেখলে অন্তরের শ্রদ্ধা আপনিতেই এসে যায়। আজো তা 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।' গৌরীমায়ের নামে আশ্রম বাড়ীর নামকরণ হয়েছে—'গৌরী নিকেতন'। বর্তমানে ইহা নবদ্বীপের ষষ্ঠীতলায় অবস্থিত।

গৌরীমায়ের একান্ত ভক্ত ৺হরলাল ঘোষ নবদ্বীপস্থিত "গৌরী-নিকেতন"-এর স্মৃতিপ্রসঙ্গে লিখেছেন—"কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে মাকে সাধারণতঃ যেভাবে দেখিয়াছি, কলিকাতার বাহিরে অবসর সময়ে মাকে দেখিয়াছি স্বতন্ত্ররূপে—ঠিক সরল শিশুর মত। আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী। বৃদ্ধ বয়সেও মায়ের কত উৎসাহ! কত আদর করিয়া সামনে বসাইয়া মা প্রসাদ খাওয়াইয়াছেন, তাহা জীবনে ভুলিব না। মা কত রকম হাসি-তামাশার গল্প বলিতেন, শুনিয়া হাসিতে হাসিতে দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিত। অথচ এইরকম সাধারণ ছোটখাটো গল্পের মধ্য দিয়াই মা আমাদের অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন, কত ভাবযুক্ত কীর্তন মধুর কণ্ঠে আখর দিয়া তিনি আমাদের শিখাইয়াছেন।"

ঠাকুর আর তাঁর পার্ষদেরা শুধু যে নবদ্বীপ বেড়াতে আসেননি কিংবা আসেননি চৈতন্যদেবকে যাচাই করতে ; তাঁরা এসেছিলেন গৌরপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে আর ভাবীকালের উত্তরসূরীদের জ্ঞানদান ও ভক্তিদান করতে। এই পুণ্য সাধক-সাধিকাদের স্পর্শ পেয়ে নবদ্বীপ আরো উজ্জ্বল মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে ; আর আমরাও ধন্য হয়েছি। □

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ।
২। স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ।
৩। গৌরীমা—শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম।

উনিশ শতকের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ

ড. স্বপন বসু

নবদ্বীপ হিন্দু শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্রভূমি। সামাজিক কোনো আচার বা প্রথা সম্পর্কে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামতের মূল্য অপরিসীম। এই মূল্য বহুদিন ধরেই স্বীকৃত; নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মতির অভাবে অনেক সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়াসই ব্যাহত হয়েছে। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

বিধবাবিবাহ ব্যাপারটা প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজে অপ্রচলিত ছিল না, রামায়ণ-মহাভারতে বিধবাবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, স্মৃতি পুরাণের যুগেও বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থন মেলে। কিন্তু মুসলমান আমলে তা হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরে অপ্রচলিত ও নিন্দনীয় হয়ে উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ঢাকার রাজা রাজবল্লভের ছোট মেয়ে অভয়া ৮ বছর বয়সে বিধবা হলে রাজবল্লভ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করার চেষ্টা করেন। তিনি এর অনুকূলে পূর্বদেশীয় কয়েকজন পণ্ডিতের বিধি ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। ঐ ব্যবস্থা যাতে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী অনুমোদন করেন তার জন্য কয়েকজন প্রধান পণ্ডিতকে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠান। ১৭৫৬ নাগাদ এই উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে যে সভা আহূত হয় তাতে নবদ্বীপের স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক গোপাল ন্যায়লঙ্কার বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা, অপ্রশস্ততা এবং দেশাচার বিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন করে দেন। সুতরাং নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের অনুমোদন না পাওয়ায় এই সময় বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয় নি।

এ ঘটনার বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি এদেশের জনমনকে নাড়া দেয়। সচেতন ব্যক্তিরা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন, বিষয়টির শাস্ত্রীয়তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও পত্রপত্রিকায় লেখালিখি আরম্ভ হয়। শতাব্দীর মাঝামাঝি বিদ্যাসাগর বিষয়টি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। শাস্ত্র সন্ধান করতে গিয়ে তিনি পরাশর সংহিতা থেকে বিধবাবিবাহের অনুকূল একটি বচন উদ্ধার করেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহের পর তিনি এ বিষয়ে জনমত সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। শোনা যায়, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত সংগ্রহের জন্য বিদ্যাসাগর একবার নবদ্বীপে আসেন। এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে গঙ্গাতীরে তাঁর বাসস্থান নির্দেশ করে দেন এবং রান্নার জন্য চাল ও অন্যান্য সামগ্রীর সংগে গঙ্গাতীর

থেকে একটি উচ্ছিষ্ট ম্যাটির পাত্র তাঁকে প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর ইংগিতে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমতের আভাস পেয়ে সে যাত্রা বিনা বিচারেই ফিরে আসেন।

অবশ্য এই বলে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন না। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রচার করে এর পক্ষে বক্তব্য রাখলেন। পুস্তিকাটি বাঙালীসমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে, বিভিন্নজন বিভিন্ন ভাষায় এর প্রতিবাদে অগ্রসর হন।

শুধু বই লিখে ক্ষান্ত না হয়ে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের অনুকূলে এক আইন প্রবর্তনের জন্য ১৮৫৫-র শেষের দিকে ভারত সরকারের কাছে এক আবেদন পেশ করেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে সমর্থন করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন বেশ ক'টি আবেদন আসে, তেমনি এর বিরোধিতা করে আবেদনও কম আসে নি। নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী, বংশবাটি ও কলকাতার ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে একটি আবেদন পেশ করে বলা হয়, এই প্রথা বেদ—পুরাণাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তা এদেশের আচার বিরুদ্ধ এর ফলে ধর্মহানি ঘটবে—কাজেই সরকার যেন এ বিষয়ক কোনো আইন প্রণয়ন না করেন। এইসব প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে ১৮৫৬-য় সরকার বিধবাবিবাহ আইন পাশ করলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কিন্তু এই আইনকে মেনে নিতে পারলেন না, তাঁরা এর বিরুদ্ধে জেহাদ চালাতে লাগলেন। এই জেহাদের মূলে ভূমিকা গ্রহণ করলেন নবদ্বীপের দুই বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন।

নবদ্বীপ এ সময় বাংলার সর্বপ্রধান সমাজ। তবে কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে এখানকার বিদ্বৎসমাজেও দেখা গেছে নানা পরিবর্তন। একদা নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী রাজানুগ্রহের পর্যন্ত তোয়াক্কা না করে জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত থাকতেন; এই চরিত্রভেদ উনিশ শতকে অনেকখানিই অন্তর্হিত। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন এই নবদ্বীপ সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত। তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বই আলাদা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি নিয়ে যখন ব্যাপক আলাপ আলোচনা শুরু হয়, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে নেমে পড়েন। এ বিষয়ে তিনি প্রথম সোচ্চার হন ১৮৫৩-তে। এই সময় বিধবাবিবাহ ব্যাপারটি কতদূর শাস্ত্রসম্মত সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার জন্য রাধাকান্ত দেব তাঁর বাড়িতে এক সভা আহ্বান করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩-র রাধাকান্তের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রায় ২০০ পণ্ডিতের সমাগম হয়। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ব্রজনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সংগে এখানে ভবশংকর বিদ্যারত্নের বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে বিতর্ক হয়। এই শাস্ত্রীয় বিচারে জয়ী হন ভবশংকর বিদ্যারত্ন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বিধবাবিবাহ পুরোপুরি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত, শুধু দীর্ঘকাল তা অপ্রচলিত।

বিচারে যাই সিদ্ধান্ত হোক না, ব্রজনাথ কিন্তু বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেই চললেন। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকা প্রচারিত হবার পর এর বিরুদ্ধে যেসব প্রতিবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে সেগুলির যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেন। এটি পড়ে ১২ নভেম্বর, ১৮৫৫-য় 'সমাচার সুধাবর্ষণে', জনৈক কবিতাকার মন্তব্য করেন, বিদ্যাসাগর এবার যেসব প্রমাণ উপস্থিত করেছেন একেবারে অকাট্য, নাকচ করা সহজসাধ্য নয়। এই কথা বলতে গিয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী ও তার মধ্যমণি ব্রজনাথকে কটাক্ষ করে ঐ কবিতায় বলা হয়ঃ

'সাজ গো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল। / তোমাদের সৌভাগ্যে ঈশ্বর সানুকুল ॥
শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া গোঁড়া অবতার। / চলিতে না পারিবেন বক্র পথে আর ॥
নিবারণ করিবেন কি প্রমাণ দিয়া। / টানাটানী পড়িবেক নবদ্বীপ নিয়া ॥
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন পাইবেন মান। / করিতে হইবে তাকে মূল সূত্র গান ॥
শাস্ত্রীর বিচারসেরে যাত্রা হবে ভারি ॥ / হইবেন ব্রজনাথ নিজে অধিকারী ॥'

ব্রজনাথের বিরোধিতায় অবশ্য বিশেষ কিছু গেল এল না। উনিশ শতকের শেষদিকে নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় বিধবাবিবাহ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, তাঁর উদ্যোগে কয়েকটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপার দেখে যশোর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যরা চিন্তায় পড়লেন। বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা দেখানোর জন্য তাঁরা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও অন্যান্যদের এক সভায় আহ্বান করলেন। ১৮৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নয় ও দেশাচারবিরুদ্ধ এই মর্মে এক ব্যবস্থা লিখে পাঠ করেন, তাঁর বক্তব্যটি 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। এইসব বক্তব্য কতখানি অসার দেখানোর জন্য বিদ্যাসাগর রচনা করলেন 'ব্রজবিলাস'। এটিতে তিনি সরাসরি ব্রজনাথ ও তাঁর বক্তব্যকে আক্রমণ করলেন। ব্রজনাথকে 'নদীয়ার চাঁদ' আখ্যা দিয়ে তাঁর সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে তিনি মন্তব্য করলেন:

'শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন স্মার্ত। সুতরাং ব্যবস্থাদানে যথার্থ অধিকারী! এবং তাঁহার স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু গুণসাগর বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্যবস্থাদান বিষয়ে যারপরনাই যথেচ্ছচারী বলিয়া লোকালয়ে বিলক্ষণ পরিচিত হইয়াছেন, এজন্য কেহ তাঁহার ব্যবস্থায় আস্থা করিতে সম্মত নহেন।'

শুধু ব্রজনাথ নয়, নবদ্বীপের অন্যান্য পণ্ডিতদের সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের ধারণা খুব উঁচু ছিল না। তাই বিধবা-বিবাহের আর এক প্রতিপক্ষ নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্নকেও তিনি ছেড়ে কথা কর্নান। মধুসূদন বিদ্যাসাগরের বিশেষ পরিচিত—কলকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক তিনি। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের প্রায় বছর কুড়ি পরে তিনি 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' নামে একটি পুস্তক লেখেন। এতে তিনি বলেন যে নারীর একবার বিবাহ হয়েছে, কোনো অবস্থাতেই তার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রকারদের অনুমোদিত নয়। কাজেই যে নারী একবার বিধবা হয়েছে তার পুনর্বার বিবাহ কোনো মতেই বৈধ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। পুস্তকটি রচনাকালে তিনি নবদ্বীপের আর এক পণ্ডিত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের সাহায্য গ্রহণ করেন। বইটি ছাপিয়ে তিনি যে ভাল কাজ করেন নি একথা সেকালের এক প্রখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র শর্মা মধুসূদনকে এক চিঠিতে জানান। মধুসূদন ও ভুবনমোহন —নবদ্বীপের এই দুই খ্যাতনামা পণ্ডিত সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কটাক্ষটি উপভোগ্য:

'ইঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান যেমন প্রবল, ধর্মজ্ঞান তদপেক্ষা অনেক অংশে অধিক প্রবল। ইঁহারা ধর্মের জন্য, প্রাণান্ত পর্যন্ত স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। তবে, অর্থের প্রলোভন প্রদর্শিত হইলে, নিতান্ত অসামাল হইয়া পড়েন।'

বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও দীর্ঘদিনের সংস্কার ধর্মহানির আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে বাঙালীসমাজে এর প্রচলন ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে নি। এবং তা না উঠতে পারার পেছনে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের এক বিশেষ ভূমিকা যে ছিল তা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। □

সাম্প্রতিক নবদ্বীপ ঃ একটি পরিক্রমা

জ্ঞানাঙ্কুর গোস্বামী

হুগলি জেলার পশ্চিম তীরে বর্ধমান জেলার ভূখণ্ডের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ভারতের প্রাচীন তীর্থস্থান নবদ্বীপ।

বর্তমানের ভাগীরথী বা হুগলি নদী, বর্ধমান জেলা ও নদীয়া জেলার মধ্যে সীমানা বিভাজনের সূচক রেখা হিসাবে স্বীকৃত হলেও মহাপ্রভুর জন্ম তথা লীলাক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দরুণ নবদ্বীপ নদীয়া জেলার অংশ।

আয়তনের বিচারে শহরের পরিসীমা খুবই ছোটো। উত্তর-দক্ষিণে মোটামুটি ৫½ কি.মি.-এর বেশী নয়; এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩ কি.মি.-এর বেশী নয়। চওড়ায়, পূর্বদিকে গঙ্গার (ভাগীরথী) তীর থেকে পশ্চিমে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন বা রেল লাইন পর্যন্ত এবং লম্বায় দক্ষিণে বর্তমানের 'গৌরাঙ্গ সেতু'-র কাছ থেকে উত্তরে শহরের শেষ সীমা ছাড়িয়ে ঐতিহাসিক 'নিদয়ার ঘাট'* পর্যন্ত শহরটির পৌর বিস্তৃতি। সীমানার বিচারে দেখা যাচ্ছে লম্বাটে ধরনের শহর এটি। ভাগীরথীর সমান্তরালভাবে এর বিস্তৃতি ঘটেছে। ভূ-পৃষ্ঠের বিচারে নবদ্বীপের মধ্যবর্তী ভাগ উঁচু ও চারপাশ ক্রমাবনত। পৃষ্ঠদেশ এইরকম উন্নত থাকার দরুণই সম্ভবতঃ, পৌরাণিকেরা 'কূর্মপৃষ্ঠবৎ নবদ্বীপ' বলেছেন। তাঁরা অবশ্য নবদ্বীপকে নটি দ্বীপভূমির সমষ্টি বলেও চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বর্তমান নবদ্বীপের চেহারায় বা চৈতন্যভাগবত ও অন্যান্য প্রামাণ্য বৈষ্ণব গ্রন্থে নটি দ্বীপের অস্তিত্ব খুঁজে মেলা ভার। তবে একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হল পশ্চিমে নবদ্বীপের শেষ সীমানায় রেল-স্টেশনের একদম কোল ঘেঁষে খড়ি নদীর অবস্থিত। এখন, খড়ি নদীই নবদ্বীপকে বর্ধমান জেলার সীমানা থেকে আলাদা করে রেখেছে। জেলা-সীমানা চিহ্নিত-করণের প্রশ্নে সরকারী পর্যায়েও খড়ি নদীকে দিয়েই সীমানার রেখা টানা আছে। খড়ি নদী বর্তমানে মজে যাওয়া, পরিত্যক্ত নদীখাত ছাড়া কিছুই নয়। এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা এই নদীখাতকে 'মড়ি-গঙ্গা' বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ মরে গেছে শুকিয়ে গেছে যে গঙ্গা। প্রবাদ হল, বর্তমানের খড়ি নদীই নাকি প্রাচীন গঙ্গার খাত। গঙ্গা কালক্রমে

---

* 'নিদয়া' = 'নির্দয়' শব্দের বিকৃত রূপ। কথিত আছে, গঙ্গার এই ঘাট থেকেই নাকি নিমাই শেষ বিদায় নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে নৌকায় যাত্রা করেন! ঘটনা তাৎপর্য থেকেই ঘাটটির নামকরণ 'নির্দয় ঘাট' বা নিদয়ার ঘাট।

গতিপথ পরিবর্তন করায় বর্তমানে তা' শহরের পূর্ববাহিনী হয়েছে। ঐতিহাসিক উপাদানের বিচার-বিশ্লেষণে এই প্রবাদ কিন্তু ধোপে টেকে না। প্রবাদকে স্বীকার করতে হলে বর্তমান শহরের সবটুকুই নতুন গড়া বলে কল্পনা করতে হয়। শহরের প্রাচীন ঐতিহাসিক কয়েকটি নিদর্শনের সঠিক অবস্থান এখনো এখানে রয়েছে। এর ভিত্তিতেই প্রবাদ-কল্পনাকে মান্যতা দেওয়া যায় না। যাই হোক্, বর্তমান প্রসঙ্গে এই যুক্তি-তর্ক টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকু অনুমান করা যেতে পারে শহরের দুদিকে দুটি নদী খাত প্রবাহিত হওয়ায় 'নটি দ্বীপভূমির' প্রবাদ হয়তো কোনো এককালে মিথ্য ছিল না।

কালের গর্ভে, অতীতের ইতিহাসে সেই রমণীয় ভূ-ভাগের রূপরেখা বিলীন হয়ে আছে।

নবদ্বীপের যে ভৌগোলিক পরিসীমার কথা উল্লেখ করা হল তা' স্বাধীনোত্তর নবদ্বীপ পৌরসীমার। এখন, পরিসীমা এক থাকলেও বিগত তিরিশ বছরে শহরের চেহারার ও লোকেদের বৈপ্লবিক পরিবর্তন (Radical change) ঘটেছে। এদিক থেকে বিচার করলে, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের নবদ্বীপ আর বর্তমান শহর নবদ্বীপের কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) বারে বারে জাতিগত সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার বলি হয়ে কয়েক লক্ষ মানুষ এই গৌরভূমিতে আশ্রয় নিয়েছেন। গৌর মাটিতে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা এই মাটিতেই 'সোনার বাংলা' রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন। পূর্ববঙ্গীয়দের প্রবেশে নবদ্বীপের পরিবর্তন এসেছে। চৈতন্যভাগবতে কথিত বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'গ্রাম নবদ্বীপ' চল্লিশের মাঝামাঝিতেও মূলত মফঃস্বলের এক সমৃদ্ধশালী গ্রামের চিত্রই তুলে ধরে। স্বাধীনতার পর নবদ্বীপ পৌর-শাসনে এলেও কয়েকটি পিচ-ঢালা রাস্তা পানীয় ও পয়ঃস্ব্যবস্থা ও সীমিত কিছু অন্যান্য পৌর-ব্যবস্থার মধ্যেই শহর ছিল সীমাবদ্ধ। এমনকি পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ ও ষাটের দশকের গোড়ার দিকেও সমস্ত নবদ্বীপ পরিক্রমা করলে গ্রামীণ নবদ্বীপের এক সত্তা আবিষ্কার করা যেত। আর ছিল গঙ্গার প্রশান্ত তীর বা চর। পূর্ণিমার রাতে অজস্র পুণ্যার্থী ও প্রকৃতি-প্রেমী গঙ্গার নির্মল চাঁদিনি শোভা দেখতেন। এখন সেটি দুর্লভ। অতীতের অনেক চিহ্নই আধুনিক নবদ্বীপ সযত্নে সরিয়ে রেখেছে তার রত্নপেটিকায়। আধুনিক নবদ্বীপের পিচ ঢালা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অজস্র যানবাহনের ভীড়ঘাড় ছোটাছুটিতে, ব্যস্ত মানুষের ত্রাস্ত আচরণে, আধুনিকীকরণের বেড়োজালে, জনসমস্যার চাপে, কর্মমুখী জনতার কোলাহলে ও তাদের নানা সমস্যায় নবদ্বীপ আজ আকুল। তবুও নতুন মানুষের ছোঁয়ায় নবদ্বীপের সজীবতা আজ অন্য খাতে বইছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকেনি এই গৌরভূমিও। এখনকার নবদ্বীপ লক্ষ লোকের জীবিকার তথা বাণিজ্যের মুখ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনৈতিক ভাবনার সাথে ধর্মীয় ভাবনার এক অনন্যসাধারণ মেল-বন্ধনে নবদ্বীপ আজ আরো বরণীয় হয়েছে। গৌড়ীয় ভাবনার, গৌড়ীয় প্রীতিবন্ধনের এক পরম রমণীয় ভূমি হয়ে উঠেছে বর্তমানের নবদ্বীপ। যার চোখ আছে, অনুভূতি আছে, সে দেখে, বোঝে। অন্যে নয়।

বর্তমান নবদ্বীপের মূল আকর্ষণ তথা দর্শনীয় স্থান হল মহাপ্রভুর মন্দির। নবদ্বীপের মধ্যস্থলের উত্তরাংশে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের দারুময় বিগ্রহ এই মন্দিরে চির-সেবিত হচ্ছেন। মন্দিরের বিগ্রহের সামনে কাঁচের বাক্সে সযত্নে রক্ষিত কাঠের পাদুকাটি (খড়ম) পরম মূল্যবান বলে বৈষ্ণবসমাজে বিবেচিত। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস: এই খড়মটিই মহাপ্রভু গৃহত্যাগের আগে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দান করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আগে—শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান কোনটি ? মহাপ্রভু কি নবদ্বীপেই জন্মেছিলেন, অথবা মায়াপুরে ? এই প্রশ্নে বৈষ্ণবগুরু ও পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। একদল বলেন নবদ্বীপ। অন্যদল বলেন মায়াপুর। মায়াপুরে জন্মস্থানের মতের সমর্থক হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কিছু শাখা। রয়েছেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়। রয়েছেন বৈষ্ণবগুরু এ. সি ভক্তিবেদান্ত মহারাজের প্রবর্তিত 'ইসকন' সম্প্রদায় এবং আরো অনেক ধর্মগুরু। ইসকন ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি এ সম্পর্কে নিজ নিজ প্রকাশনার নানা বইতে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাই বিশদে প্রশ্নটি আলোচনা না করে বলা যায়, মায়াপুরবাদীরাই সংখ্যায় ভারী। ব্যক্তিগত ভাবে বর্তমান লেখক মায়াপুরবাদীদের সমর্থন জানাতে পারেনি। কারণ, পণ্ডিতের যুক্তিতর্ক অপেক্ষা সাধুর অনুভব বেশী প্রামাণ্য ; সাধুর অনুভব 'যথার্থ' অনুভব। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবদ্দশায় একবার নবদ্বীপ দেখতে এসেছিলেন। নৌকায় করে আসার সময় মায়াপুর বা নবদ্বীপে সংক্ষ্যে বিরাজিত চৈতন্য-মাহাত্ম্যে তাঁর ভাবাবেশ না আসায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন নৌকায় উপস্থিত শ্রীম ও অন্যান্যদের কাছে। কিছুক্ষণ পর নৌকাপথে নবদ্বীপের আরো উত্তরাংশে যাবার পর গঙ্গাগর্ভের এক বিশেষ জায়গায় তাঁর ভাবাবেশ আসে। এই স্থানটিতে 'নিমাই' জন্মেছেন বলে তিনি পরে মত প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্য অনুসরণে দেখা যায় ঐ জায়গাটি নদীগর্ভে। অর্থাৎ 'নিমাই' এর আসল জন্মস্থান গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

অতএব, এর চূড়ান্ত বিচারের ভার রইল অনুভবী ভক্তদের ওপর। অনর্থক বাগাড়ম্বর বৃথা।

নবদ্বীপের দ্বিতীয় প্রধান বৈষ্ণব পীঠস্থান হল মহাপ্রভুর লীলাপার্ষদ শ্রীনিবাস ঠাকুরের বাড়ি। চৈতন্যভাগবতের আখ্যান অনুযায়ী বর্ণনার মিল এখনো বাড়িটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। বাড়ীটির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি। তদানীন্তন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণববিরোধী শাক্তদের উৎপাত থেকে হরিনাম-সঙ্কীর্তনের স্রোত অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর আদেশে বাড়ীর বাইরের সীমানায় এক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। সেই প্রাচীর আজো বর্তমান। বাড়ীর ভিতরে 'অক্ষয় বৃক্ষ' শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করে আজো ভক্তদের অনুকম্পা প্রদর্শন করে। মহাপ্রভুর নাম সঙ্কীর্তনে এ বাড়ির প্রতি ইঞ্চির মাটি পবিত্র রজঃতে পরিণত। তাইতো, এই পীঠের কাছাকাছি, প্রায় উল্টোদিকে সিদ্ধ বৈষ্ণব রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীমশায় তাঁর সাধন-কুটীর তৈরী করে মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। এই সাধন কুটীরেই তাঁর লৌকিক দেহপাত ঘটে। ললিতা সখীর ভাবনায় ভাবিত তিনিও, শ্রীরামকৃষ্ণের মত তিনি সখীসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ'জন্য তাঁর সাধন-কুটীরে নির্মিত প্রতিমূর্তিতে তাঁকে স্ত্রীবেশে দেখা যাবে। তাঁর এই সাধনকুটীর "সমাজ বাড়ী" নামে খ্যাত। সমাজবাড়ীর বিখ্যাত অনুষ্ঠান 'অন্নকূট'।

নবদ্বীপের অন্য এক আকর্ষণ হল—শান্তিপুরের 'আউলের' ডেরা। সেই 'আউল' অন্য কেউ নয়। গৌরাঙ্গ তত্ত্বের "সাড়ে তিনজন" সমঝদারের প্রধান সমঝদার অদ্বৈত আচার্য। এটি অদ্বৈতবাড়ী বলে নবদ্বীপে পরিচিত। তবে এই বাড়ীর সব নির্মানই আধুনিককালের। পুরানো ঐতিহ্য বা চিহ্ন অনুপস্থিত।

নবদ্বীপ শুধু বৈষ্ণবদেরই মহাতীর্থ নয়। শাক্তদেরও পুতভূমি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌরাঙ্গের জন্মের পর তাঁর লীলা-সাহচর্যে, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের প্রচারে, প্রসারে,

অনুশীলনে নবদ্বীপ বৈষ্ণবদের তীর্থে পরিণত হয়। কিন্তু তারও আগে নবদ্বীপের মূল ধর্মীয় ভাবটি ছিল শাক্ত। এছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে নবদ্বীপে সকল ধর্মের প্রবক্তারাই আসতেন নিজ ধর্মের মাহাত্ম-প্রচারে, ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করতে। কেউ বা আসতেন শিক্ষা সংস্কৃতি গ্রহণের কারণে। তার ফলে নবদ্বীপে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব—এই তিন ধর্মেরই পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এখানে শৈব মূর্তির পাশাপাশি রয়েছে কালীমূর্ত্তি। তারই কাছে রয়েছে বৈষ্ণবীয় পীঠ। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিবাদের ফলে, সর্ব ধর্মমত গ্রহণ করার আদর্শ ও সহিষ্ণুতার জন্যই পরস্পরবিবদমান তিন ধর্ম সম্প্রদায়ের মূক্তির এই সান্নিকট্য।

এখানে এসেছিলেন মহাপুরুষ সিদ্ধ তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। ভারত-বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থ 'তন্ত্রসার'-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দই দেশে কালীমূর্তির প্রথম প্রচলন করেন। তাঁর কালীমূর্ত্তি প্রচলন করার ইতিহাস অবশ্য পৃথক।

আগামবাগীশের স্থাপিত শক্তিমূর্ত্তি 'আগমেশ্বরী' নামে নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ। তাঁরই নামানুসারে অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছে আগমেশ্বরী পাড়া। বাজারটির নামও তাই। এই আগমেশ্বরী মন্দির নবদ্বীপের ঐতিহাসিক স্থান। মন্দিরসংলগ্ন আগমবাগীসের বসত ভিটে, ভোগবাড়ী ইত্যাদি। সেগুলি আজ কালের হাতে নিমজ্জমান। রাস্তার সংলগ্ন বাড়ীর অংশে নানা দোকান-পাট হয়ে বাইরে থেকে এ বাড়ীর অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাসু দর্শক মন্দিরের পুরোহিত বর্ষীয়ান স্থানীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভিটেমাটি দেখে যান। লক্ষনীয়, এই আগমেশ্বরী পাড়াতেই মহাপ্রভুর মন্দির অবস্থিত। আগেই বলেছি, স্বতঃউৎসারিত ভক্তিবাদের ধারায় নবদ্বীপ—জনমানসের চেতনা পরিপুষ্টি লাভ করায় আজো পরস্পর বিরোধী দুই তন্ত্রের মহাপীঠ একই পাড়ায় ১০/১২ টি বাড়ীর ব্যবধানে অবস্থিত রয়েছে। এটিই নবদ্বীপ তত্ত্বের মূল রহস্য। নবদ্বীপস্থ ভাগবত রসের আঙ্গিক।

শাক্তদের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হল 'পোড়ামা'। এক সুপ্রাচীন বিশাল বটগাছের গুঁড়ির ফাঁকে 'পোড়ামার' ছোট গর্ভগৃহ বর্তমান। পুরাণে বর্ণিত 'নীল সরস্বতীই' হলেন এখানকরে পোড়ামা। এখানে নাকি তাঁর আদিপীঠ বর্তমান ছিল। এটি তখন ছিল রাখালদের গোচারণভূমি। কৌতুকবশতঃ খেলার ছলে কোনো রাখাল বালক লতাপাতা কুড়িয়ে গাছের গায়ে জড়ো করে আগুন লাগায়। সেই থেকে সরস্বতী হলেন পোড়ামা। আরো অদ্ভুত, দেবী বর্ত্তমানে সরস্বতীরূপে নন, ভগবতী কালীরূপে পূজিত হন। দেবীর স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত কোন ব্রাহ্মণের বংশধরেরা আজো পুরুষানুক্রমে এঁর সেবক। পোড়ামা নবদ্বীপ শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। অঞ্চলেরও নামকরণ হয়েছে—পোড়ামাতলা।

পোড়ামার ঠিক পাশেই রয়েছে ভগবতী ভবতারিণীর মন্দির। ঘোররূপা, ভীষণ দর্শনা দেবী এখানে পুরুষালী ঢঙে বস্ত্রপরিহিত হয়ে পদ্মাসনে মহাদেবের বক্ষে আরূঢ়। মহাদেবও পদ্মাসনে শায়িত। হাত দুটি ভেঙে মাথার তলায় বালিশের ভঙ্গীতে রাখা আছে। শক্তির বহুমূর্ত্তি বিভিন্ন ঢঙে ভারতবর্ষে দেখা যায়। কিন্তু ভবতারিণরি এইরকম আসন-করা ভয়-জাগানো মূর্ত্তি সমগ্র ভারতে দুর্লভ। তাই দর্শকরা এই মূর্ত্তি দর্শন করে বিহ্বল, বিস্মিত হন। নবদ্বীপবাসীরাও এই মহাদেবীর মণিমন্দিরের রত্নাবেদীতে অবনত মস্তক হন।

ভবতারিনীর আগেই রয়েছে তিলেশ্বরের বিশালাকৃতি লিঙ্গ। ইনি নাকি রোজ তিল তিল করে বাড়ছেন। ভক্তজন পোড়ামা-ভবতারিনী দর্শনের আগে উত্তরাভিমুখী হয়ে,

তিলেশ্বরের কাছে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে তারপর পোড়ামা-ভবতারিণীর দর্শনে যান। উত্তরাভি-মুখী হয়ে পোড়ামার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করাই হোল রীতি।

এ তো গেল নবদ্বীপের দেব-দেবীর দর্শণীয় স্থান। ভাববিনিময়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন মণিপুর—রাজপরিবার। মণিপুর রাজবাড়ি হল নবদ্বীপের অন্যতম ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান। মণিপুরের তৎকালীন রাজা ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে মহাপ্রভুর চরণ-শরণ করেন। গৌরচাঁদের সান্নিকট্যে কৃচ্ছ্রসাধনে, ভজনপূজনে জীবন অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবাহন-বংশধর মণিপুরে নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে এক বিশাল ভূমিখণ্ডের ওপর তাঁর সাধন-মন্দির গড়ে তোলেন। মহাপ্রভু এখানে নিত্য পূজিত। কথিত আছে, মন্দিরের চূড়াটি এককালে সোনা দিয়ে বাঁধানো ছিল। বর্তমানে অবশ্য সোনার দানা-কণাও খুঁজে পাওয়া ভার। তবে পেতলের অস্তিত্ব আগে ছিল। সোনা দিয়ে মন্দির-চূড়া করার জন্য আজো "মণিপুরের সোনার মন্দির" বলেই রাজার মন্দিরটি বিখ্যাত হয়ে আছে।

রাজার বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণের ফলে মণিপুরের সাধারণ মানুষেরাও দলে দলে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। এজন্য নবদ্বীপে রাজমন্দিরের সংলগ্ন জমিতে এক মণিপুরী কলোনী এখন গড়ে উঠেছে। এখনো মণিপুরী ভক্তদের আসা যাওয়ার প্রাচীন স্রোত অব্যাহত গতিতে চলেছে।

এগুলো ছাড়াও সমস্ত নবদ্বীপ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে নানা মন্দির। মুসলমান—শাসনের প্রভাবে এখানে মুসলমানের মসজিদের অস্তিত্বও আছে। সম্ভবত ষোড়শ শতকের প্রথমেই মুসলমান নবাবের শাসনের সময় এইসব মসজিদ আত্মপ্রকাশ করে। কালক্রমে সেগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তবে একটি কথা বলে রাখা ভাল, নতুন গড়ে ওঠা ঐ সব হিন্দু মন্দিরের কোনটিরই ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই।

হালফিল নবদ্বীপের শাক্ত—কৌল সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে অন্যতম হলেন নিত্যানন্দ অবধূত। নবদ্বীপ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাছে তুড়োপাড়ায় এই মহাপুরুষের বাসগৃহ ও সিদ্ধপীঠ রয়েছে। এটি শাক্ত অবধূত সম্প্রদায়ের পবিত্র তীর্থ। অবধূতজীর দেহত্যাগের পর তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যরা অবশ্য মণিপুর রাজবাড়ীর আগে দেয়ারাপাড়ায় এক মন্দির নির্মাণ করে সাধন ভজন চালিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমানে বৈষ্ণব সিদ্ধপুরুষদের অন্যতম হলেন প্রভুপাদ তিনকড়ি গোস্বামী। এই মহাসাধক ১৯৮৭-র শীতকালে তাঁর লৌকিকলীলা সংবরণ করেন। মণিপুর রাজবাড়ীর দক্ষিণে গঙ্গার ঘাটের রাস্তায় গোস্বামীজীর বাসগৃহ ও মন্দির রয়েছে। আর রাজবাড়ীর উল্টোদিকে তাঁর স্থাপিত বিশাল মন্দিরে মহাসমারোহে রাধাগোবিন্দজী নিত্য সেবিত হন। আধুনিককালের বৈষ্ণবদের এটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

বারো মাসে তের পার্বণ নবদ্বীপে। ফলে উৎসবের হাওয়া এখানে লেগেই রয়েছে। উৎসবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ ঝুলন-উৎসব, দোল-উৎসব (হোলি) এবং রাস-উৎসব। এইসব উৎসবে অজস্র ভক্তের সমাবেশে নবদ্বীপ তার পুরনো মহিমা ফিরে পায়। এটি তখন হয়ে ওঠে এক মহামিলন ক্ষেত্র। বিশেষত রাস-উৎসব বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার ঠিক পরের পূর্ণিমায় (গুরু নানকের জন্মদিন) নবদ্বীপে রাস উৎসব হয়। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার স্মরণে এখানে এদিন এই অনুষ্ঠান

হয়। রাসে প্রতি পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন দেব-দেবীর বিশাল বিশাল মূর্তির পূজো হয়। পরদিন শোভাযাত্রা সহকারে মূর্তি-বিসর্জন। রাস মূলতঃ বৈষ্ণবদের হলেও নানা শক্তি মূর্তির পূজোও রাসে হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈষ্ণবদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব থেকে নবদ্বীপকে উদ্ধার করার প্রয়াসে শাক্তরা এদিন মদ্যমাংস সহকারে শক্তিপূজো শুরু করে। সেই মদ্য-মাংস পূজোর ধারা আজো নবদ্বীপে অব্যাহত। আমার মনে হয়—'এহ বাহ্য'। চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদের কল্পশাখাতেই শক্তিপূজো আশ্রয়লাভ করেছে। অন্যথায়, রাসে পূর্ণিমার দিন কালীপূজো—পদ্ধতি ভারতের অন্য কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া, শুধুমাত্র ঈর্ষার বশে, কুটিল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শক্তিপূজো শুরু হলে এতদিন ধরে তা' টিকে থাকতো কি? এইভাবে রাসে উভয় প্রধান সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজো ও স্ব স্ব মতাবলম্বী ভক্তদের ধর্মমত অনুযায়ী আচার-আচরণ রাসের আকর্ষণকে কারো মতে বাড়িয়েছে, জাঁকিয়েছে। কারো কারো মতে 'উৎকট' করেছে। তবু রাসে প্রায় শ' তিনেক নানা সম্প্রাদায়ের মূর্ত্তি পূজিত হয়। শক্তি-মূর্ত্তিদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল : শবশিব, মহিষ-মর্দিনী, কালী, নবদুর্গা, ভারতমাতা। বৈষ্ণবদের হল মূলতঃ রাধাকৃষ্ণ ও এতৎ সংক্রান্ত। এছাড়া রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বর্ণনা অবলম্বনে তৈরি নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি। যেমন—পার্থসারথি, মহিরাবণ বধ, কমলে-কামিনী, গঙ্গা ইত্যাদি।

সমস্ত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে শবশিবের মূর্ত্তিটি অসাধারণ। শবের ওপর শিব শায়িত। তার ওপর করালবদনা কালী বিপরীত রতিতে আসক্তা। বস্তুতঃ দক্ষিণা কালীর আসল মূর্ত্তিটি এরকমই। কালিকা পুরাণে কালীর যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে শবশিব তারই মূর্ত্তিময়ী বিগ্রহ। তুলনীয় :

"কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্মভয়ানকাম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্মকামার্থ সিদ্ধিদাম্।"

রাসে মূর্ত্তিগুলি ২০ থেকে ৩০—৩৫ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই রকম লম্বা মূর্ত্তি ভারতে সচরাচর চোখে পড়ে না। আর, এইরকম লম্বা লম্বা মূর্ত্তি নিয়ে শোভাযাত্রাও এক দর্শনীয় ব্যাপার। তাই মাত্র একদিনের পূজো হলেও মূর্ত্তিগুলির বৈশিষ্ট্য, ভাস্কর্য, চারুকলা ও শোভাযাত্রা দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তদের টেনে আনে।

এখনকার পর্যটকরা নবদ্বীপ আসেন গৌরাঙ্গ-নির্যাস যেমন গ্রহণ করতে, তেমনি তাদের কাছে অন্য আকর্ষণ রয়েছে মায়াপুর ইসকন-মন্দির। আবার যাঁরা মায়াপুর আসেন তাঁদের অন্য আকর্ষণ থাকে নবদ্বীপ। এই ভাবে নবদ্বীপ ও মায়াপুর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসকনের প্রচার, ঐশ্বর্য ও মন্দিরের ভাস্কর্য পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। আব দেশী পর্যটকরাও নবদ্বীপে এসে সাহেব—বৈষ্ণব দেখার সুযোগ ছাড়েন না। বস্তুতঃ ইসকন্—কর্তৃপক্ষ মায়াপুরে বিশাল জমির ওপর আকাশ চুম্বী মন্দির ও সুবিশাল বাসগৃহ গড়ে তুলেছেন। আর গড়ে তুলেছেন এক রমণীয় চিড়িয়াখানা। হরিণ, হাতি, নানা জাতের পাখি, ময়ূর এই চিড়িয়াখানায় রয়েছে। মন্দিরের ভাস্কর্য, তদুপরি বিগ্রহের রমণীয়ত্ব ও প্রয়াত প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্তের লৌকিক প্রস্তর-বিগ্রহের সজীবত্ব দর্শকদের মোহিত করে বৈকি। এছাড়া, মায়াপুরে অন্যান্য বৈষ্ণব—মন্দির বাদ দিলেও, গৌড়াধিপতি বল্লাল

সেনের পুষ্করিণী, বল্লাল—ঢিপি ঐতিহাসিকদের এক দর্শনীয় স্থান। সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বল্লাল ঢিপি খননের কাজ হাতে নিয়ে প্রচুর ঐতিহাসিক মূল্যবান দ্রব্য ও তথ্য উদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন। খননকার্য এখনো চলছে। আবিষ্কার করা গেছে, এক রমনীয় অট্টালিকা, স্নানাগার, পয়-প্রণালীর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

নবদ্বীপ ধর্মকেন্দ্র। তীর্থস্থান। তাই এখানকার অধিবাসীদের জীবিকার সংস্থানও অনেকটা যাত্রী-কেন্দ্রিক শিল্প ও পেশার মাধ্যমে সম্পন্ন হত। এর ফলে, প্রাচীন নবদ্বীপের সমাজে শ্রেণী-ভিত্তিক পেশা গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণেরা যজন-যাজন-অধ্যাপনা, গুরুগিরি ইত্যাদিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিশেষত এখানকার ব্রাহ্মণ গোস্বামী-সম্প্রদায় তো গুরু-গিরিতেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। আর রয়েছে পাল-পার্বণে পুজো-অর্চনার জন্য পুরোহিত-সম্প্রদায়। রাজবংশীরা কাঁসা—শিল্পে যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কলাকৃতির ছাপ রাখতে পেরেছিল। তীর্থযাত্রীর মনোহরণে নবদ্বীপের কাঁসা-শিল্প উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। তীর্থ প্রয়োজনের অঙ্গ হিসাবে মৃৎ-সামগ্রীর চাহিদা মেটাতে গড়ে উঠেছিল কুমোর—সম্প্রদায়। এঁরা 'পাল' উপাধিতে সমধিক পরিচিত। এঁদেরই অন্য এক সম্প্রদায় মূর্ত্তি নির্মাণে দেশ-বিদেশের প্রসংশা অর্জন করেছে। কৃষ্ণনগর প্রচলিত ছোট পুতুলের জন্য বিখ্যাত আর নবদ্বীপ বৃহৎ আকারের জন্য। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শহরের মৃৎশিল্পে এই তফাৎ। এছাড়া, তৈরী হয়েছে বেনের সমাজ,—যাঁরা দশকর্মা জিনিস বিক্রি করে থাকেন। তেমনি একদল লোক পরিবহনের সাথে, অন্যদল দালালির সাথে নিজেদের যুক্ত করেছেন। অনেকে যুক্ত হয়েছেন ধর্মশালা, তীর্থশালা, হোটেল পরিচালনার পেশায়। কিন্তু এইসব পেশা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। তাই নবাগত, অনিশ্চিত—ভবিষ্যৎ সেইসব বঙ্গজেরা এখানে এসে নিজেদের পূর্বতন পেশায় নিযুক্ত হলেন। এঁদের অধিকাংশই তাঁতশিল্পের প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর বা ততোধিক কালে এই শিল্প নবদ্বীপে ক্রমোন্নত হয়ে আজ এক অত্যুন্নত কুটির শিল্পের নমুনা হয়ে উঠেছে। মূল নবদ্বীপ শহর ছাড়াও তার আশেপাশে এই শিল্প ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়ে এক নতুন অর্থনৈতিক জোয়ার এনেছে। ঘটেছে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। এখানকার তৈরী টাঙ্গাইল, সিল্ক—টাঙ্গাইল ধনেখালির শাড়ি, গামছা লুঙ্গি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এখন সমাদৃত। তাঁতশিল্পের ব্যাপক প্রসারলাভ এই শিল্পজাত পণ্যের বিপনণের জন্যও নবদ্বীপে বিরাট তাঁত-কাপড়ের হাট গড়ে উঠেছে। প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ টাকার বিকিকিনি এই হাটে হয়। পূর্ববঙ্গজদের নবদ্বীপ আগমনে তাঁতশিল্প মুখ্য কুটির-শিল্পে হিসাবে যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি তাঁতশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নানা আনুষঙ্গিক ব্যবসাও গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন নানা দোকান। পুর প্রশাসন এঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আরো সচল হয়েছে। উদ্যোগী হয়েছে শহরের ব্যাপক পৌর উন্নতি সাধনে। সুখের কথা, এই পূর্ববঙ্গজ, ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই (অন্তত ৮০%) গৌর-প্রেমে, বৈষ্ণবীয়—আর্ত্তিতে ভরপুর। তাই নিজের নিজের পেশা চালিয়েও এরা নবদ্বীপের সনাতনী বৈষ্ণবীয় ভাবের ধারাটিকে অম্লান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্ববঙ্গীয়রাও এখন নবদ্বীপীয় ভাবের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছেন।

নবদ্বীপের সনাতন ব্রাহ্মণ গোস্বামীদের কুলগুরুগিরি ও অর্থোপার্জন বৃত্তি নতুন অর্থনৈতিক জোয়ারে খানিকটা স্তব্ধ হয়েছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ প্রকাশ করলেও এই

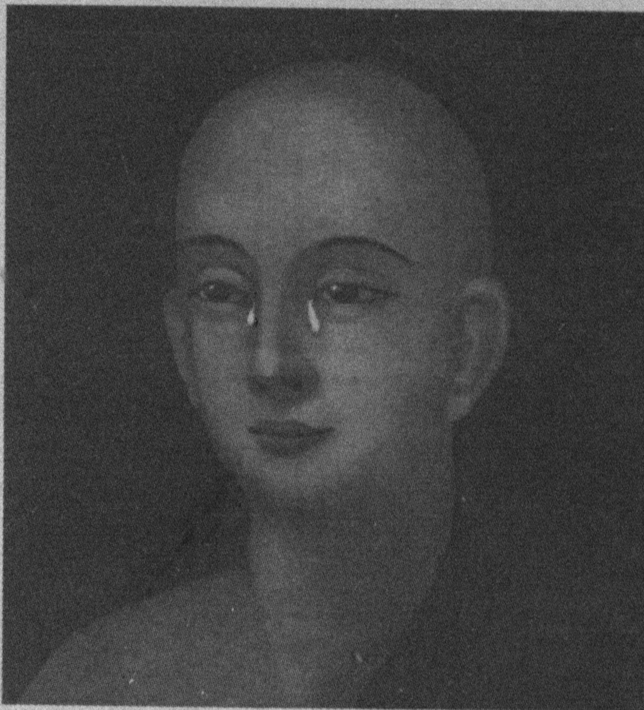
অভিযোগ সমকালীন নয়। কারণ নবদ্বীপের আধুনিক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ফলে গুরুগিরি পেশার আয় কিন্তু কমেনি। গুরু হওয়ার জন্য চাই আধ্যাত্মিক যোগ্যতা, ভাবানুরক্তি। এটি এককালে এখানকার গোস্বামী প্রভুপাদদের কুলভূষণ ছিল। ছিল তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা। তাই তারা অনুকরণীয় ছিলেন। কিন্তু কালের স্রোতে বংশপরম্পরায় সেই ভাবের স্তিমিত গতি হলে অন্যেরা দায়ী হবেন কি? 'নাসৌ স্থানুরয়ং অপরাধো যদন্ধেনং ন পশ্যতি'॥ (অন্ধ যে হোচট খায় তার জন্য উঠোনের খুঁটি কি দায়ী?)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারায় নবদ্বীপের সংস্কৃতি বর্ধিত? বিকশিত হয়েছে। বর্তমানে রাজনীতির চলমান প্রভাব অবশ্য নবদ্বীপ অস্বীকার করতে পারেনি। এখানকার মানুষ রাজনীতি সচেতন হয়ে বরণ করে নিয়েছেন এখন এক উচ্চ রাজনৈতিক ভাবধারা যা দলের, দেশের সার্বিক মঙ্গলে সক্ষম। এই রাজনৈতিক ভাবধারা মানুষকে অর্থনৈতিক একচেটিয়াবাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে শিখিয়েছে। আজ সংসারে বশীভূত না থেকে এক অখণ্ড অর্থনৈতিক চেতনার আলোকে এগিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। লক্ষনীয় এই চেতনা কখনই সমগ্র নবদ্বীপবাসীর বর্ণিত চেতনায় অনধিকার প্রবেশ করেনি। তাই এখানকার সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক চেতনার ঢেউ অল্পবিস্তর এসে পড়লেও তা কখনই প্রাচীন সংস্কৃতিকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই তো নবদ্বীপে আজ সর্বত্র সম্ভাষণ সম্বোধনে শোনা যায়—"জয় রাধে—জয় গৌর"। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল শূদ্র নির্বিশেষে সকলেই এই গৌরভাবনার গৌরভজনায় অধিকারী। গৌরচেতনায় উদ্বুদ্ধ নদীয়ার অধিবাসীদের বুলিই আদর্শ বাংলা (Stand dialect) হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

মণিপুরী সমাজও নবদ্বীপের এই বৈষ্ণবীয় প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেননি! মণিপুরী নাচে, গানে, সাহিত্যে বাংলার ভাষা গৌড়—সমাজের এক প্রবল প্রভাব আজো সুস্পষ্ট।

উৎকলবাসী সম্প্রদায়ও নবদ্বীপের গৌর সংস্কৃতিতে যথেষ্ট আপ্লুত। উৎকলের সাহিত্য ভাবনায়, ভাস্কর্যে নন্দন শিল্পে বাংলার প্রভাব, তথা গৌর চিন্তার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয়েছে। রায় রামানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এঁদের অনেকেই আজ গৌর-মধুর রসের আস্বাদনে ডুবে আছেন। রাধাভাবের আস্বাদনে এই উৎকলবাসীরা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন—"বৃন্দাবনবাসী নয়নপথগামী ভবতু মে"। অসমবাসীদের মধ্যেও চৈতন্য-দেবের মাধ্যমে নবদ্বীপ সংস্কৃতি আজ সম্প্রসারিত। □

□ প্রসঙ্গ ঃ শ্রীচৈতন্য



তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়া সদা হরিঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্য নির্দেশিত মত ও পথ

কৃষ্ণকুমার পালচৌধুরী

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি আমার নাথ তিনিই জগতের নাথ, যিনি আমার গুরু তিনিই জগতের গুরু, যিনি আমার আত্মা তিনিই সর্বভূতের আত্মা, অতএব সেই গুরুদেবকে নমস্কার।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ নমোনুদৌ॥ (চৈতন্য চরিতামৃত, ১৷)

গৌড়দেশে একই কালে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ। উদয়গিরিতে একই কালে উদিত সূর্য-চন্দ্রের মতনই আশ্চর্য এঁদের আবির্ভাব। সূর্য-চন্দ্রের মতনই এঁরা কল্যাণকে এনেছেন, অন্ধকারকে নাশ করেছেন। বন্দনা করি সেই চৈতন্য নিত্যানন্দকে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়া দ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

এশিয়া মহাদেশ বিশেষতঃ ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি। শুধু ভারতবর্ষে যুগে যুগে অবতার পুরুষগণ এসেছেন, উচ্চকোটির বহু সাধক আবির্ভূত হয়েছেন, ধন্য করেছেন ভারতভূমি। পৃথিবীর একক আর কোনো দেশে এমনটি দেখা যায় না। এই ভারতভূমিতেই পাঁচহাজার বছর আগে শ্রীভগবান বলেছিলেন:

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা ৭,৮।৪

সনাতন হিন্দু ধর্মে যারা বিশ্বাসী তারা মনে করেন সত্য যুগে শ্রীহরি, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিযুগে শ্রীগৌরাংগ মহাপ্রভু পূর্ণ অবতার হিসেবে এসেছেন এই ধরাধামে। তাঁদের গোলক ছেড়ে ভূলোকে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য সৃষ্ট জীবের কল্যাণ সাধন। সন্তান বৎসলা জননী যেমন স্নেহের নয়ন-মণি সন্তানের পেছনে

পেছনে ছুটে চলেন, ঠিক এমনি পরম করুণানিধি ভগবান জীবকুলের উপর সতত সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। তিনি নিজে এসে মানুষকে চলার পথ দেখিয়ে যান। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে আর বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে গমন করে।

আমরা যে যুগে বাস করছি তাকে বলা হয় কলিযুগ। কলিযুগ মানে কলহের যুগ। কলহ লেগেই আছে। ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ, পিতা-পুত্রে কলহ, স্বামী-স্ত্রীতে কলহ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এসেছিলেন আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে। কলির জীবের দুঃখ-দুর্দশা দেখে পথ নির্দেশের জন্য তিনি এসেছিলেন। পাঁচশ বছর আগের পৃথিবী এখনকার মত এত কলুষিত ছিল না। এমন কি একশ বছর আগেও পৃথিবীর রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দার্শনিকগণ, মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন দেখে আতংকিত হয়েছেন। গলস্ওয়ারদি তাঁর 'দ্যা সিলভার স্পুন' নামক গ্রন্থে (১৯২৪ ইংরেজীতে প্রকাশিত) সামাজিক চিত্রের আভাস দিতে গিয়ে এক নায়িকার মাধ্যমে বলেছেন: 'Life is a cigarette, to be smoked and thrown away'—অর্থাৎ মানব জীবন যেন একটি চুরুট। তার পরিণতি ভস্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উইনস্টন চার্চিল বলেছেন: 'The fabric of humam civilisation has been torn' —অর্থাৎ মানব সভ্যতার সুতো ছিঁড়ে গিয়েছে। আবার ১৯৫৭ সালে ক্রুশ্চেভ বলেছেন, এমন একদিন আসছে যখন বিরাট ধ্বংস লীলা দেখে লোকে বলবে 'এসব দেখার জন্যই কি আমরা বেঁচেছিলাম নাকি!'—'The living shall envy the dead'! ঈশ্বর না করুন, বিংশশতাব্দী শেষ হবার আগে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তা হলে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে এবং গোটা পৃথিবীর ছয়আনা পরিমাণ জনসংখ্যা বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল Naval Force (নৌ সৈন্য), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল Air Force (বিমান যুদ্ধ) এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হবে এটমিক ও নিউক্লিয়ার অস্ত্র। প্রতিটি যুদ্ধের পর ধ্বংস লীলা শুধু বেড়েই চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে দুটি এটম বোমা দিয়ে। তাতে দু'লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক মারা গিয়েছে এবং পংগু হয়েছে ঢের বেশি। যে এটম বোমার কৈশোরে এত ক্ষমতা ছিল, তার বর্তমান পরিণত বয়সে কি পরিমাণ ক্ষমতা থাকতে পারে, তা ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে।

হিংসা আর বিদ্বেষ সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। এমনতর অবস্থার প্রাক্কালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক ঘটনা। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে রক্ষণ করার জন্যই তিনি প্রেমের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'প্রেমধর্ম' দানই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। অবতার পুরুষদের আহ্বান কোন গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয়। কোন বিশেষ গোষ্ঠীতে জন্ম নিয়েও তাঁরা সমস্ত মানব জাতির জন্য পথের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তাঁদের অবদান ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীনত্ব লাভ করে।

'প্রেমধর্ম' বস্তুটি কি অনুধাবন করতে হবে। প্রেমধর্মের মধ্যে দু'টি শব্দ রয়েছে। প্রেম ও ধর্ম। প্রেম শব্দের অর্থ নিঃস্বার্থ ভালবাসা। যে-ভালবাসায় কামনা বাসনা

থাকে, স্বার্থের লেন দেন থাকে, দেয়া নেয়া থাকে, তা প্রেম শব্দবাচ্য হতে পারে না। কোন যুবক যুবতীর মধ্যে যে প্রাণের আকর্ষণ থাকে, যে-ভালবাসা থাকে, তাকে অনেকেই বলে ওরা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। তবে এ'টি সাধারণতঃ ঠিক প্রেম নয়। প্রেমের আদর্শ বৃন্দাবনের গোপীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের যে-আকর্ষণ বা ভালবাসা, তা-ই সত্যিকারের। প্রেমা-গোপীদের প্রেম কাম-গন্ধহীন। তাদের অনুরাগ কম নয়। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ "সর্বত্যাগ করি কৃষ্ণের ভজন।" কামের দৃষ্টি নিম্নগামী। কাম ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে। কাম আত্মার অধঃপতনের কারণ, প্রেমে হয় আত্মার ভগবৎ আনন্দ আস্বাদন। প্রেমের দৃষ্টি উধর্বগামী। কৃষ্ণের আনন্দ বিধানই তার লক্ষ্য। কাম আত্মকেন্দ্রিক, প্রেম কৃষ্ণ কেন্দ্রিক। প্রেম হঠাৎ আসেনা। প্রথমে হয় ভাব, তারপর মহাভাব এবং এর পরিণতি হলো প্রেম।

ধর্ম শব্দটির নানাবিধ অর্থ রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে মানুষের ভেতর যে ব্রহ্মত্ব সুপ্ত রয়েছে, তার প্রকাশ হলো ধর্ম। শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামীর মতে ধর্মের অর্থ হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন—"ধর্মংতু সাক্ষাৎ-ভগবৎ-প্রণীতম্।" যে মানুষ দেশের আইন কানুন মেনে চলে, তারা সুখে শান্তিতে বাস করে। আইন ভংগ হলে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ভগবানের দেখা আইন যারা ঠিক ঠিক মেনে চলে, তারা শান্তিতে বসবাস করে। ভক্তি বেদান্ত স্বামী আরো বলেছেন, সাধারণতঃ ধর্মকে মানুষ এক রকমের বিশ্বাস বলে মনে করে। তবে ধর্মশব্দের আসল অর্থ হলো "স্বাভাবিক বৃত্তি"। চিনি মুখে দিলে মিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায়। এই মিষ্টতা হলো চিনির স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্ম। অনুরূপ ভাবে বলা যায় লবণের ধর্ম কটু স্বাদ এবং লংকার ধর্ম ঝাল।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম কি হতে পারে? মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি হলো কাউকে ভালবাসা বা কারো সেবা করা। আপন ভাইবন্ধুকে ভালবাসা, সমাজ, জাতি বা দেশকে ভালবাসা এবং এদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্ম। মানুষ যখনই এই প্রবৃত্তির যথার্থ প্রয়োগ করে, তখনই সে তৃপ্তি লাভ করে সুখী হতে পারে। কিন্তু অপাত্রে প্রয়োগ হলে মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই শ্রীমদ ভগবতে বলা হয়েছে ভগবানকে ভালবাসাই হলো যথার্থ ধর্ম; "আমরা সকলেই তৃপ্তির অন্বেষণ করছি—পূর্ণ তৃপ্তির। কিন্তু সেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় কেবল ভগবানকে ভালবাসার মাধ্যমে।·· সারাজীবন ধরে নানা রকম আচার-অনুশীলন করার পর যদি ভগবৎ-প্রেম লাভ না করা যায়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাতে কেবল শ্রম ও সময়েরই অপচয় হয়েছে।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাই জীবকে প্রেমধর্ম শিক্ষা দিবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর প্রেমধর্ম লাভ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা নাম সংকীর্তন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে। নবদ্বীপে সূচিত সংকীর্তনই হলো ভজন। ভজনে অনর্থের নিবৃত্তি হয়। তখনই জন্ম নেয় নিষ্ঠা, নিষ্ঠা থেকে রুচি, রুচি থেকে আসক্তি, আসক্তি থেকে প্রেম। মহাপ্রভু এ ভাবেই কলির জীবকে প্রেমধর্ম লাভ করার পথ দেখিয়েছেন।

প্রেমধর্ম মুখে বলা যত সহজ, লাভ করা তত সহজ নয়। সাধক দিলীপ রায় বলেছেন: "চিত্ত শুদ্ধি না হলে অন্তরে ভগবৎ প্রেম জাগে না। আর ভগবৎ প্রেম না

জাগলে হৃদয়ে যথার্থ ব্যাপক মানব প্রেমের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অর্থাৎ 'ভালোবাসব' বলেই মানুষকে ভালোবাসা যায় না। তার জন্যে সব আগে চাই ভগবানকে ভালোবাসতে শেখা। নৈলে বড় জোর দু'চারজন আত্মীয় বন্ধু ও প্রসাদার্থীকে ভালোবাসা যেতে পারে—কিন্তু বিশ্ব মানবকে ভালোবাসা অসম্ভব হয়।" মহাপ্রভুর ভাষায় ঃ "উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান / জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" ঃ

বিশ্বমানবকে ভালবাসার পন্থা হলো প্রেমধর্মলাভ অর্থাৎ নামসংকীর্তন। হরি নামৈব কেবলম। "হরেনর্নাম হরেনর্নাম হরেনর্নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" অর্থাৎ কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত গতি নেই। তারক ব্রহ্ম নামের গুণে জীব প্রেমধর্ম লাভে সমর্থ হবে। ভগবানে নিঃস্বার্থ ভালবাসার অন্যনাম প্রেমধর্ম এবং প্রেমধর্ম লাভ হলে সর্ব জীবকে ভালবাসা সম্ভব হয়। জীবকে ভালবাসা ও ঈশ্বরকে ভালবাসা একই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগে তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'জীবে প্রেম করে যেই জন / সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সাধন ভজনের এমন একটি সহজ-সরল পথ দেখিয়েদিয়েছেন। "যাগ যজ্ঞ যত ছিল, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে/কলির যুগে হরিনাম, মহা পাপী উদ্ধারে।" কলির জীব অল্প আয়ু, অল্প ক্ষমতা। অন্যান্য যুগের জীবের মত সাধন ভজন করতে পারবে না। তাই বলা হয় "করুণয়া অবতীর্ণ কলৌ।" করুণা করার জন্যই যেন, শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব। হরি কৃষ্ণ বা রামনাম পূর্ব যুগেও ছিল। এসব নাম নতুন কিছু নয়। এসব নাম কীর্তন করার জন্যই মহাপ্রভুর নির্দেশ তা হলে মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য কি ? ডঃ মহানামব্রতজী বলছেন ঃ "নাম ছিল, কীর্তন ছিল। কিন্তু নামে এত মধুর ছিল না। মহাপ্রভু নামের মধ্যে ব্রজের মাধুর্য (ব্রজের উজ্জ্বল রস) প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন।" তিনি আরো বলেছেন, পিঠার ভেতর ক্ষীরের পুর না দিলে যেমন আকর্ষণীয় হয় না, তেমনি নামাক্ষরের ভেতর মহাপ্রভুর প্রেমের পুর দিয়েছেন। "গৌর কণ্ঠের 'কৃষ্ণ' শব্দের মধ্যে শ্রীরাধার পুঞ্জিত বেদনা আছে। তাই তাহা জীব-হৃদয়ে চৈতন্য আনিয়া গৌরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সার্থক করিয়াছে।"

প্রেমধর্ম দান করে মহাপ্রভু সুদূর অতীতে একটি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন ঃ "পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম/সর্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম।" (চঃ·ভাঃ ৩/৪) প্রায় পাঁচশ বছর আগের কথা। এতদিন এ বাণী বাস্তবায়িত হয়নি। কেউ কেউ হয়ত এ ভবিষ্যত বাণীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সংঘগুরু শ্রীএ· সি· ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ মাত্র বারো বছরে (১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল মধ্যে) শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রদর্শিত নাম কীর্তন মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তা ভাবতেও অবাক লাগে। বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় দেড়শত কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের ভবিষ্যৎ বাণীকে সার্থক করেছে।

ধর্মজগতে পাঁচশ বছর আগে ভারতবর্ষে যেমন এক জাগরণ এসেছিল, ঠিক তেমনি তখন ইউরোপেও জড়বদী সভ্যতা এক নব জাগরণের ঢেউ সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে শ্রীরবীন্দ্র স্বরূপ দাসজী বলছেন ঃ "পাশ্চাত্যের নব জাগরণ যখন মানুষকে জড়ের প্রতি আরও গভীর ভাবে আসক্ত করে তুলেছিল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তির নব জাগরণের মাধ্যমে সমস্ত জগতকে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবানের অন্তহীন প্রেমের আস্বাদন প্রদান করে অন্তহীন আনন্দে মগ্ন করেছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নবজাগরণের যুগে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল, আজও তা বর্ধিত হয়ে সমস্ত জগৎকে গ্রাস করতে বসেছে। তার এক অপূর্ব সুন্দর প্রতিষেধকও প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়েছে, সে ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই করেছিলেন।"

তাই দেখা যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রদর্শিত মত ও পথ ক্রমে ক্রমে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং এ বিষয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পথ অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ একটি সার্থক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু মহাপ্রভু যে আমাদের আরো একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন—"সংঘে শক্তি কলৌ যুগে" অর্থাৎ কলিযুগে সংঘ শক্তি ছাড়া বাঁচা যাবে না, তার কতটুকু আমরা পালন করেছি? বর্তমান কালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি রাজশক্তির কাছ থেকে কোন দাবি-দাওয়া আদায় করতে হলে সংঘবদ্ধ আন্দোলন ব্যতীত কোন ফল পাওয়া যায় না। মুটে মজুর, ভাগ্য বিড়ম্বিত জনগণ যেখানেই সংঘ তৈরী করেছে, সেখানেই তাদের দেশের সরকার ওদের কথা শুনতে বা ওদের প্রতি নজর দিতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনদেশে রাজশক্তি এই সংঘশক্তির কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয়েছেন। হিন্দুরা মহাপ্রভুকে নিয়ে গৌরব বোধ করেন। কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত পথ যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ না করেন, তাহলে শুধু শুধু গৌরব বোধে কি সার্থকতা থাকতে পারে?

'আপন আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—মহাপ্রভু তাই করেছেন। প্রেমধর্ম নিজে পালন করে জীবকে দেখিয়ে দিয়েছেন, কি ভাবে তা করতে হয়। সংঘশক্তির দৃষ্টান্তও তিনি স্থাপন করেছেন। নবদ্বীপের তখনকার রাজশক্তি গোঁড়া হিন্দুদের প্ররোচনায় নগর কীর্তনে বাধা দেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মশাল মিছিল নিয়ে হাজার হাজার মৃদংগসহ কীর্তন করে চাঁদ কাজীর বাড়ীতে গমন করেন (বিস্তারিত বিবরণ শ্রীঅক্ষয় নিমাই চরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে)। নিরস্ত্র সংঘশক্তির কাছে রাষ্ট্রশক্তিকে হার মানতে হলো এবং ভগবৎ প্রেমে মহাপ্রভু ও কাজীর মধ্যে স্থাপিত হলো মামা ভাগনের সম্পর্ক। বৈরী ভাবের স্থান দখল করলো প্রেমের আলিঙ্গন।

ইদানীং কালে বিংশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা বিশ্বব্যাপী সংঘশক্তির ছত্রছায়ায় মিছিলের ছড়াছড়ি দেখতে পাচ্ছি। লীগ অব নেশনস্ এবং জাতি সংঘও তো সংঘশক্তির বাস্তব উদাহরণ। তবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু নির্দেশিত সংঘশক্তি ও রাজনৈতিক সংঘশক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মহাপ্রভুর সংঘশক্তির লক্ষ্য আত্মিক জাগরণ, কিন্তু আধুনিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিছিলের লক্ষ্য হলো জাগতিক সুখ-সুবিধা বা স্বার্থ আদায়। তবে উভয় ক্ষেত্রে সংঘশক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। হিন্দু ধর্ম ক্ষয়িষ্ণু। প্রধান কারণ সংঘশক্তির অভাব। প্রেমধর্ম বিষয়ে হিন্দুরা মহাপ্রভুকে অনুসরণ করছেন, কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পথে সংঘশক্তি গঠনের জন্য অবিচল বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন না। হিন্দুদের দুর্গতির মূলে রয়েছে হিন্দুদের দুর্মতি। তাদের সংঘশক্তির অভাবের মূল কারণ হয়ত জাত-পাত এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এ তো গুণের কথা। সত্ত্ব, রজঃ, ও তম গুণ দিয়ে মানব সমাজ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, তা-ই শ্রীমদভগবদ গীতার নির্দেশ। গুণের স্থলে জন্মকে বসিয়ে আজ হিন্দু সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে বলা হয় 'He is the greatest of all socialists' অর্থাৎ তিনি হলেন সাম্যবাদের প্রধান প্রবক্তা। নাম কীর্তনের অভিন্ন প্ল্যাটফরমে তিনি সমাজের তথাকথিত উচ্চনীচ স্তরের সবাইকে নিয়ে এসেছেন। সংঘশক্তি গঠনের জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, সংঘ-শক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তবু হিন্দুদের চৈতন্যের উদয় হয়নি। বেশির ভাগ হিন্দুর জীবন

আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তি বা পরিবারকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ না বাঁচলে ব্যক্তির জীবন যে বিপন্ন হবে, তা যদি প্রতিটি হিন্দু সন্তান উপলব্ধি না করেন, তা হলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দেশিত মত ও পথকে অনুসরণ করা আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত কিছুই হবে না। সরল বিশ্বাসে ও অকপট অনুরাগে গৌরাংগ সুন্দরের প্রেমধর্ম ও সংঘশক্তির আদর্শকে বাস্তব জীবনে অনুশীলন করতে হবে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মংগল এর মধ্যে নিহিত। সংঘবদ্ধ হবার নির্দেশ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও ছিল। ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলের (১০ম) চরম সূক্তে উল্লেখ রয়েছে ঃ

"সগচ্ছধং সংবদধবং সং বো মনাংসি জানতাম ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিঃ মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী বঃ ব আকূতিঃ সমানো হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

অর্থাৎ তোমরা একত্রে চল, একত্রে বল, এক সাম্য মন্ত্রে উচ্চারণ কর, একচিত্ত হয়ে এক সাম্যের সমাজে বসবাস কর।

হিন্দুদের ধর্মীয় নেতা বা নীতির অভাব নেই, বরং আধিক্য রয়েছে। আর সম্ভবতঃ এ আধিক্যই হিন্দু সমাজের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। হিন্দু ধর্মে কোন Regimentation নেই অর্থাৎ সৈন্যবিভাগে বাধ্যতামূলক অবশ্যই পালনীয় নিয়মের মত আইনের উপর জোর দেওয়া হয় না। 'রুচিনাং বৈচিত্রং' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রুচিকে এখানে সম্মান দেয়া হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে সমাজপতিগণ সব সময়ই শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। তবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের আধিক্যে সংঘশক্তির গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। হিন্দুদের মধ্যে দল উপদলের অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে ঈর্ষা। আনুগত্যের অভাব এবং ঈর্ষা সংঘশক্তির মূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করেছে বলে মনে হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেম ধর্মের আদর্শ যে-আন্তরিকতার সাথে গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে, ঠিক অনুরূপ আগ্রহ সহকারে সংঘশক্তির আদর্শ গৃহীত না হলে হিন্দুরা পদে পদে মার খাবে।

হিন্দু সমাজের মধ্যে যে-অনৈক্য, ঠিক অনুরূপ অনৈক্য ও বিভেদ বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বর্তমান কালে বিরাজ করছে। পাঁচশ বছর আগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে যে-বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তা এখনও পুরো মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়নি। সংঘশক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বাণী মানব সমাজে প্রচারিত না হলে বিশ্ব মানব সমাজ বর্তমান যুগে যে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে, তা থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। মানব সমাজের এ মহাসংকটের জন্য পাশ্চাত্যের জড়বাদ সর্বস্ব সভ্যতাই দায়ী। এ বিপদ থেকে ত্রাণ পেতে হলে ভারতে পাঁচশ বছর আগে প্রচারিত আদর্শকে গ্রহণ করতেই হবে। ঐতিহাসিক টয়েনবিও সেই কথা বলেছেনঃ "বাঁচার তাগিদে, আত্মরক্ষার তাগিদে পৃথিবীকে ভারতের শরণ নিতে হবে।" পাশ্চাত্যবাসীদের সম্বোধন করে স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন—"তোমরা একটা আগ্নেয় গিরির উপর দাঁড়িয়ে আছ। যে-কোনও মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যেত পার।"

ব্যাষ্টি, সমষ্টি, সম্যক গোটা মানব জাতিকে রক্ষা করতে হলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে প্রেমধর্মের বাণী মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে হলে, সংকীর্ণতা বর্জন করে প্রেমের আদর্শ গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নেই। বিশ্ব মানবগোষ্ঠীকে সংঘশক্তি দিয়ে একত্রিত করে প্রেমের বাণী গ্রহণ করা এ মুহূর্তে নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আমাদের এই নির্দেশই দিয়ে গেছেন। □

সন্ন্যাসীর আদর্শ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

নবদ্বীপ ও অন্যান্য বৈষ্ণব মন্দিরে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দু'হাত তুলে নিত্যানন্দের সঙ্গে নৃত্যরত। কুঞ্চিত কেশদাম দুজনেরই। স্কন্ধে উপবীত ও কণ্ঠদেশে মালা। পরণে বাঙালী রীতিতে কাছা দেওয়া বস্ত্র; সম্মুখভাগে কোঁচান। শ্রীমহাপ্রভুর এ মূর্তি শুধুমাত্র মন্দিরে সীমাবদ্ধ নয়; বহুবর্ণে রঞ্জিত ক্যালেণ্ডারেও শোভিত। প্রাচীন চিত্রে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যকে দেখা যায় কপালে তিলক, গলে তুলসীমালা, হাতে হরিনামের ঝুলি, মাথায় শিখা, কাঁধে পৈতা ও ও পরণে হাঁটুর উপর কচ্ছমুক্ত কাপড়। পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে অপলক নয়নে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসীর বেশে—এ আর একটি চিত্র। এই সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের নেই মাথায় শিখা, সূত্র, তিলক, হরিনামের মালা। তবে এ চিত্র খুবই কম প্রচারিত। এ চিত্রটি ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ।

শ্রীচেতন্য ছিলেন দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একজন আদর্শ সন্ন্যাসী। শুধু তাই নয়, সর্বকালের সকল সন্ন্যাসীর আদর্শও তিনি। বৈষ্ণব সম্প্রদায় একথা ভুলে গেছেন, মনে হয়। তাঁরাও সাধারণতঃ আলোচনা করেন না শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবন-চরিত। কীর্তনীয়ারাও কীর্তন করেন না সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের লীলা-গাথা। অথচ শ্রীমহাপ্রভুর সমগ্র সাতচল্লিশ বছর-জীবনে সন্ন্যাস জীবনই ছিল চব্বিশ বছর। তাঁর সন্ন্যাসের কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে বহু প্রচারিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। উল্লিখিত আছে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীদের রচিত পুস্তকে ও স্তোত্রাবলীতে।

সনাতন গোস্বামী তাঁর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'-এর মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীচৈতন্যকে বলেছেন 'যতিবেশধারী শ্রীশচীনন্দন'।[২] তাঁর বৃহৎ 'বৈষ্ণবতোষণী'-এর শ্রীচেতন্যস্তবে আছে 'যতিচূড়ামণে প্রভো'।[৩] শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্যাষ্টক'গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুকে বর্ণনা করেছেন 'সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি' রূপে। শ্রীমহাপ্রভুর সহস্রনাম স্তোত্রতে অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাঁর সন্ন্যাস বেশের কথা ঃ

> "ন্যাসি চূড়ামণিঃ কৃষ্ণঃ সন্ন্যাসাশ্রমপাবনঃ।
> দণ্ডধৃক্ ন্যস্তদণ্ডশ্চ কমণ্ডলুধরস্তথা ॥
> মুণ্ডিত মুণ্ডকো যজ্বা প্রসন্নবদনোজ্জ্বল।
> উজ্জ্বলভাবপূর্ণশ্চ কৌপীনকটিশোভিতঃ ॥"[৫]

আবার শ্রীচৈতন্য নিজমুখে 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী'র কথা বহুবার বলেছেন। একথা চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে। এই গ্রন্থে 'সন্ন্যাসী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্যবার।

শ্রীমহাপ্রভুর মত ও পথের ধারক-বাহক হলেন বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ; এঁরা ছিলেন সংসারত্যাগী। তাঁর সেবকদ্বয়-স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ—ছিলেন গৃহত্যাগী। হরিনামে সিদ্ধ যবন হরিদাসও ছিলেন সংসার বিবাগী। আরোও অনেকে ছিলেন সন্ন্যাসী।[৬]

সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে একজন দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীদের চূড়ামণি ছিলেন-এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' নামক পুস্তকের লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী সারদেশানন্দজীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—"অনেকের মুখে শোনা যায় তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী ছিলেন না। বাহ্যিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও উক্ত আশ্রমে তাঁহার বিশ্বাস ও নিষ্ঠার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও উক্ত সন্ন্যাসিগণের সহিত তিনি কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। তাঁহাদিগের ন্যায় বেদান্ত বিচার করিতেন না, এবং উক্ত সম্প্রদায়ের পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় জীবনযাপনও তিনি করিতেন না।...তাঁহার অনুগামী বলিয়া পরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে মধ্বাচার্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন। আবার বর্তমানে কেহ কেহ তাহাকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত কেশব নামা জনৈক বৈষ্ণবের শিষ্য বলিয়াও প্রচার করিতেছেন।[৭] তিনি শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমৎ কেশব ভারতীর নিকট যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাহার পূর্বে এই দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর[৮] নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে এবং কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামীর সঙ্গে বিচারের কথা আলোচনা করিলেই তাঁহার বেদান্ত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া তিনি নিজেকে সর্বদাই 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি যথাবিধি আত্মশ্রাদ্ধ, শিখামুণ্ডন, সূত্র বর্জন করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীগণের সহিত সন্ন্যাসী-সংঘে, আদর্শ সন্ন্যাসীর ন্যায় চিরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইজন্য ভক্তগণ তাঁহাকে ন্যাসি-চূড়ামণি নামে অভিহিত করিতেন।...তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমে শ্রদ্ধা না থাকিলে অবশ্যই উহা ত্যাগ করিয়া মাধ্ব অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভেক গ্রহণ করিতেন সন্দেহ নাই।"[৯]

॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ কালে সন্ন্যাসের বিধিগুলি কিভাবে পালিত হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থগুলি হতে উদ্ধৃতি দিলে, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস সম্বন্ধে আমাদের আর কারো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। শ্রীমহাপ্রভু নিজেই বলেছেন—"এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব"।[১০] সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে গিয়েছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন,

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দ দত্ত এই তিন কৈল সর্বকার্য ॥
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন।"[১১]
... ...
"চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥[১২]

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তৃত বর্ণনা করেননি, শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস সম্বন্ধে

যেহেতু বৃন্দাবন দাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে লিখেছেন বলে। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী শুনেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মুখে। বৃন্দাবন দাস রচনা করেছেন—

"পোহাইল নিশি সর্বভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি॥
"বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি॥"
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য।
করিতে লাগিলা সর্ব বিধিযোগ্য কার্য॥"
... ...
কথং-কথমপি সর্বদিন-অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম নির্বাহ হইল প্রেমরসে॥
তবে সর্বলোকনাথ করি গঙ্গাস্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥
... ...
চতুর্দিগে হরিনাম সুমঙ্গল শুনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর॥
সর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ প্রেমে আনন্দে বিহ্বল।
... ...
যত জগতের তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য-কীর্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'।
সর্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥"[১৩]

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ নরহরি দাসের (সরকার) মন্ত্র শিষ্য লোচনদাস রচনা করেছিলেন, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল'। এই গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন নরহরি ও অন্যান্য বৈষ্ণব মোহন্তদের কাছ থেকে। মুরারীগুপ্তের কড়চাকে মূল সূত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি আর বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন লোচনদাস। এ-সবের ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল লোচনদাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল'। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস সম্বন্ধে লিখেছেন,

"মুণ্ডন করিল প্রভু দেখি শুভক্ষণে।
সন্ন্যাস করয়ে শুভদিনে সংক্রমণে॥
মকর লেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে॥
... ...
ধ্বনি শুনি সর্বলোক হৈল চমৎকার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম করহ ইহার॥"[১৪]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি ভাবগম্ভীর মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন

স্বামী সারদেশানন্দজী—"গভীর রাত্রে হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। প্রসন্নচিত্ত সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসীবৃন্দ মণ্ডলাকারে চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। মুণ্ডিতমস্তক শিখাসূত্রধারী শুচিশুভ্রবেশ তেজঃপুঞ্জকায় শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র অগ্নিসম্মুখে স্থিরাসনে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ যতিরাজ ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ভারতী সুখাসনে সমাসীন। ব্যাস-বশিষ্ঠ-শুক-শঙ্করের ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃপ্রচার ও সনাতন বৈদিক আদর্শের সংরক্ষণের জন্য, আবার যেন আত্মবিদ মহর্ষিগণের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতের প্রাণগঙ্গার গৈরিক স্রোতে পুনরায় উত্তাল তরঙ্গ-তুফান উঠিয়াছে। পল্লী-বাংলার শ্যামল তটভূমিতে আসিয়া সে উদ্বেল তরঙ্গপ্রবাহ বুঝি পরিণতির পথে চলিয়াছে-বুঝি আর একবার রূপ পরিগ্রহ করিতে চাহিতেছে! নিথর-নিঝুম এই হিমের নিশীথে, অশোক-বকুল বট-অশ্বত্থের ছায়ায় ঘেরা ভারতী মহারাজের আশ্রমে, আজ নগাধীশ হিমালয়ের গাম্ভীর্যময় প্রশান্তি নামিয়া আসিয়াছে। বিধানবিদ্ ভারতী মহারাজের নির্দেশানুসারে যথাশাস্ত্র সমস্ত ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে বিরাজ-হোম আরম্ভ হইল। নিমাই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়া আত্মশুদ্ধি করিলেন,—বর্ণ, আশ্রম, দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ইহ-পরলোকের ভোগবাসনা, সংসারপাশ-জীবাভিমান, সমস্ত অজ্ঞান চিরতরে ভস্মীভূত হইল। ভারতী শিখাছেদন করিয়া দিলেন, যজ্ঞসূত্র ও শিখা ভস্মে পরিণত হইল; মায়িক জগতের সঙ্গে, গৃহ-গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে নিমাইয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল।

শিখা-সূত্র-বিহীন সন্ন্যাসী জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; তাঁহার স্থির ধীর প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দ হইতেছে। আচার্য ভারতী তাঁহাকে প্রেষমন্ত্র, পরমহংস গায়ত্রী, ব্রহ্মমন্ত্র, মহাবাক্যাদি শ্রবণ করাইলেন; গৈরিক রঞ্জিত কৌপীন-বহির্বাস, দণ্ড-কমণ্ডলু দান করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী' নামে বিভূষিত করিলেন।"[১৫]

॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র সন্ন্যাস জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখি তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীর চূড়ামণি। ত্যাগে, বৈরাগ্যে, নিরভিমানিতায়, লোকশিক্ষায়, সামাজিক প্রথা পালনে, শিষ্য-শিক্ষণে শ্রীমহাপ্রভু ছিলেন সন্ন্যাসীর আদর্শ। তারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

শ্রীচৈতন্যের ত্যাগ অবর্ণনীয়। তিনি ত্যাগী শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভুর বেশ ভুষা ছিল অতি সাধারণ, আহার-বিহার অতি সামান্য। তৈজসপাত্রাদী ছিল নাম মাত্র। তাঁর সম্বল দুখানি বহির্বাস। শীত নিবারণ করতেন একটা ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে। নবদ্বীপের ভক্তেরা পুরীতে শ্রীচৈতন্যকে দেখলেন একখণ্ড কাপড় পড়ে থাকতে। তীর্থযাত্রায়ও তাঁর সঙ্গে ছিল কোপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র। বৃন্দাবনের পথে তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'ছেঁড়া কাঁথা মুড়া মাথা করঙ্ক লইয়া করে'।[১৬] ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন, "তাঁহার বেশ-ভূষাও একেবারে খাঁটী সন্ন্যাসীর মত। পরিধানে মাত্র একখানি কৌপীন, তাহার উপর অরুণবর্ণের এক বহির্বাস —'দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্র-মরুনং" (রঘুনাথ দাস ১৩), তরণিকরবিদ্যোতবসনঃ (শ্রীরূপ ১৪)। অলঙ্কার হইয়াছে তাঁহার কটি দেশে বিলম্বিত করঙ্ক-নারিকেলের খোলা দিয়ে তৈয়ারী জলপাত্র-'কটিল সৎকরঙ্কালঙ্কার (শ্রীরূপ ২১৭)।"[১৭] পুরীতে যে ঘরটিতে থাকতেন, যা বর্তমানে 'গম্ভীরা' নামে পরিচিত, তা ছিল অতি ছোট। তাঁর মত লম্বাচওড়া মানুষের পক্ষে বাস করা কষ্টকর হত নিশ্চয়। তিনি থাকতেন ভাবালোকে বিভোর হয়ে, দেহের প্রতি তাঁর ছিল না কোন দৃষ্টি।[১৮] পোশাক-পরিচ্ছেদের প্রতি শ্রীচৈতন্যের ছিল প্রখর দৃষ্টি। সম্পূর্ণভাবে তিনি বিসর্জন করেছিলেন দেহের আরাম ও ভোগ-বিলাস। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী মূল্যবান কাপড়খানি তাঁকে দেওয়া হত প্রতিবৎসর নন্দ-উৎসবের

সময়। তিনি তা মাথায় ঠেকিয়ে নিতেন। কিন্তু ব্যবহার করতেন না কখনও। পরমানন্দ পুরীর অভিপ্রায় অনুসারে পাঠিয়ে দেওয়া হত নবদ্বীপে শচীমাতার কাছে। শ্রীচৈতন্য কিরূপ কঠোর ত্যাগী ছিলেন দু-একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে।

বাল্য সখা ও চিরসঙ্গী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জগদানন্দ চৈতন্যদেবের দেহের কষ্ট লাঘবের জন্য ছিলেন সচেষ্ট! তিনি নতুন মিহি গেরুয়া কাপড়ে ভাল শিমূল তুলো দিয়ে তৈরী করলেন বালিশ ও গদি। শ্রীমহাপ্রভুর সেবার জন্য গোবিন্দের হাতে এগুলি দিলেন জগদানন্দ। শ্রীমহাপ্রভু শয়ন করতেন কুঠিয়ার মেঝেতে 'শরলা'র[১৯] বিছানায়—বিছানাতে নতুন বালিশ ও গদি দেখে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করলেন গোবিন্দকে, কোথা হতে এল। উত্তরে গোবিন্দ বললেন জগদানন্দের নাম। কিছু না বলে মহাপ্রভু এগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে চির পরিচিত 'শরলা'র বিছানাতেই শয়ন করলেন। সেবক স্মরণ করিয়ে দিলেন জগদানন্দের ভালবাসা মাখা পরিশ্রমের কথা। প্রার্থনা করলেন শ্রীমহাপ্রভু যেন অন্ততঃ একদিন নতুন বালিশ ও গদি ব্যবহার করেন আবাল্য বন্ধু জগদানন্দের মনস্তুষ্টির জন্য। প্রভুর কঠোর উত্তর—

"প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভুমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলী বালিস মস্তক মুণ্ডন॥"[২০]

পরে অন্য সেবক স্বরূপ এক উপায় বের করলেন। নখ দিয়ে সরু করে চিরলেন শুকনো কলাপাতাকে। সেগুলিকে ভরে দিলেন একটি কাপড়ে। তদবধি শ্রীচৈতন্যে এর উপরে শয়ন করতেন।

মহাপ্রভুর সেবার জন্য আর একবার জগদানন্দ নবদ্বীপ থেকে এনেছিলেন এক শিশি সুগন্ধি চন্দন তেল—এ তেল ব্যবহারে পিত্তবায়ু শান্ত হয়। জগদানন্দের ইচ্ছা তেল যেন ব্যবহার করেন শ্রীচৈতন্য। সেবক গোবিন্দ শ্রীমহাপ্রভুকে জানালেন জগদানন্দের মনোবাসনা। উত্তরে "প্রভু কহেন সন্ন্যাসীর নাহি তৈল অধিকার। / তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥"

শ্রীচৈতন্য পরামর্শ দিলেন, শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবাতে তেলটি লাগাতে। এই শুনে জগদানন্দ মৌনব্রত অবলম্বন করলেন দশদিন। গোবিন্দ আবার আর্জি জানালেন শ্রীচৈতন্যের কাছে। তিনি যা উত্তর দিলেন, তা সন্ন্যাসীর আদর্শ। তিনি বললেন,

"মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥
এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস।
আমার সর্বনাশে তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥[২১]

॥ ৪ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। সারা জীবন তিনি ভিক্ষা ধারণ করে কাটিয়েছেন—"ভিক্ষান্নমাত্রেন চ তুষ্টিমন্ত"। নিজের আহারের জন্য কোন বন্দোবস্ত করেননি। আবার কখনও এক বাড়িতে তিনি নিত্য ভিক্ষা করতেন না। সন্ন্যাসের পর নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে এসেছেন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে। আচার্যের বাড়িতে সন্ন্যাসীর চিরাচরিত প্রথানুযায়ী 'নারায়ণ হরি' বলে দাঁড়ালেন নবীন সন্ন্যাসী শ্রীমহাপ্রভু। আনন্দে আচার্য সন্ন্যাসীকে আহারে বসালেন। পরিবেশন করলেন আচার্য স্বয়ং। সন্ন্যাসীর ধাতু পাত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এজন্য শ্রীচৈতন্য ব্যবহার করলেন কলাপাতা ও মাটির খুরি। সুস্বাদু ও নানান রকম তরি-তরকারি দেখে সম্মত হলেন না আহার্য গ্রহণ করতে। আপত্তি জানালেন—"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ। /

ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় দমন ॥" কিন্তু শেষে আচার্যের অনুরোধ গ্রহণ করলেন। খাওয়া শেষে তুলসীমঞ্জরী ও লবঙ্গ-এলাচ-কাবাব চিনি শ্রীমহাপ্রভু খেলেন। পান নিলেন না, তা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। বেশীদিন থাকলেন না শান্তিপুরে, নবদ্বীপেও গেলেন না। বললেন—"সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া। / নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥"[২২]

শান্তিপুর ত্যাগ করে নীলাচলে যাচ্ছেন মায়ের অনুমতি নিয়ে। ভক্তেরা জিনিস দিতে চাইলেও কিছুই নিলেন না শ্রীচৈতন্য। কারণ, সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নেই। পথে 'ভিক্ষান্ন উদর পূরণ এবং দেবালয়ে সাধুর আশ্রমে, মণ্ডপে কিংবা বৃক্ষতলে নিশিযাপন করেছিলেন। আবার যখন শ্রীমহাপ্রভু সকলের বিশেষ অনুরোধে কৃষ্ণদাস নামক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করে তীর্থভ্রমণে বেরলেন তখন সঙ্গীকে বললেন—"কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র। / আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র ॥"[২৩] একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় শ্রীভগবানকে অবলম্বন করে ভিক্ষান্নে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের তীর্থস্থান দর্শন করেছিলেন।

পুরীতে থাকাকালীন মহাপ্রভু পণ্ডিত সার্বভৌমের গৃহে মাসের মধ্যে পাঁচদিন ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। বাকি দিনগুলি সাধারণতঃ শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ছিল তাঁর আহার্য। এরমধ্যে কেউ ভিক্ষা দিতে চাইলে তা তিনি নিতেন। আহারে ছিল তাঁর দারুণ সংযম। 'জিতং সর্বং জিতে রসে'—ভাগবতের মূর্ত প্রতীক শ্রীচৈতন্য। সার্বভৌম মহাপ্রভুর জিহ্বাতে চিনি দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। শুষ্কবালির মত তা ঝরে পড়েছিল—বিন্দুমাত্র রসস্পর্শ হয়নি। চার পণের বেশী মহাপ্রসাদ খেতেন না তিনি। তাও দুপণে কমিয়ে দিয়ে ছিলেন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র পুরীর কটাক্ষ বাণে—"সন্ন্যাসী হইয়া কর মিষ্টান্ন ভোজন। / এইভাবে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ॥" সেই যে আহার কমিয়ে দিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাই ছিল, যদিও তাঁর ভাগবতী তনু অতিশয় কৃশ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র পুরী দেহ-নির্যাতন কথাটি তুলে খোটা দিলে শ্রীচৈতন্য যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা সন্ন্যাসীর আদর্শ—

"প্রভু কহেন সবে কেন পুরীকে কর রোষ।
সহজ ধর্ম কহেন তেঁহো তাঁর কিবা দোষ ॥
যতি হইয়া জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥"[২৪]

শ্রীচৈতন্য ছিলেন সঞ্চয়ের ঘোরতর বিরোধী। শুধু মাত্র পুরীতে নয়, যখন তিনি পদব্রজে পথে, সেখানেও তিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন। হরীতকী চেয়েছেন মহাপ্রভু সেবক গোবিন্দের কাছে। প্রভুর সেবার জন্য গোবিন্দ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। বলামাত্রই হরীতকী শ্রীচৈতন্যকে দিলে, কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। উত্তর শুনে মহাপ্রভু গোবিন্দকে কঠোরভাবে বললেন, "গোবিন্দ ত্যাগের পথে চলা বড়ই কণ্টকর। আমার মনে হইতেছে, ভগবানে ষোল আনা নির্ভর না করিয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবার ভাব তোমার অন্তরে এখনও বর্তমান। কাজেই তুমি ত্যাগের পথ ছাড়িয়া সঞ্চয়ের পথে চল,—গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন কর।"[২৫]

॥ ৫ ॥

শ্রীমহাপ্রভু তাঁর 'শিক্ষাষ্টক'-এ বলেছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। / অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" এই শ্লোকটির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং। সন্ন্যাসীর অন্যতম গুণ নিরভিমানিতা। শ্রীচৈতন্যের তা পুরোমাত্রায় ছিল। পুরীর রাজ সভাপণ্ডিত নৈয়ায়িক, মীমাংসক ও বৈদান্তিক সার্বভৌমের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শ্রীচৈতন্যের। পারিবারিক আত্মীয়তাও ছিল তাঁদের মধ্যে। কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী জানতে চাইলেন সার্বভৌম। বিনীতভাবে জানালেন মহাপ্রভু—'ভারতী সম্প্রদায়'। এই সম্প্রদায়ের গৌরব বেশী নেই বলে সার্বভৌম পুনঃ সংস্কার-সন্ন্যাসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন চৈতন্যদেবের কাছে।

মহাপ্রভু বিনম্রভাবে বললেন যে তাঁর মত অধম অধিকারের পক্ষে উহাই যথেষ্ট।[২৬] আবার যখন সর্বভৌমের কাছে বেদান্তসূত্র পড়ছেন মহাপ্রভু, তখন তাঁর নিরভিমানিতা লক্ষ্য করার মত।[২৭] শ্রীচৈতন্য সুপণ্ডিত, ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম, পূর্বে অনেক পণ্ডিতকে পরাজিত করেছিলেন, ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করতে ধরাধামে এসেছেন, যিনি বেদন্তসূত্রের জীবন্ত প্রতীক, যিনি সন্ন্যাসী, তিনি বেদান্ত সূত্র অধ্যয়ন করছেন একজন গৃহী, বিষয়ী, মানযশে ভরপুর, সামাজিক মর্যাদা-গৌরবের প্রতি প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন পণ্ডিত সার্বভৌমের কাছে। তাঁর মত নিরভিমানী সন্ন্যাসীর পক্ষে এটা সম্ভব।

নিরভিমানিতার অপর এক দৃষ্টান্ত উড়িষ্যারাজ্যের অধীন বিদ্যানগরের শাসনকর্তা রায় রামানন্দের কাছে রাধা কৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্বের তত্ত্বব্যাখ্যা শোনা। যিনি গোপী প্রেমের ভাবের আদর্শ, যিনি নিজ জীবনে রাধা-প্রেমের জ্বলন্ত প্রকাশ, তিনি অতিনম্রভাবে শিক্ষার্থীর মত ভক্তিতত্ত্ব শোনার আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাঁর তুলনায় সামান্য একজন সাধকের কাছে। রামানন্দের প্রবল আপত্তির উত্তরে নিরভিমানী শ্রীচৈতন্যের উত্তরটি সন্ন্যাসীদের আদর্শ—

"প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
সার্বভৌম সনে মোর মন নির্মল হইল।
কৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্ব কথা তাঁহারে পুছিল॥
তেঁহো কহে, আমি নাহি জানি কৃষ্ণ কথা।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা॥
তোমার স্থানে আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥"[২৮]

আবার কাশীর মণ্ডলীশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর অনুযোগের উত্তরে শ্রীমহাপ্রভুর পুনরায় একই দৃশ্য অভিনীত হল। বললেন,—"স্বামীজী, আমি বেদান্ত বিচারে অনধিকারী, সেইজন্যই গুরুদেবের উপদেশানুসারে কৃষ্ণনাম জপ করি।" "প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান"—বলতেও শ্রীচৈতন্য একটু দ্বিধা করলেন না।[২৯]

শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয় কতদূর অভিমানশূন্য ছিল পুরীর শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে সেই ভাগ্যবতী ওড়িয়া গ্রাম্য স্ত্রী লোকটির দৃষ্টান্ত উল্লেখনীয়। প্রতিদিন স্নানান্তে শ্রীমন্দিরে গরুড়স্তম্ভে হাত দিয়ে মহাপ্রভু তন্ময়চিত্তে তৃষিত নয়নে দর্শন করতেন 'জগন্নাথঃ স্বামী'-কে। সেদিনও ব্যতিক্রম হয়নি। সঙ্গে বিশ্বস্ত সেবক গোবিন্দ। একটি গ্রামের স্ত্রীলোক ভিড়ে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন না করতে পেরে গরুড়স্তম্ভের কাছে দণ্ডায়মান শ্রীচৈতন্যের কাঁধের উপর চড়ে বসলেন। আর পরম উল্লাসে শ্রীবিগ্রহের দর্শনের রসাস্বাদন করতে লাগলেন। সেবক গোবিন্দ স্ত্রীলোকটিকে নামাবার চেষ্টা করলে মহাপ্রভু নিষেধ করলেন। স্ত্রীলোকটি হুঁশ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁর কাছে। উল্টে স্ত্রীলোকটির ভক্তি ও আর্তির প্রশংসা করে বললেন 'এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা।' "অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়। / ইহার প্রসাদে ঐছে আমার বা হয়।"[৩০]

সত্যি স্বামী সারদেশানন্দজী লিখেছেন, "অসংখ্য ভক্তের নিকট অতুল সম্মান পাইলেও এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর ব্যবহারে কখনও অহংকার-অভিমানের ভাব প্রকাশ তো দূরের কথা, বরং অপরের সঙ্গে, বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত জ্ঞানিগুণী ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সুবিনীত ব্যবহার দেখিয়া মোহিত হইতে হয়।"[৩১]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতামুখে বলেছেন—"যদ্‌ যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্ত দেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।" (৩/২১)। অর্থাৎ "বিশিষ্ট ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, জনসাধারণ তাই করে। তিনি যা প্রমাণসিদ্ধ বা করণীয় বলে গ্রহণ করেন, ইতর সাধারণও তারই অনুবর্তন করে।" মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ হচ্ছে সনাতন রীতি। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ছিলেন বিশেষ সজাগ। গীতোক্ত শ্রীভগবানের বাণীটি মহাপ্রভু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থ লোকশিক্ষক। সন্ন্যাসীর আদর্শের প্রতি তাঁর এমন নিষ্ঠা ছিল যে তিনি কঠোর হতে পিছপা হন নি। তিনি জানতেন যে তিনি যা করে যাবেন, পরবর্তীকালে লোকেরা তাই অনুসরণ করবে। তাই তিনি এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, যা সন্ন্যাসীদের আদর্শ। আমরা শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরব।

উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের একান্ত ইচ্ছা শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার। পণ্ডিত সার্বভৌমকে জানালেন রাজা তাঁর ইচ্ছার কথা। সার্বভৌম রাজার বারতা নিবেদন করলেন মহাপ্রভুকে। বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি বললেন পণ্ডিতকে—

"সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥
...   .
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥"[৩২]

সন্ন্যাসীর রাজ দরশনকে 'স্ত্রী-দরশনের' সঙ্গে তুলনা করে শ্রীচৈতন্য ক্ষান্ত থাকেন নি। 'বিষের ভক্ষণ' বলে পণ্ডিতের মুখের উপর বলে দিলেন। এও জানিয়ে দিলেন যে পুনরায় অনুরোধ করলে এ স্থান ত্যাগ করে যাবেন তিনি। পরমপ্রিয় রায় রামানন্দও শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে রাজা মহাপ্রভুর দর্শন পান। সেখানেও তিনি স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন—

"প্রভু কহে, 'আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু, যৈছে না লুকায়॥"[৩৩]

আবার যখন প্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথের রথের সামনে ভাবস্থ শ্রীচৈতন্যের সোনার অঙ্গ স্পর্শ করলেন, তখনও সেই একই বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছিল মহাপ্রভুর মুখে—"রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার। ছি ছি বিষয়ি-স্পর্শ হইল আমার॥"[৩৪] যদিও পরে রামানন্দের বুদ্ধিতে ভক্ত-বেশে রাজার শ্রীচৈতন্যের দর্শন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তিনি সহজে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেননি সন্ন্যাস বিধি অনুযায়ী।

ছোট হরিদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের বিশেষ স্নেহভাজন ও কীর্তন-গানে পারদর্শী। তার উপর তিনি সংসারত্যাগী বৈরাগী যুবক। তাঁর গান শুনতে মহাপ্রভু খুব ভালবাসতেন। সেই ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করেন নি, যখন তিনি জানতে পারলেন ছোট হরিদাস চাল সংগ্রহ করে এনেছেন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে। এমনি ছিলেন লোক শিক্ষক শ্রীচৈতন্য। ঘটনাটি ঘটেছিল পুরীতে। সুপণ্ডিত ভক্ত ভাগবতাচার্য এসেছেন মহাপ্রভুর পুণ্য সঙ্গসুখ উপভোগ করতে। তাঁর অভিলাষ হল স্বহস্তে রান্না করে শ্রীচৈতন্যকে খাওয়াবেন। কিন্তু ভাল মিহি চাল সংগ্রহ করতে না পেরে ছোট হরিদাসকে মনের কথা বললেন। হরিদাস সেই ভাল চাল নিয়ে এলেন পুরীর বিশিষ্ট ভক্ত শিখি মাইতির বোন উচ্চকোটির সাধিকা ও পরম ভক্তিমতী মাধবী দাসের কাছ হতে। শ্রীচৈতন্য সেই সুগন্ধী চালের ভাত খেয়ে জানতে চাইলেন চালের উৎসস্থলটি। যেই শুনলেন স্ত্রীলোকের

কাছ থেকে ছোট হরিদাস চাল এনেছেন, কুঠিয়াতে এসে সেবক গোবিন্দকে আদেশ করলেন, "অদ্য হইতে ছোট হরিদাসকে আর এখানে আসিতে দিও না।" মাধবী মাইতি ছিলেন বৃদ্ধা 'তপস্বিনী' মহা 'সাধ্বী ধর্মরতা,' পরম বৈষ্ণবী এবং মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার সার্ধ তিনজন পাত্রের মধ্যে অর্ধজন। সেই মাধবী মাইতির কাছ থেকে ত্যাগী বৈরাগী হরিদাসের চাল নিয়ে আসা অর্থাৎ যাতায়াত ও কথোপকথন, মহাপ্রভুর কাছে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ বলে মনে হয়েছে। সেজন্য সকলের শিক্ষার উদ্দেশ্যে হরিদাসের প্রতি বিধান করলেন কঠোর দণ্ডের। ভক্তেরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যের মন নরম করতে। কিন্তু তিনি টললেন না। ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। / দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।" "প্রভু কহে কভু নহে বশ মোর মন। প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন।" এমনকি তিনি হুমকি দিলেন, আবার অনুরোধ করলে, তিনি কুঠিয়া পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন। এক বৎসর পরে যখন শ্রীচৈতন্য শুনলেন ছোট হরিদাসের প্রয়াগ সঙ্গমে প্রাণ বিসর্জনের কথা, তখনও মহাপ্রভু ভক্তগণকে লক্ষ্য করে বললেন, "প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥" ছোট হরিদাসের ঘটনাতে সকলের এমন শিক্ষা হল যে, "স্বপ্নেও ছাড়িল সব স্ত্রী সম্ভাষণে।"[৩৫]

পুরীতে এক পিতৃহীন প্রিয় দর্শন বালক শ্রীচৈতন্যের কাছে আসত। তার ভক্তিভাব দেখে তিনিও খুব স্নেহ দেখাতেন। বালকটিও আদর পেয়ে মহাপ্রভুর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগল। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দূরদর্শী পণ্ডিত দামোদর তাঁদের এই মেলামেশা পছন্দ করতেন না। খোঁজ নিয়ে জানলেন বালকটির মা ভক্তিমতি, কিন্তু পরমা সুন্দরী যুবতী বিধবা। বালকের সঙ্গে বেশী শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গতা স্বাভাবিক ভাবে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করবে। সেকথা দামোদর বললেন শ্রীমহপ্রভুকে। শ্রীমহাপ্রভু বুঝতে পারলেন ইঙ্গিত। লোকদের শিক্ষার জন্য সেই বালকের সঙ্গে মেলামেশা তারপরই বন্ধ করে দিলেন।[৩৬]

॥ ৭ ॥

অবতার পুরুষেরা কোন সময়ে শাস্ত্র মর্যদা লঙ্ঘন করেন না, কোন সামাজিক বিধিকে অতিক্রম করেন না। তাঁরা সর্বদা শাস্ত্রকে মান্য করেন, পালন করেন সামাজিক নিয়মগুলি। শ্রীচৈতন্য ছিলেন অবতার পুরুষ। তার উপর তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর জীবনে এগুলি ব্যতিক্রম হয়নি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

হরিনামে সিদ্ধ যবন ঠাকুর হরিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য বলেছেন—"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। / তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥" হরিদাসকে আলিঙ্গন করে শ্রীমহাপ্রভু পবিত্র হতেন—'তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে.' 'দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরমপাবন।' সেই ঠাকুর হরিদাস যখন পুরীতে গৌর ভক্তদের সঙ্গে এলেন, তিনি শ্রীমহাপ্রভুর কাছে গেলেন না। শ্রীচৈতন্য লোক পাঠালেও আসতে অস্বীকৃত হলেন। কারণ, তখনকার দিনে সামাজিক নিয়মনুযায়ী হরিদাস ছিলেন যবন, শূদ্র, নীচ কুলোদ্ভব। তাঁর স্থান ভক্ত সমাজে হতে পারেনা, শ্রীচৈতন্য তা জানতেন। তাই তিনি হরিদাসকে আসবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না। কাশী মিশ্রকে বলে নির্জন স্থানে কুঠিয়া ঠিক করে দিলেন। তিনি স্বয়ং হরিদাসের কাছে গিয়ে নিত্য মিলিত হতেন। হরিদাসও কখনো শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন করা ত দূরের কথা, মন্দির সন্নিধানে কখনও যাননি। শ্রীচৈতন্য তা মেনে নিয়েছিলেন।[৩৭]

সনাতন গোস্বামী যখন পুরীতে, তখনও তিনি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে যাননি। হরিদাসের কুঠিয়াতে থাকতেন। রূপ গোস্বামীরও তাই ব্যবস্থা ছিল। শ্রীচৈতন্যের আহ্বানে সনাতন পুরীর সিংহদ্বার পথ পরিত্যাগ করে উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রের পথ ধরে গিয়েছিলেন। পাছে সিংহদ্বারে কর্মব্যস্ত ব্রাহ্মণ সেবকদের অঙ্গ স্পর্শ হয় তাই। কারণ, গৌড়ের রাজদরবারে সনাতন ও রূপ যবনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে নীচ জাতির সেবা করেছিলেন। যদিও তাঁরা ছিলেন

ব্রাহ্মণ। সেজন্য তাঁরা নিজেদেরকে দূরে রেখেছিলেন তদানীন্তন সামাজিক বিধি অনুযায়ী। তখনকার দিনে নিয়মানুযায়ী তাঁরা মন্দিরে প্রবেশে অনধিকারী। আর এতে ছিল শ্রীচৈতন্যের পূর্ণ সম্মতি।[৩৮]

শ্রীজগন্নাথের স্নান যাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তেরা মিলিত হয়েছেন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে। ভক্তদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মহাপ্রসাদ আনীত হয়েছে ভক্তদের জন্য। সেদিন ভক্তদের যথাযোগ্যস্থানে পঙক্তিতে বসিয়ে শ্রীচৈতন্য নিজেই প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রসাদ না গ্রহণ করলে, কেউ খাবেন না। হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ে সকলের অনুরোধে তিনি নিত্যানন্দ প্রভু, পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণকে নিয়ে একটু দূরে ভক্তগণের সম্মুখে পৃথক পঙক্তিতে ভিক্ষা করতে বসলেন। গোপীনাথ আচার্য আগেই শ্রীচৈতনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভিক্ষার জন্য। গোপীনাথ পরিবেশন করলেন সন্ন্যাসীদের। স্বরূপ দামোদর ও জগদানন্দ পরিবেশন করলেন ভক্তদের। শ্রীচৈতন্যকে সামনে রেখে ভক্তেরা প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন।

এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। স্বামী সারদেশানন্দজী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। (১) শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে না বসে পৃথক পঙক্তিতে বসলেন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। কারণ, সামাজিক বিধি ও শাস্ত্রানুযায়ী গৃহস্থও সন্ন্যাসীর পৃথক বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। সেজন্য তিনি সন্ন্যাসীর আদর্শ অনুযায়ী আলাদা খাবার ব্যবস্থা করলেন, আলাদা ভাবে বসলেনও। যদিও অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস প্রভৃতিরা ছিলেন তাঁর আপনজন। আবার শ্রীচৈতন্য গ্রহণ করলেন গোপীনাথ আচার্য আনীত ভিক্ষা। ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণ করলেন না। কারণ, সন্ন্যাসী জীবন-ধারণ করবেন ভিক্ষান্নে। (২) হরিদাসকে ভক্তদের সাথে বসালেন না। তাঁর কুঠিয়াতে প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন। তখনকার সামাজিক প্রথা অনুসারে হরিদাসকে এক পঙক্তিতে ভোজন করানো অসম্ভব ছিল। শ্রীচৈতন্যে নিজের প্রভাব খাটিয়ে তা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করলেন না।[৩৯]

॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করতে। এরজন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর পার্ষদদের। পার্ষদদের মধ্যে যেমন একদিকে ছিলেন অদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিবাস প্রভৃতি গৃহী ভক্তেরা তেমনি অপর দিকে ছিলেন সনাতন, রূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরা। আবার আদর্শ গৃহস্থধর্ম সমাজে প্রচার করবার জন্য আবাল্য সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে করেছিলেন গৃহী। আর ত্যাগ-বৈরাগ্য মণ্ডিত ভারতীয় সনাতন আদর্শ জীবনধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য সংসার ত্যাগ করালেন রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, রঘুনাথ প্রভৃতিদের। শেষোক্তরা হলেন তাঁর মত-পথের ধারক ও বাহক। শুধুমাত্র সংসার ত্যাগ করিয়ে ক্ষান্ত থাকলেন না শ্রীচৈতন্য। তাঁদেরকে নিজের কাছে রেখে উপযুক্ত শিক্ষণ দিয়ে তৈরী করিয়ে নিলেন, নির্দেশ দিলেন ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর। শ্রীমহাপ্রভুর শিষ্য-শিক্ষণ তাঁর মত উপযুক্ত দক্ষ সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব। তিনি বাজিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের। তার শিষ্য-শিক্ষণের যে শিক্ষা, সেটিও সন্ন্যাসীদের আদর্শ। আমরা এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করব, তাহলে এবিষয়ে পরিষ্কার বোধগম্য হবে আমাদের।

গৌড়েশ্বরের অন্যতমমন্ত্রী সনাতন সব ত্যাগ করে কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উপস্থিত হলেন হাজিপুরে হরিহর ছত্রের মেলার বাগানে। সেখানে নবাবের ঘোড়া কেনার জন্য অবস্থান করেছিলেন সনাতনের ভগিনীপতি তথা নবাবের পদস্থ কর্মচারী শ্রীকান্ত। এই স্থান ত্যাগ কালে শ্রীকান্তের মন রাখার জন্য একটি মাত্র পশমের কম্বল নিয়েছিলেন সনাতন, যদিও আরো জিনিস দিতে চেয়েছিলেন শ্রীকান্ত। পশমের কম্বল সম্বল করে সনাতন কাশীতে ভক্ত চন্দ্রশেখরের বাড়িতে দর্শন লাভ করলেন শ্রীচৈতন্য। কাশীতে শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে ভিক্ষান্নে জীবন

যাপন করছেন সনাতন। তাঁর গায়ে শ্রীকান্তের দেওয়া পশমের কম্বল। কিন্তু ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন শ্রীচৈতন্য কম্বলটির উপর। দৃষ্টি এড়াল না সনাতনের। রহস্য বুঝতে পারলেন সনাতন। পরের দিন গঙ্গাঘাটে দেখতে পেলেন এক গরীবকে, কাঁথা শুকোতে দিচ্ছিলেন। তাঁর কাছে সনাতন আবেদন রাখলেন কাঁথা-কম্বলের পরিবর্তনের জন্য। প্রথমে গরীব লোকটি বিস্মিত হলেও শেষে বিনিময় করে সনাতনের কম্বলটি নিলেন গরীবটি। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন সনাতন। কাঁথা দেখে শ্রীচৈতন্য প্রসন্ন হলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন,

"প্রভু কহে উহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয় ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ।
রোগ খণ্ডি সৎ বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥"[৪০]

এভাবে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করেছিলেন।

সপ্তগ্রামের জমিদারের ছেলে রঘুনাথ। আবাল্য ঐশ্বর্যে পালিত। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিবাহিত রঘুনাথের সংসারে ভোগস্পৃহা একেবারে নিবৃত্ত হয়ে গেল। অনাসক্তভাবে ঈশ্বরে পাদপদ্মে আশ্রয় করে সংসারজীবন কাটাতে লাগলেন। অপেক্ষায় রইলেন উপযুক্ত সময়ের সংসার ত্যাগ করবেন বলে। রঘুনাথ একদিন গৃহত্যাগ করে পুরীতে এলেন শ্রীচৈতন্যের সন্নিধানে। যদি সেবক স্বরূপের হাতে রঘুনাথকে তুলে দিয়েছিলেন উপযুক্ত শিক্ষণের জন্য, কিন্তু তাঁর প্রতি ছিল শ্রীমহাপ্রভুর তীক্ষ্ম দৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছানুযায়ী রঘুনাথ সেবক গোবিন্দের ব্যবস্থানুযায়ী আহার নিলেন মাত্র দিন-কয়েক। তার পরই শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা নিতেন যাত্রী ও পাণ্ডাদের কাছে। এই শুনে শ্রীমহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে বললেন গোবিন্দকে, "সর্বদা ভগবদ্চিন্তা এবং কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া ভিক্ষান্নে জীবনধারণ, ইহাই ঠিক ঠিক ত্যাগীর ধর্ম, আর প্রকৃত ত্যাগ-বৈরাগ্য ভিন্ন ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, বিড়ম্বনাই সার হয়।"[৪১]

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানালেন সাক্ষাৎ শ্রীমুখ হতে কিছু শুনবার জন্য। তখন শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথকে যা বলেছিলেন সেটি যেমন একেবারে সাধারণ চোখে দেখা যায়, তেমন তা আবার গভীর তথ্যমূলক ও মহামূল্যবান। শ্রীচৈতন্যের উপদেশটি সন্ন্যাসীদের কাছে জ্বলন্ত আদর্শ। তিনি বলেছিলেন—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পাইবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"[৪২]

এই অমূল্য কথাগুলি রঘুনাথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের কৃপায় আরোও কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন রঘুনাথ। পুরীতে পিতৃ প্রদত্ত অর্থও তিনি নিজের জন্য খরচ করলেন না। শ্রীচৈতন্যের সেবায় লাগিয়ে দিলেন। শুনে শ্রীমহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ত্যাগী ভজনশীলের পক্ষে এইরূপ প্রতিগ্রহ বড়ই অনর্থকর। রঘুনাথ ভগবানের কৃপায় ইহা বুঝিতে পারায় খুব ভাল হইল।"[৪৩] সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করলেন রঘুনাথ। কারণ "সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আকার।" আনন্দবাজারে দোকানদারদের পরিত্যক্ত পচা মহাপ্রসাদকে জল দিয়ে ধুয়ে নুন দিয়ে খেতেন রঘুনাথ। এই কথা জানতে পেরে হৃষ্টচিত্তে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন শ্রীমহাপ্রভু। চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখেছেন—"এই মত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।/ রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে।"[৪৪]

শ্রীচৈতন্যের জীবনে শুধুমাত্র সন্ন্যাসের আদর্শ প্রতিফলিত হয়নি, তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল সন্ন্যাসীদের আদর্শ। তাঁর আদর্শকে অবলম্বন করে সনাতন, রূপ হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বহু সাধক সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসআশ্রম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে আদর্শ গুলি প্রতিষ্ঠাপন করে গিয়েছিলেন কালের কুটিল চক্রে সেই আদর্শ অন্য পথে চালিত হচ্ছে বা ক্ষীয়মান হয়ে গেছে। আমরা শ্রীচৈতন্যের গোপী-প্রেমের ভাবকে অবলম্বন করি, তাঁর সন্ন্যাসের আদর্শের কথা জনসমক্ষে তুলে ধরি না। গোপী প্রেমের পাশাপাশি এই আদর্শটি সমানভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। তবেই হবে শ্রীচৈতন্যের প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে আরো বহু ঘটনা রয়েছে, সেগুলি তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমে সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলির যথার্থ মূল্যায়ন হওয়াও একান্ত দরকার। □

উৎস নির্দেশ :

১. ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল দিয়েছেন ৪৭ বছর ৪ মাস ১২ দিন (আবির্ভাব—১৪৮৬। ২। ২৭ এবং তিরোভাব—১৫৩৩। ৬। ২৯)

[শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, কলিকাতা (১৯৫৯) পৃঃ ৬, এরপর থেকে—উপাদান] শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—"শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতার। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারি" [শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রিফ্লেক্ট পাবিলেকশন কলিকাতা (১৯৮৩) আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ, এরপর থেকে 'চরিতামৃত']

২. জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা। হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥ (উপাদান, পৃঃ ১৪৩)

৩. শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর। শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো॥ (ঐ, পৃঃ ১৪৪)

৪. উপাদান, পৃঃ ১৫২

৫. বৈষ্ণবস্তোত্র নামামৃত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, পৃঃ ২৬১

৬. ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসী পরিকরগণের একটি তালিকা সংখ্যা দিয়েছেন। যদিও তাঁদের পরিচয় বেশী একটা পাওয়া যায় না। তিনি সংখ্যাটি পেয়েছেন 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা,' 'বৈষ্ণববন্দনা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। সম্প্রদায় অনুযায়ী তালিকাটি নিম্নরূপ পুরী-২০, তীর্থ-৮, অরণ্য-২, গিরি-৫, ভারতী-৫, আনন্দ-৪, সরস্বতী-৩, আশ্রম-১, যতি-১, অবধূত-৩ এবং অজ্ঞাত-২। (উপাদান, পৃঃ ৫৬৮)

৭, ৮. চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে-শ্রী (রামানুজী), নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও মাধ্ব। এই প্রসঙ্গে ডঃ এস, কে, দে ও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতামত উল্লেখযোগ্য। "On the other hand. the indications are strong that Chaitanya formally belonged to the Dasanami Order of Samkara sannyasins, even though the ultimate from which he gave to Vaisnava Bhakti had nothing to do with Sankara's extreme Advaita-vada. Barring the two Passages referred to above, there is no evidence anywhere in the early Standerd works of Bengal vaisnavism that Madhevendra Puri or his disciple Isvara Puri, who influenced the early religious inclinations of Chaitanya, was in fact a Madhva asectic. There is no evidence to show that either they or their allged disciples Advita were Madhvas in ontlook.···To

Vasudev Sarvabhauma at Puri, Chaitanya is introduced as a Sannyasin belonging to the Bharati—Sampradaya- There are also other facts recorded in his authoritative biographics which militate against the assumption of Chaitanya's Madhva leanings···It must also be pointed out that in doctinal matters, Bengal Vaisnavism, as set forth by Chaitanya's Navadvipa devotees or by the six Gosvamins, hardly shows any resemblance to Madhvaism." (Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal by Dr. Sushil Kr. De, Calcutta, 1942, p-12-16) [Hereinafter Faith & Movement] ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন, "Chaitanya, though he was initiated by a guru of the Madhi sect, owed but liltle allegience to their tenets. His was almost a new and different creed based on mystic love with its emotional features." (Chaitanya and His Companions by Denesh Sen, Calcutta, 1997, p. 206).

৯. শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব-স্বামী সারদেশানন্দ, শিলং (২য় প্রকাশ-১২৮৪), প্রস্তাবনা, আঠার-উনিশ (এর পথ থেকে 'চৈতন্যদেব')

চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমহাপ্রভুরূপ মূল স্কন্ধের আশ্রয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে ন'জন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর উল্লেখ করেছেন :

"পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী । / ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ । / নৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে । / এই নব-মূলে বৃক্ষ করিলে নিশ্চলে ॥
মধ্যমূল পরমানন্দ মহাধীর । / এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥"

—চরিতামৃত, আদিলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ.

১০, ১১. চরিতামৃত, আদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ

১২. ঐ, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ

১৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত-শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা (১৯৮১), মধ্যখণ্ড, ২৬শ অধ্যায়, (এরপর থেকে 'চৈতন্য ভাগবত')

১৪. শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল-মহাকবি শ্রীল-লোচনদাস-ঠাকুর : শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী সম্পাদিত, প্রাচীন শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া (গৌরাঙ্গ ৪৪৩), মধ্যখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়, প্রভুর সন্ন্যাস, পূরবী সিন্ধুড়া-রাগ

এই প্রসঙ্গে ডঃ এস. কে, দের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"Keshava Bharati lived at katwa, and as there was very little personal intercourse between him and Caitanya, he does not appear in any way to have influenced the Spritual experience of his disciple either before or after the imitation. He has perhaps chosen as the Sannyasa-guru because he happened to be a well-known Sannyasin near at hand, who was Capable of Performing the ceremony. The particular order that Chaitanya joined probably made as little difference to his religious conseionsness as even his very act of becoming a Sannyasin it-self" (Faith & Movement, p. 61-62).

১৫. চৈতন্যদেব পৃঃ ৫৬-৫৭। এই পুস্তক রচনায় জন্য স্বামী সারদেশানন্দজী প্রাচীন চৈতন্য জীবনীগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত জীবনী ছাড়া অন্যান্য পুস্তকাবলীর

নাম—'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরিত, 'চৈতন্যমঙ্গল' (জয়ানন্দ), 'বংশী শিক্ষা' (প্রেমদাস মিশ্র), 'ভক্তিরত্নাকর' (নরহরি চক্রবর্তী), হরিদাস গোস্বামী 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং' (মুরারী গুপ্ত), 'প্রেমবিলাস' (নিত্যানন্দ দাস), গোবিন্দদাসের কড়চা ইত্যাদি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস সম্পর্কে চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস একটি অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

প্রভু বোলে "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন। / কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিলা কথন ॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।" / এত বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে ॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল। / ভারতীর চিত্তে মহাবিস্ময় জন্মিল ॥
ভারতী বলেন "এ মহামন্ত্রবর। / কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর ॥"
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী। / সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি ॥"

(চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৬শ অধ্যায়)

এই তিনটি অন্য কোন প্রাচীন চৈতন্য জীবনীতে দেখা যায় না। এই তথ্যটিও মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। (শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত, ২য় খণ্ড ষষ্ঠদশ সংস্করণ, ১৩৮৭, কলিকাতা পৃঃ ৩০০-০১)। [এরপর হতে 'নিমাই-চরিত।]

১৬. নিমাই-চরিত, পৃঃ ৩০২
Companions, p 157
Faith Movement, p 322

১৭, ১৮. উপাদান, পৃঃ ৫৯৩-৯৪

১৯. 'শরলা' কলাগাছের মাঝের কচিপাতার নাম। অন্যমতে, 'শরলা' কলাগাছের শুকনো খোলা; প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের বৃক্ষ বল্কলের মত বিছানার উপকরণরূপে শ্রীচৈতন্য ব্যবহার করতেন।

২০, ২১. চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ

২২. চরিতামৃত, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৩. ঐ, সপ্তম পরিচ্ছেদ

২৪. ঐ, অন্ত্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ

২৫. চৈতন্যদেব, পৃঃ ১৭১

২৬, ২৭. চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

২৮. চরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ

২৯. চৈতন্যদেব, পৃঃ ২০৮ এবং চৈতন্য পরিকর—
রবীন্দ্রনাথ মাইতি, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা (১৯৬২) পৃঃ ৬৮৪

৩০. চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

৩১. চৈতন্যদেব, পৃঃ ২৯৩-৯৪

৩২. চরিতামৃত, মধ্যলীলা, দশম পরিচ্ছেদ

৩৩. ঐ, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

৩৪. ঐ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

৩৫, ৩৬. চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৩৭. চরিতামৃত, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ

৩৮. ঐ, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৩৯. চরিতামৃত, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ

৪০. চরিতামৃত, মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ

৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪. চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ এবং চৈতন্যদেব, পৃঃ ২৫১, ২৫৫

শ্রীচৈতন্যের ভারত পরিক্রমা

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কখনও পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে কখনও গৃহী পণ্ডিত হিসাবে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর সমকালে তাঁর প্রেমধর্মের প্রভাব ভারতবর্ষের একটি বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাপ্রভুর পরিক্রমা তার অন্যতম কারণ। লেখাপড়া শেষ করে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি সঞ্জয় মুকুন্দের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেছেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিস্তৃত হচ্ছে, স্বনির্বাচিতা বল্লভ মিশ্রের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করে সংসার যাত্রা শুরু করেছেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে পরাজিত করে নিজের যশ ও নবদ্বীপের গৌরব বর্ধিত করেছেন; সেই সময়েই তিনি পূর্ববঙ্গ পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে বলেছেন যে বঙ্গদেশ দর্শনের ইচ্ছায় তিনি শচীমাতার অনুমতি নিয়ে লক্ষ্মীদেবীকে মায়ের সেবা করার উপদেশ দিয়ে শিষ্যবর্গ সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গে যাত্রা করেছিলেন।

তবে প্রভু কত আপ্তশিষ্য বর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গ দেশে হরষিত হৈয়া॥ (চৈ· ভা· আদি· ১২ অঃ)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বক্তব্য অনুসারে গৌরচন্দ্র হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে গিয়েছিলেন।

কতদিনে কৈলপ্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাহা যায় তাহা লও যায় সংকীর্তন॥ (চৈতন্য চরিতামৃত আদি-১৬ পরিঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের সহপাঠী এবং পরবর্তীকালের ভক্ত পরিকর মুরারি গুপ্ত, চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচন দাস ও জয়ানন্দ বলেছেন যে, তিনি পূর্ববঙ্গ গিয়েছিলেন ধন উপার্জনের উদ্দেশ্যে। মুরারি বলেছেন—

ততো গৃহাশ্রমে স্থিত্বা ধনার্থং প্রযযৌ দিশি।
পূর্বস্যাং সজ্জনৈঃ সার্ধং দেশান্ কুর্বন্ সুনির্মলম্॥
(মুরারির কড়চা-২।১।১৫)।

তারপর গৃহাশ্রমে অবস্থান করে ধন অর্জনের নিমিত্ত সজ্জনগণের সঙ্গে দেশসমূহকে নির্মল করে পূর্বদিকে গমন করেছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গৌরচন্দ্র বলেছিলেন—

অর্থ উপার্জন বিনে সংসার না চলে।
বঙ্গদেশে জাই আমি অর্থের ছলে॥

অর্থ বিনা সংসার কভু নাহিঃ চলে।
অর্থবিদ্যা অর্থরূপ সর্বলোক বলে ॥ (চৈ. ম. নদীয়া—আ।১২)।

লোচনও বলেছেন—

মায়েরে কহিল যাব ধন উপার্জনে। (চৈ. ম. আদিখণ্ড)।

বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন যে, পূর্ববঙ্গে বহু ছাত্র শিষ্য নিয়ে অধ্যাপনা করতেন গৌরচন্দ্র। এখানেই তপন মিশ্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটে, গৌরচন্দ্র তপন মিশ্রকে বারাণসী যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের 'চৈতন্যোদয়াবলী'তে শচীদেবীর আদেশে গৌরচন্দ্র শ্রীহট্টে গমন করেছিলেন—"বঙ্গদেশে সমায়াতো মাতুরাজ্ঞাং বিধায় সঃ।" (৩।১৩)—মায়ের আজ্ঞানুসারে তিনি বঙ্গদেশে এসেছিলেন। চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে নিমাই স্বেচ্ছায় পিতৃভুমি দর্শনের অভিলাষে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন।

দেখিবাত পিতৃভুমি জাগ এ অন্তর।
অবশ্য দেখিব গিয়া শ্রীহট্ট নগর ॥ (গৌরাঙ্গ বিজয় পৃঃ ৪৮)।

মনে হয় এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহট্টে পিতৃভুমি দর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং স্থানে স্থানে কিছু কিছু ছাত্রকে ও বিদ্যাদান করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে কোন্ কোন্ স্থানে গিয়েছিলেন তার বিবরণ চরিতগ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ দাস রচিত 'প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থে গৌরচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ দাস লিখেছেন,—

নবদ্বীপ হৈতে প্রভু আসি বঙ্গদেশে।
পদ্মার তীরেতে রহে মনের হরিষে ॥

* * * *

কিছুদিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে। / যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে ॥
পিতৃজন্মস্থান পিতামহেরে দেখিয়া। / পদ্মার তীরেতে ঝাট আসিব চলিয়া ॥
এত চিন্তি মহাপ্রভু শ্রীহট্টে চলিলা। / পদ্মাতীরে ফরিদপুরে উপস্থিত হৈলা ॥
তথা হৈতে বিক্রমপুরের নূরপুরে গমন। / সুবর্ণগ্রামেতে পরে দিলা দরশন ॥
তাহা হৈতে আইলা দেশ এগার সিন্দুর। / ব্রহ্মপুত্র তীরে পুর অতি মনোহর ।।
সে দেশে বেতাল গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ হয়। / কৃপা করি সে স্থানে আইলা দয়াময় ॥
তাহার নিকটে আছে ভিটা-দিয়া গ্রাম। / নানা দেশে সুপ্রসিদ্ধ কুলীনের স্থান ॥
সেই স্থানে আছেন লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী। / পরম বৈষ্ণব সর্বগুণে সর্বোপরি ॥
তার ঘরে কৈলা প্রভু ভিক্ষা নির্বাহণে। / দুই চারি দিবস রহে তাঁর ভক্তিগুণে ॥
(প্রেমবিলাস ২৪ বিলাস)।

এই বিবরণ কতটা নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। যাই হোক্ কয়েকমাস পূর্ববঙ্গে যাপন করে নিমাই নবদ্বীপে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে গৌরচন্দ্র কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। মুরারির কড়চা, কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত থেকে জানা যায় যে রাঢ় দেশ দিয়ে তিনি কাটোয়া থেকে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে উপনীত হয়েছিলেন। কবিকর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য থেকে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য প্রথমে আত্মভাবে বিভোর হয়ে নিরবচ্ছিন্ন পশ্চিমদিকে চলেছিলেন, পরে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে চেতনা ফিরে পেয়ে শান্তিপুর যাবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত অনুসারে চৈতন্যদেব পশ্চিম মুখে চলতে চলতে বক্রেশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু বক্রেশ্বর না গিয়ে পূর্বমুখে চলতে শুরু করলেন এবং গঙ্গাতীরে একটি গ্রামে রাত্রি যাপন

করেছিলেন। কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য অনুসারে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পরে বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছায় পথ চলছিলেন, নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁকে পথ ভুলিয়ে কালনায় নিয়ে আসেন, কালনা থেকে গঙ্গা পার হয়ে তিনি শান্তিপুরে উপনীত হন। মুরারির কড়চা অনুসারে শ্রীচৈতন্য প্রথমে গিয়েছিলেন পুষ্পগ্রাম বা ফুলিয়ায়, ফুলিয়া থেকে আসেন শান্তিপুর। পথের বিবরণে বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে পার্থক্য থাকলেও শ্রীচৈতন্য যে কাটোয়া থেকে শান্তিপুরে এসেছিলেন, সে কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। কালনা থেকে গঙ্গা পার হয়ে ফুলিয়া ও শান্তিপুর যাওয়াই সম্ভব মনে হয়।

শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে শচীমাতা ও ভক্তবর্গের সঙ্গে এক বা একাধিক রাত্রি যাপন করে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ ক্ষেত্র পুরীর পথে রওনা দিয়েছিলেন মায়ের অনুমতি নিয়ে চার বা পাঁচজন ভক্তের সঙ্গে। শান্তিপুর থেকে পুরী যাত্রার পথের বিবরণে বিভিন্ন চরিতগ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত অনুসারে শ্রীচৈতন্য প্রথমে আঠিসারা নগরে অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে রাত্রি যাপন করে উপনীত হন ছত্রভোগ-এ (২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরের নিকটে)। এখানে গঙ্গা পার হয়ে শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে তীরে উঠে উৎকলদেশে প্রবেশ করেন, তৎপরে সুবর্ণরেখা, বালেশ্বর, বাঁশদহ, যাজপুর, কটক ও ভুবনেশ্বরের পরে পুরীতে পেঁছেছিলেন। গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চায় মহাপ্রভু প্রথমে গেলেন বর্ধমানে গোবিন্দদাসের বাড়ীতে, তৎপরে আসেন হাজিপুর, হাজিপুর থেকে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর থেকে নারায়ণগড়, তৎপরে বালেশ্বর। জয়ানন্দের মতে গৌরচন্দ্র শান্তিপুর থেকে আসেন অম্বুয়া বা অম্বিকা কালনা, তৎপরে কুলীনগ্রাম, তৎপরে দেবনদ (দামোদর?) পার হয়ে শিয়াখালা হয়ে তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। জয়ানন্দের বিবরণে তমলুকের পরে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বারাসত, দাঁতন, জলেশ্বর, আমরদা, বাশদা, রামচন্দ্রপুর, রেমুণা, শবণগর, বাঙ্গালপুর, ভদ্রক, যাজপুর, পুরুষোত্তমপুর, একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বর, কমলপুর ও আঠারনালা অতিক্রম করে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে পেঁছেছিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় রেমুনা থেকে যাজপুরের পথে হরিপুর, বালেশ্বর ও নীলগড়ের উপর দিয়ে মহাপ্রভুর যাত্রার উল্লেখ আছে। কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে ও নাটকে রেমুণায় গোপাল দর্শন, কটকে সাক্ষিগোপাল দর্শন, তৎপরে যাজপুরী, একাম্রক্ষেত্র, কমলপুর অতিক্রম করার পর শ্রীচৈতন্যের শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হওয়ার বিবরণ আছে। মুরারি ও জয়ানন্দের বিবরণে মহাপ্রভু কর্তৃক যাজপুরে বিরজা দর্শনের উল্লেখ আছে। মুরারির বর্ণনায় যাজপুরের পরেই ভুবনেশ্বর ও তৎপরে জগন্নাথ ক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণে গরমিল অবশ্যই চোখে পড়ে। তবে শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুর থেকে শ্রীক্ষেত্র গমন পথের একটা মোটামুটি হদিশ পাওয়া যায়। গোবিন্দ দাসের কড়চায় শান্তিপুর থেকে পুরীর পথে বর্ধমান যাওয়াটা অবিশ্বাস্য।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পুরীতে মাস দুয়েক অবস্থান করে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার উদ্দেশ্যে ছিল বড় ভাই সন্ন্যাসী বিশ্বরূপের অনুসন্ধান। কিন্তু এই মত গ্রাহ্য নয়। কারণ, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের মাত্র দুই বৎসর পরে আঠারো বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে কারণ এই ছিল॥ (চৈ. চ. মধ্য. ৭ পরি.)।

কৃষ্ণ প্রেম দিয়ে দক্ষিণভারত উদ্ধার করতে এই ছলনার আবশ্যকতা কি বোঝা যায় না। মুরারি, কবিকর্ণপুর, লোচন দাস প্রভৃতির মতে তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যেই তিনি দক্ষিণে গমন করেছিলেন। তবে তীর্থ দর্শন উদ্দেশ্য হলেও মহাপ্রভু হরিনাম প্রচার করেছেন, প্রয়োজনমত বিরুদ্ধ পক্ষকে

পরাজিত করে নিজ মতবাদও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য অনুসারে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একমাত্র সঙ্গী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস। মহাপ্রভু একাকী যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দের অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চা অনুসারে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একমাত্র সঙ্গী ছিলেন গোবিন্দ কর্মকার। অন্য কোন চরিতগ্রন্থে গোবিন্দ কর্মকারের নাম পাওয়া যায় না।

যাই হোক্, দক্ষিণাপথ যাত্রায় মহাপ্রভু পুরী থেকে প্রথমে এলেন আলালনাথ। এখানে আলালনাথ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ নাম গান করতে করতে কখনও হলেন ভূলুণ্ঠিত, কখনও হলেন মূর্ছিত। এখানে তিনি এক রাত্রি যাপন করেছিলেন (মুরারির কড়চা ৩।১৪।৪-৮)। আলালনাথ থেকে তিনি গেলেন কূর্মক্ষেত্রে—দর্শন করলেন, বিষ্ণুর কূর্মাবতার বিগ্রহ এবং কূর্ম নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন—

"ততস্তত্রৈই কূর্মক্ষেত্রে কূর্মদেবং প্রণম্য স্তুত্বা কূর্মনাম্নো দ্বিজবরস্য গৃহমূত্তীর্ণবান্।"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—৭ অংক)।

মুরারি, কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে এখানে এক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে ও রোগমুক্ত হয়। অতঃপর মহাপ্রভু জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে নৃসিংহাবতার বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন।

কিয়দ্দূরং সমাগত্য জিয়ড়াখ্যং নৃসিংহকম্।
দদর্শ পরমপ্রীতঃ প্রেমাশ্রু পুলকাঞ্চিতঃ॥ (মুরারির কড়চা-৩।১৪।১৯)

কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তিনি জিয়ড় নাম নৃসিংহ প্রেমাশ্রু রোমাঞ্চিত দেহে পরম প্রীতিভরে দর্শন করলেন।

গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় মহাপ্রভুর কূর্মক্ষেত্র ও নৃসিংহক্ষেত্র গমনের উল্লেখ নেই, এই গ্রন্থানুসারে তিনি আলালনাথ থেকে একেবারে গোদাবরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। জয়ানন্দ কূর্মক্ষেত্রের নাম বাদ দিলেও নৃসিংহক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন—

জিয়ড়ে নৃসিংহ দেখি তবে গেলা পঞ্চসখী।
গোদাবরী নদী পার হয়্যা। (চৈতন্যমঙ্গল, উৎকল খণ্ড—১০)

কূর্মস্থান মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলায় প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ, জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র ভিজাগাপট্টম জেলায়, এর বর্তমান নাম সিংহাচলম্। যাত্রাপথে এই দুটি প্রসিদ্ধ স্থান মহাপ্রভু অতিক্রম করে গেছেন, এ কথা মনে করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না।

চরিতকাররা অতঃপর সকলেই গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও ঘটনাটি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কম। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে রায় রামানন্দের গৃহে মহাপ্রভু দশদিন কৃষ্ণকথায় কালযাপন করেছেন—

এই রূপে দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
মুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥ (চৈ. চ. মধ্য. ৮ পরি.)

এই সময়েই রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্য সাধন সম্পর্কিত আলোচনা কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণে মহাপ্রভু অতঃপর গোতমী গঙ্গায় স্নান করে মল্লিকার্জুন-তীর্থে মহেশ্বর দর্শন করে অহোবলে নৃসিংহকে দর্শন করেছিলেন। অহোবল ও মল্লিকার্জুন কর্নুল জেলায় অবস্থিত দুটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। চৈতন্যচরিতামৃতকার ছাড়া অন্য কোন চরিতকার এই দুই তীর্থের উল্লেখ করেন নি। গোবিন্দদাসের কড়চায় রামানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহাপ্রভু ত্রিমন্দ নগরে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর বাস ছিল।

বৌদ্ধদের প্রধান রামগিরি রায় মহাপ্রভুর সঙ্গে বিতর্কে পরাজিত হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করেছিলেন। মুরারির কড়চায় শ্রীচৈতন্য গোদাবরী পার হয়ে পঞ্চবটীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, চৈতন্যচন্দ্র অহোবলে নৃসিংহ দর্শন করে সিদ্ধবট দর্শন করেন। সেখানে রামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করে এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে এসেছিলেন স্কন্দক্ষেত্রে—দর্শন করলেন কার্তিকেয়ের বিগ্রহ।

স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥ (চৈ· চ· মধ্য· ৯ অঃ)।

সিদ্ধবট কুডাপা নগরের দশমাইল পূর্বে সিদ্ধোট, চিঙ্গেলপুট জেলায় (চয়ুরগ্রামে স্কন্দক্ষেত্র)। এখানে সুব্রহ্মণ্য স্বামী বা ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তি অবস্থিত। স্কন্দক্ষেত্রের পর মহাপ্রভু ত্রিমঠে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। গোবিন্দ কর্মকারের ত্রিমন্দনগর ত্রিমঠ হতেও পারে। চারুচন্দ্র শ্রীমাণি লিখেছেন, "আমার বোধহয় ত্রিমন্দ ত্রিমঠ হইবে। কাঞ্চীকে ত্রিমঠ বলে। কাঞ্চিপুরে বৌদ্ধদিগের শৈবদিগের ও বৈষ্ণবদিগের মঠ ছিল বলিয়া উহা ত্রিমঠ নামে পরিচিত।" (চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ—পৃঃ ৪৩)। ত্রিমঠ থেকে মহাপ্রভু পুনরায় সিদ্ধবটে ফিরে এসে পূর্বোক্ত রামভক্ত ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণোপাসকে পরিণত করেছিলেন। মুরারির কড়চায় ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে কাঞ্চীতে রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয় তারপর তিনি গোদাবরী পার হয়ে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর তিনি কাবেরী নদী উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করেছিলেন (মুরারির কড়চা ৩।১৫।৭।)।

জয়ানন্দ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, তাতে মহাপ্রভু গোদাবরী পার হয়ে পঞ্চবটী দর্শন করে এক তেলেঙ্গা ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করে কাবেরী নদীতে স্নানের পর বেঙ্কট পর্বতে ত্রিমল্লনাথ দর্শনের পরে প্রমোদা নদী উত্তীর্ণ হয়ে বানর বাজার দেশ দিয়ে সেতুবন্ধে উপনীত হয়েছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে ত্রিমঠের পরে মহাপ্রভু বৃদ্ধকাশীতে শিবদর্শন করেছিলেন। এখানে একটি গ্রামে তিনি বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন মতাবলম্বীদের পরাভূত করে স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর তিনি ত্রিপতি ত্রিমল্লে চতুর্ভুজ বিষ্ণু দর্শন করে আসেন বেংকটাচলে। ত্রিপতিতে তিনি রামচন্দ্রকে দর্শন করেন। তারপর পানা-নৃসিংহে নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন ও স্তবস্তুতি করে শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিমলয়, ত্রিকালহস্তী, পক্ষিতীর্থ, বৃদ্ধকোলতীর্থ পীতাম্বর ও শিয়ালী পরিক্রমা করেছিলেন (চৈ চ· মধ্য· ৯ পরি)। পানা-নৃসিংহ কৃষ্ণা জেলায় বেজওয়াদা শহরের সাত মাইল দূরে মঙ্গলগিরির মধ্যে অবস্থিত। বেংকটাচলের নিম্নে 'নিম্ন তিরুপতি' এখানে গোবিন্দরাজ ও রামচন্দ্রের বিগ্রহ বিরাজমান। শিবকাঞ্চী—কাঞ্জিভরম—দক্ষিণ কাশী নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুকাঞ্চী কাঞ্জিভরম্ থেকে পাঁচ মাইল দূরে। ত্রিমলয় তাঞ্জোর জেলায়, পক্ষিতীর্থ চিংলিপট থেকে ন' মাইল দক্ষিণপূর্বে, বৃদ্ধকোল মহাবলিপুরম্ থেকে এক মাইল দক্ষিণে, পীতাম্বর কুডালোর নগর থেকে ২৬ মাইল দক্ষিণে, শিয়ালী তাঞ্জোর জেলায়, তাঞ্জোর শহর থেকে ৪৮ মাইল উত্তর পূর্বে।

চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে অতঃপর মহাপ্রভু কাবেরী তীরে গো-সমাজ শিব, বেদাবনে অমৃত-লিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিষ্ণু, কুম্ভকর্ণকপালে সরোবর, শিবক্ষেত্রে শিব, পাপনাশনে বিষ্ণু দর্শন করে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হয়েছিলেন। এই স্থানগুলি সবই তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত। কুম্ভকর্ণ কপাল তাঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোনম্।

গোবিন্দ দাসের কড়চায় ত্রিমন্দ নগরের পরে ঢুণ্ডিরাম তীর্থে ঢুণ্ডিরাম নামে এক পণ্ডিত কৃপা লাভ করেছিলেন। অক্ষয়বটের কাছে বটেশ্বর শিবের নিকটে তিনি রাত্রি যাপন করেছিলেন। দুই বারাঙ্গনার সাহায্যে শ্রীচৈতন্যকে পরীক্ষায় ব্যর্থ তীর্থপতি নামে এক ধনীকে কৃপা করে মুন্না-নগরের জঙ্গলের পাশ দিয়ে গমনকালে রামানন্দ স্বামীকে তর্কে পরাজিত ও বশীভূত করে মহাপ্রভু

বেংকটনগরে তিন দিন অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে পিরীশ্বর শিব দর্শন করে তিনি এসেছিলেন ত্রিণপদী বা ত্রিপদী নগরে, তৎপরে পান্না নরসিংহে ও বিষ্ণু কাঞ্চীতে তিনি উপস্থিত হন। বেংকটনগরে তিন দিন অবস্থান করে পশুভীল নামে এক দস্যুকে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত করেছিলেন। বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করার পর ছয় ক্রোশ দূরে ত্রিকাল ঈশ্বর শিব দর্শন করেন। পঞ্চতীর্থে ভদ্রা নদীতে স্নান করে পাঁচ ক্রোশ দূরে কালতীর্থে বরাহদেবের বিগ্রহ দর্শন করার পর, পাঁচ ক্রোশ দূরে নন্দা ও ভদ্রানদীর সঙ্গমস্থলে সন্ধিতীর্থে স্নান করে অদ্বৈতবাদী সদানন্দ পুরীকে তর্কে পরাজিত করে তিনি চাঁই পল্লী তীর্থে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবীর দর্শন পেয়েছিলেন। শৃগালী ভৈরবী দর্শনের পরে মহাপ্রভু উপনীত হলেন কাবেরী নদীর তীরে। নাগর নগরে তিনদিন সকল মানুষকে হরিনামে মত্ত করে সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোর নগরে (বর্তমান নেগা পট্টম্) রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, গো-সমাজ শিব, কুম্ভকর্ণ কর্পূর সরোবর ও চণ্ডালু গিরি তিনি সন্দর্শন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ও বহু লোককে হরিনামে মত্ত করে তিনি পদ্মকোটে এসে অষ্টভুজা ভগবতীকে প্রণাম করেন। ত্রিপাত্র নগরে এসে তিনি দর্শন করেন চণ্ডেশ্বর শিব। এখানে বৃদ্ধ শিবভক্ত ভর্গদেবকে কৃপা করে দুই সপ্তাহ অবস্থানের পর ঝারিবনের মধ্য দিয়ে অরণ্য পথে রঙ্গধামে (শ্রীরঙ্গম) উপনীত হয়ে তিনি নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করেন। এর পর তিনি গিয়েছিলেন ঋষভ পর্বতে। (গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৪০)।

মুরারির কড়চা, চৈতন্যচরিতামৃত ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কট ভট্টের (লোচনের মতে ত্রিমল্লভট্ট) গৃহে চারমাস অবস্থান করে চতুর্মাস্য ব্রত পালন করেছিলেন। বেঙ্কট বা ত্রিমল্লভট্টের পুত্র গোপালকে কৃপা করে প্রভু ঋষভ পর্বতে পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে তিন দিন যাপন করে শ্রীশৈলে তিনদিন অবস্থানপূর্বক আসেন কামকোষ্ঠী, কামকোষ্ঠী থেকে দক্ষিণ মথুরায়। এখানে কৃতমালায় স্নান করে তিনি দুর্বসন (দর্ভশয়ন) তীর্থে উপনীত হন। তৎপরে মহেন্দ্র শৈলে পরশুরাম সন্দর্শনের পরে পেঁছালেন রামেশ্বর সেতুবন্ধে। গোবিন্দর কড়চায় ঋষভ পর্বতের পরে মহাপ্রভু রামনাথ নগরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করে পেঁছেছিলেন রামেশ্বরে।

রামেশ্বর তীর্থে গিয়া তথি স্নান করি।
শিব দরশন করে মোর গৌরহরি॥ (গো. ক. পৃঃ ৪০)

ঋষভ পর্বত দক্ষিণ কর্ণাটকে মাদুরা জেলায়। মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে পালনি হিলু। দক্ষিণ মথুরা বর্তমান মাদুরা, এখানে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। কৃতমালা ভাগাই বা বৈগাই নদীর একটি অববাহিকা, মহেন্দ্র পর্বত পূর্বঘাট পর্বতমালা। গোবিন্দ দাসের কড়চায় শ্রীশৈল, কামকোষ্ঠী, দক্ষিণ মথুরা ও কৃতমালার উল্লেখ নেই। চৈতন্যচরিতামৃতে রামনাথ ও গোবিন্দের কড়চায় দুর্বসন বা দর্ভশয়ন অনুল্লিখিত। মুরারির কড়চায় ও কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে রঙ্গনাথের পরে শ্রীচৈতন্য সেতুবন্ধে এসে রামেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করেছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কাবেরী নদীর তীরে ত্রিমল্লনাথ বেঙ্কট পর্বতের পরে মহাপ্রভু এসেছিলেন সেতুবন্ধে। চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যে শ্রীচৈতন্য সেতুবন্ধে এসে ধনুতীর্থে (ধনুষ্কোটি) স্নান করে রামেশ্বর দর্শন করেন। তৎপরে তিনি প্রত্যাবর্তন পথে রঙ্গনাথ দর্শন করে গোদাবরীতীরে রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (চৈ. চ.—১৩।৩৩-৩৪)। মুরারি বলেছেন যে শ্রীগৌরচন্দ্র সকলতীর্থ দর্শন করে জগন্নাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করেছিলেন। সেতুবন্ধের পরে আর কোন তীর্থদর্শনের উল্লেখ মুরারি করেন নি। কবিকর্ণপূরের নাটকে ও সেতুবন্ধ থেকে মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে (৭ অংক)। জয়ানন্দও একই কথা লিখেছেন—"সেতুবন্ধ ছাড়িয়া চলিলা নীলাচলে।" (উৎকল খণ্ড—১১)। লোচনও এই কথাকেই সমর্থন করেছেন।

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে ও গোবিন্দ দাসের কড়চায় আছে যে মহাপ্রভু বোম্বাই ও গুজরাট পর্যন্ত পরিক্রমা করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে মহাপ্রভু একরাত্রি রামেশ্বরে অবস্থান করে পাণ্ড্যদেশে নয় ত্রিপতি অর্থাৎ নয়টি মন্দিরে নয়টি বিষ্ণুমূর্তি, চিয়ড়তলায় রামলক্ষ্মণের বিগ্রহ তিলকাঞ্চীতে শিব, গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে বিষ্ণু, পানাগড়ি তীর্থে (তিনিভেলি থেকে ত্রিবান্দ্রমের পথে ৩০ মাইল দক্ষিণে) রামচন্দ্র চামতাপুরে রামলক্ষ্মণ এবং বৈকুণ্ঠে (আলোয়ার তিরুনগরী থেকে ৪ মাইল উত্তরে এবং তিনিভেলি থেকে ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে তাম্রপর্ণী নদীর বামতটে) বিষ্ণুদর্শন করে কন্যাকুমারীতে উপনীত হয়েছিলেন। তারপর তিনি মল্লার দেশে (মালাবার) আমলিতলায় রামচন্দ্রকে দেখে তমালকার্তিক (তিনিভেলি থেকে ৪৪ মাইল এবং অরমবল্লী গিরি-সঙ্কট থেকে ২ মাইল দক্ষিণে), চেতাপণিতে (ত্রিবাংকুর রাজ্যে বাতাপানী) রামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। এখানে রাত্রিযাপন করে তিনি পয়স্বিনী (তিরুবত্তর) নদীর তীরে আদিকেশব দর্শন করেছিলেন। এখানে তিনি ব্রহ্মসংহিতার পুঁথি নকল করিয়ে সংগ্রহ করিয়েছিলেন। অনন্ত পদ্মনাভ (ত্রিবাঙ্কুরে) এবং শ্রীজনার্দন (ত্রিবান্দ্রমের ২৬ মাইল উত্তরে—বারকলাই) দর্শনের পরে তিনি শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরি মঠে (মহীশূর রাজ্যে কাড়ার জেলায়) উপস্থিত হন। মৎস্যতীর্থ (সম্ভবতঃ মালাবার জেলায় সমুদ্রতীরে মাহে নগর) দর্শন করে তিনি তুঙ্গভদ্রায় স্নান করেন। মাধবাচার্যের জন্মস্থান উড়ুপীতে মধ্বাচার্য প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও নর্তক গোপাল দর্শন করে তিনি আসেন কল্গুতীর্থে। ত্রিতকূপে বিশালা গিরিবর্ত্মের মধ্যদিয়ে পঞ্চাপ্সরা তীর্থ পর্যটন করে গোকর্ণে (কানাড়া জেলায়) মহাবলেশ্বর শিব, দ্বৈপায়ণী তীর্থ, সুর্পারক (বোম্বাই থেকে ২৬ মাইল উত্তরে থানা জেলায় সোপারা), কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গল গণেশ ও চোরা ভগবতী, পান্তুপুরে (পান্তরপুরে—শোলাপুর) বিঠ্ঠলদেব দর্শন করেছিলেন। পান্তরপুরে চারদিন অবস্থান করে ভীমরথী নদীতে স্নান করে তিনি এলেন কৃষ্ণবেনা নদীর তীরে। এখানে তিনি কৃষ্ণ প্রেমমূলক কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতার পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। তৎপরে তাপ্তী নদীতে স্নান করে তিনি মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হন। তারপর নর্মদাতীরে এসে তিনি দর্শন করলেন ধনুস্তীর্থ, নির্বিন্ধ্যা নদীতে স্নান করে ঋষ্যমূক পর্বত ও দণ্ডকারণ্য অতিক্রম করে পম্পাসরোবর ও পঞ্চবটী বনে উপনীত হয়েছিলেন। নাসিকে ত্র্যম্বক শিব দর্শন করে ব্রহ্মগিরি ও গোদাবরীর উৎপত্তিস্থল কুশাবর্ত (পশ্চিমঘাট পর্বতের নিকট কুশট্ট) পেরিয়ে সপ্ত গোদাবরী অতিক্রম করে শ্রীচৈতন্য প্রত্যাবর্তন করেছিলেন রায় রামানন্দের আবাসে বিদ্যানগরে।

গোবিন্দদাস কর্মকারের বিবরণ কৃষ্ণদাসের বিবরণ থেকে কিছু পৃথক। গোবিন্দের কড়চায় মহাপ্রভু তিনদিন সেতুবন্ধে যাপনের পর মাধবীবনে আসেন। তারপর তন্তকুন্তী তীর্থে স্নান করে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে একপক্ষকাল অবস্থান করে মাঘী পূর্ণিমায় তাম্রপর্ণী স্নান সেরে সমুদ্রপথে কন্যাকুমারী অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে ১৫ ক্রোশ হেঁটে তিনি আসেন সাঁতাল পর্বতে। পরদিন প্রভাতে যাত্রা করে তিনি উপনীত হন ত্রিবঙ্কুনগরে ত্রিবঙ্কুর রাজা রুদ্রপতি তাঁর প্রেমভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে শরণ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর রামগিরি পর্বতে রামসীতার বিশ্রামস্থল দেখে, পয়োষ্ণী নগরে শিব-নারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করে, শিঙারির মঠে শংকরপন্থীদের পরাভূত করে মৎস্যতীর্থ ও কাচারে (বেদাবতী নদীর তীরে কডার) ভগবতী দর্শনান্তে ভদ্রা (বেদাবতী) নদীতে স্নান করে প্রভু পঞ্চপনদীতে উপস্থিত হন। এখানে তিনদিন অবস্থানের পর চিতোল গমন, তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান, কাবেরীর উৎপত্তিস্থল কোটিগিরি দর্শন, বামে সত্যগিরি রেখে চণ্ডপুর নগরে আগমন, কান্তার দেশের কাছে নীলগিরি পর্বতে আগমন, গুর্জরী নগরের কাছে অগস্ত্য কুণ্ডেতে স্নান, পূর্ণনগরের (পুনা) পথে বিজাপুর পর্বতে হরগৌরী বিগ্রহ দর্শন, সহ্যপর্বত (উত্তর পশ্চিম ঘাট) দর্শন করে পূর্ণনগরে প্রত্যাবর্তন, অচ্ছসর

(পুনার দক্ষিণে হ্রদ) দর্শন, নাটস (পারশ) গ্রাম পেরিয়ে গোরঘাটের (পারঘাট ?) নিকটে পর্বতের উপরে ভোলেশ্বর শিবদর্শন, নিকটবর্তী সিন্ধুকূপের জলে স্নান, দেবলেশ্বর পর্বতে দেবলেশ্বর দর্শন, জিজুরীতে খাণ্ডবার নারী নামে দেহপসারিনীদের উদ্ধার, সদলে নারোজী দস্যুর উদ্ধার, চোরাবন্দী অরণ্য থেকে অগ্রসর হয়ে মুলো নদীর তীরে খাণ্ডবা তীর্থ দর্শন, মুলোনদীতে স্নান, নাসিক দর্শন, ত্রিমুখের (ত্র্যম্বক) কাছে রামচন্দ্রের চরণচিহ্ন দর্শন, পঞ্চবটীতে লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত গণেশ দর্শন, দমন নগরী গমন, পাথকে একপক্ষকাল ভ্রমণ, সুরাটে অষ্টভুজা ভগবতী দর্শন, সুরাটে তিনদিন অবস্থান, তাপ্তী নদীর নিকটে বলিরাজা প্রতিষ্ঠিত বামনদেবের বিগ্রহ দর্শন, ভঁরোচ নগরে (ভারুকচ্ছ—Broach) বলির যজ্ঞকুণ্ড দর্শন, নর্মদায় স্নান বরোদায় ডাঁকোরজী ঠাকুর ও গোবিন্দ বিগ্রহ দর্শন, মহানদী অতিক্রম করে আমেদাবাদে উপস্থিতি, শুভ্রামতী নদী পার হয়ে দ্বারকার পথে গমন, ঘোগাগ্রামে বারমুখী নামে বারাঙ্গনার উদ্ধার, জাফরাবাদে রাত্রিযাপন করে ছয়দিন পথ চলে সোমনাথে উপস্থিতি, জুনাগড়ে রণছোড়জী দর্শন ও দুইদিন অবস্থান, গিনার পর্বতের চূড়ায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন, ভদ্রানদী পার হয়ে ধন্বিধর ঝারি নামক অরণ্য সাতদিনে অতিক্রম করে অমরাপুরী গোপীতলা বা প্রভাসতীর্থে আগমন, প্রভাসের দক্ষিণে যদুপতির যজ্ঞদর্শন, সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হয়ে আশ্বিনের প্রথম দিনে দ্বারকায় উপস্থিতি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বারকায় ১৫ দিন অবস্থানের পর কড়চায় শ্রীচৈতন্যের প্রত্যাবর্তনের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। প্রত্যাবর্তনকালে নর্মদার তীর ধরে দোহদনগরে রাত্রিযাপন, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে আমঝোরা, লক্ষ্মণকুণ্ড ও পরে বিন্ধ্য পর্বতে আগমন, বিন্ধ্য পর্বতের উপরে গুহাবাসী তপস্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কার তিন দিনে দেবঘর, পরের দুদিনে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী শিবানীনগরে উপস্থিতি, শিবানী নগরের পূর্বদিকে মলয়পর্বতে দর্শন, চণ্ডীপুরে চণ্ডীদেবী দর্শন, রায়পুরে আগমন, বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন, তৎপরে রত্নপুর, স্বর্ণগড়, সম্বলপুর অতিক্রম করে ভ্রমরানগরীতে ভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সংগে মিলন, প্রতাপনগরীতে হরিনাম দান, রসালকুণ্ডে কূর্মদেবের সংগে সাক্ষাৎকার, মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ-উদ্ধার, ঋষিকুল্যা নদীর তীর ধরে আলালনাথে আগমন, অবশেষে মাঘমাসের তৃতীয় দিনে দশ মাস পরে মহাপ্রভুর পুরীতে আগমন কড়চায় বর্ণিত হয়েছে।

মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়।
সাংগোপাংগ সহ মিলি পুরীতে পেঁছায় ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণে স্থান ও ক্রমের প্রভূত পার্থক্য দেখা যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে যে তীর্থস্থানের নাম ক্রম অনুসারে হয় নি তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥
* * *
সেই সব তীর্থের কর্ম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফিরি ॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ (চৈ. চ. মধ্য. ৯ পরি.)

মহাপ্রভুর তিরোধানের অর্ধশতাব্দী পরে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে বসে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করায় স্থানের অনুক্রম তাঁর রচনায় না থাকাই স্বাভাবিক। মোটামুটি তিনি ভাগবতে বলদেবের তীর্থযাত্রার বর্ণনাকেই অনুসরণ করেছেন। জীবনীকররা কেউ-ই মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-পরিক্রমার সঙ্গী ছিলেন না। কেবলমাত্র গোবিন্দদাস কর্মকার মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন বলে দাবী করেছেন। নানা কারণে

গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণ্যতায় সন্দেহ হয়। অন্য কোন চরিত গ্রন্থে মহাপ্রভুর সঙ্গী হিসাবে গোবিন্দ কর্মকারের নাম উল্লিখিত হয় নি। চারুচন্দ্র শ্রীমাণি গণনা করে দেখিয়েছেন যে, চৈতন্য চরিতামৃতে দাক্ষিণাত্যের ৯০ টিরও বেশী তীর্থ উল্লিখিত হয়েছে, গোবিন্দর কড়চায় ৭২ টি তীর্থের উল্লেখ আছে, দুই গ্রন্থে সাধারণ তীর্থের নাম ৩৬, চৈতন্য চরিতামৃতে ৫৪টি অতিরিক্ত তীর্থ এবং কড়চায় ৩৬ টি অতিরিক্ত তীর্থের নাম আছে। তিনি আরও দেখিয়েছেন, গোবিন্দর বিবরণে ও অনুক্রমে ভুল আছে। (চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ, পৃঃ ৫৬)। চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু নাসিক পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁর মত কৃষ্ণপ্রেম বিহ্বল ব্যক্তির পক্ষে অতদূরে গিয়ে দ্বারকা না দেখে ফিরে আসা অস্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর সমকালীন কবি ও ভক্ত মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, পরমানন্দ সেন, জয়ানন্দ এবং লোচন দাস সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকেই মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ না দিলেও আদি খণ্ডে গ্রন্থবিষয় বর্ণনা কালে লিখেছেন—"শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌর রায়।" বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছিলেন, লোচনদাস তথ্য পেয়েছেন চৈতন্য পার্ষদ নরহরি সরকারের কাছ থেকে। সুতরাং এঁদের কথায় অবিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং সেতুবন্ধ থেকে দ্বারকা পর্যন্ত মহাপ্রভুর ভ্রমণ-বিবরণে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সন্দেহ নিরসনের কোন উপায় নেই।

সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়বারের পরিক্রমা গৌড়-রামকেলি। দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি গৌড়-উৎকলের ভক্তদের সংগে চার বৎসর যাপন করেছিলেন। পঞ্চম বৎসরে তিনি বৃন্দাবন যাত্রার সংকল্প নিয়ে বিজয়া দশমীর দিন গৌড় হয়ে বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য রওনা হলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

এই মত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিল গৌড়ে চলিলা॥ (চৈ. চ. মধ্য. ১৬ পরি.)

মহাপ্রভুর গৌড়দেশ দিয়ে ঘুরপথে বৃন্দাবন যাওয়ার কারণ জননী ও জাহ্নবী সন্দর্শন। বাসুদেব সার্বভৌম ও রায় রামানন্দকে তিনি বলেছিলেন,—

গৌড়দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥ (ঐ)

কৃষ্ণদাসের বিবরণ অনুসারে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর যাত্রাপথে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য গ্রামে গ্রামে বিষয়ীদের কাছে আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেছিলেন। কবিকর্ণপুরের নাটকে এবং মহাকাব্যে আছে রাজা শ্রীচৈতন্যের পথক্লেশ দূর করার জন্য গ্রামে গ্রামে পত্রিকা প্রেরণ করেছিলেন; পুরীশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোপীনাথ ও গোবিন্দ তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন; রামানন্দ গিয়েছিলেন ভদ্রক বা ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত। জয়ানন্দের মতে জননী ও জন্মভূমি দর্শনের অভিলাষেই মহাপ্রভুর এই যাত্রা। সে সময়ে গৌড়দেশে প্রবেশের দুটি স্থলপথই রুদ্ধ ছিল। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের সঙ্গে উৎকলাধিপ প্রতাপরুদ্রদেবের সংঘাতই এর কারণ। জলপথে যাতায়াতই একমাত্র উপায়। গৌড়দেশের সীমায় হোসেন শাহের তুরস্ক দেশীয় মদ্যপ শাসনকর্তা শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পৃথক নৌকায় মন্ত্রেশ্বর নদ উত্তীর্ণ হয়ে পিচ্ছলদা পর্যন্ত

পেঁৗছে দিয়েছিলেন। নাবিকগণ হরিনাম করতে করতে দ্রুত নৌকা চালনা করে একদিনেই পানীহাটীতে উপনীত হয়েছিল। পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে রাত্রিবাস করে মহাপ্রভু গঙ্গাপথে কুমারহট্টে শ্রীরাম পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হন। জগদানন্দ শিবানন্দের গৃহ পর্যন্ত পথ সুসজ্জিত করে রাত্রি প্রভাতে মহাপ্রভুকে শিবানন্দের গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে কিছুকাল অবস্থান করে প্রভু এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে। তারপর তিনি জলপথে এলেন নবদ্বীপের অপরপারে কুলিয়াগ্রামে মাধব দাসের গৃহে। এখানে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করে তিনি স্থলপথে উত্তরবঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তারপর কিছুদূরে গিয়ে তিনি নীলাচলের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মোটামুটি এই বিবরণ অনুসরণ করলেও তাঁর বিবরণে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। তার বিবরণে চৈতন্যদেব চিত্রোৎপলা নদীতে স্নান করে ভক্তগণকে বিদায় দিয়ে নৌকাযোগে উপনীত হলেন রেমুণায়। এখান থেকে রামানন্দ রায়কে বিদায় দিয়ে ওড্রদেশের সীমানায় উপনীত হন। এখানকার যবন শাসনকর্তা প্রভুকে পিচ্ছলদা পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি পাণিহাটীতে নৌকাযোগে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হয়ে রাত্রিযাপন করেন। তারপর তিনি কুমারহট্টে শ্রীনিবাসের (শ্রীবাস) গৃহে, তৎপরে শিবানন্দ, বাসুদেব, বাচস্পতি ও মাধব দাসের গৃহে পদার্পণ করে আসেন শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে। এখানেই শচীমাতার সংগে তাঁর মিলন হয়। কবিরাজ গোস্বামী এর পরেই মহাপ্রভুর রামকেলি গ্রামে গমন ও কানাই এর নাটশালা থেকে শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করেছেন।

মহাপ্রভুর গৌড় পরিক্রমার বিবরণ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন দাসের উপর ছেড়ে দিয়ে সংক্ষেপে সেরেছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা একেবারেই বাদ দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে মহাপ্রভু বিশারদনন্দন বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি মিশ্রের গৃহে কুলিয়াতে উপস্থিত হয়েছিলেন, এখানে বহুলোকের সমাগম হওয়ায় গংগার তীরে ধরে বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের অভিমুখে যাত্রা করেন। গৌড়ের নিকটে ব্রাহ্মণপ্রধান রামকেলি গ্রামে তিনি চার পাঁচদিন অতিবাহিত করেছিলেন, এখানেও প্রচুর লোকসমাগম হতে থাকায় সুলতান হোসেন শাহ অমাত্য কেশব খাঁকে পাঠিয়েছিলেন সন্ন্যাসী সম্পর্কে সংবাদ নিতে। কেশব খাঁ রাজার অপ্রীতির ভয়ে মহাপ্রভুকে সামান্য ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলে বর্ণনা করলেও সুলতান তাঁকে ঈশ্বর ভেবে নির্বিঘ্নে হরিনাম কীর্তনে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান উড়িষ্যা আক্রমণ করে যেভাবে দেবমন্দির ধ্বংস করেছিলেন তা স্মরণ করে ভক্তরা মহাপ্রভুকে রামকেলি ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুলতানকে ভয় না পেলেও রামকেলি থেকেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমংগলে শ্রীচৈতন্যের গৌড়যাত্রা পথে তুংগদা, ভদ্রক, অম্বুগড়া, সরোনগর, রেমুমা, বাঁশদহ, দাঁতন, জলেশ্বর, দেবশরণ, মন্দারণ ও বর্ধমান পড়েছিল। বর্ধমানের নিকটে মাঞিপুরা বা আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে তিনি বিশ্রাম ও ভোজন করেছিলেন। পরে বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে একরাত্রি যাপন করেছিলেন। সহস্র সহস্র লোকের সমাগমহেতু প্রভু লুকিয়ে পালিয়ে আসেন কুলিয়াগ্রামে। কুলিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে গৌড়ের নিকটবর্তী কৃষ্ণকেলি (রামকেলি?) গ্রামে তিনি সকলকে হরিনাম সংকীর্তনে উন্মত্ত করেছিলেন। গৌড়ের সুলতান কেশব খাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে ধরে আনতে। এই সংবাদ শুনে মহাপ্রভু শান্তিপুরে ফিরে আসেন। শান্তিপুরে রাত্রি যাপন করে প্রভু আসেন কুমারহট্টে শিবানন্দের গৃহে, তৎপরে পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে, তৎপরে বরাহনগর ঘুরে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

জয়ানন্দের অনেক আজগুবি কাহিনীর মত হোসেন শাহ সম্পর্কিত কাহিনীও অবিশ্বাস্য।

উড়িষ্যা ও কামরূপে তিনি মঠমন্দির ভাঙলে হিন্দুদের সংগে উদার ব্যবহারই করেছেন। শ্রীচৈতন্যের মত নির্ভীক সন্ন্যাসীর রাজভয়ে পলায়ন ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে গৌড় দেশে এসে প্রথমে পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী পরে কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে, তৎপরে বাসুদেব ও শিবানন্দের বাড়ীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে শান্তিপুর গিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ দাস জানিয়েছেন যে পদ্মা পার হয়ে পদ্মাপারে একটি গ্রামের শোভা দেখে বৃন্দাবন গমনাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সেখানেই অবস্থানের সংকল্প করেছিলেন, পরে নিত্যানন্দের কথায় রওনা হয়ে গৌড়ের নিকটবর্তী চতুরপুর গ্রামে উপনীত হন, এখানে সনাতনের সংগে সাক্ষাৎ করে তিনি কানাই এর নাটশালায় এসেছিলেন। প্রেমবিলাসের এই গল্পও কাল্পনিক বোধহয়।

বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে মহাপ্রভুর গৌড় গমনাগমন পথের বর্ণনায় পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে কবিকর্ণপুর বর্ণিত পথের ক্রম ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে গ্রহণযোগ্য। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন মথুরা না গিয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কারণ মনে হয় অত্যধিক জনসমাগম। নিত্যানন্দ দাস লিখেছেন—

লোকভিড় দেখি না গেলা বৃন্দাবন।
শীঘ্র করি নীলাচল করিলা গমন॥ (প্রেমবিলাস—২৪ বিলাস)।

চৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন মহাপ্রভুকে বলেছিলেন—

ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড় রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতে।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যার সংগে এই চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এ নহে পরিপাটী॥ (চৈ. চ. মধ্য. ১ পরি.)

গৌড় রামকেলিতে হোসেন শাহের মন্ত্রী সাকরমল্লিক ও দবিরখাসের সংগে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দুইভাই পত্রযোগে নীলাচলে মহাপ্রভুর সংগে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁরা এখন মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করলেন। প্রভু তাঁদের নতুন নামকরণ করেন রূপ ও সনাতন। মহাপ্রভু তাঁদের বলেছিলেন—

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন॥ (চৈ. চ. মধ্য ১ পরি.)।

জননী জন্মভূমি ও জাহ্নবীদর্শন এবং রূপ সনাতনের সংগে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যই মহাপ্রভু শান্তিপুর নবদ্বীপ-কুলিয়া ঘুরে গৌড় রামকেলি হয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু অত্যধিক জনসমাগমহেতু তাঁকে নীলাচলে ফিরে যেতে হয়েছিল।

জয়ানন্দের চৈতন্যমংগল পাঠে মনে হয় মহাপ্রভু দুবার গৌড়ে এসেছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌমকে হরিনাম চিন্তামণি দান করার পরে জননী জন্মভূমি দর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি নবদ্বীপে এসেছিলেন। সন্ন্যাসীর জন্মভূমি দর্শন ধর্মের অংগ।

সর্বলোকে বলে আছে দেবের প্রচার।
সন্ন্যাস লইলে জন্মভূমি দেখি একবার॥

* * *

চৈতন্য গোসাঞি বলেন জন্মভূমি দেখি।
মাত্র নমস্কারি আসি ধর্ম রক্ষি॥ (উৎকলখণ্ড—১৩)।

এই সময়ে মহাপ্রভু পার্ষদগণ সহ কমলপুর, কাচড়িপাড়া ছাড়িয়ে একাম্রবনে বিন্দু সরোবরে

স্নান করে শিবদর্শন ও রাত্রিযাপন করে কটক, যাজপুর, ব্রহ্মদা, সরোভদ্র, রেমুণা, বাঁশদা, জলেশ্বর, দাঁতন অতিক্রম করে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বারাসত দিয়ে তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। মাহেশ গঙ্গার তীরে দিগ্‌চেতেরা, নিম্বাদিত্য দিয়ে আম্বা (অম্বিকা কালনা) অতিক্রম করে শান্তিপুর ডাইনে রেখে নবদ্বীপ পৌঁছালেন।

জন্মভূমি দেখি মাত্র নমস্কার করি।
রহিলা করুণা গ্রামে বঞ্চিয়া শর্বরী॥ (চৈ. ম. উৎকল—১৩)

দ্বিতীয়বার তিনি জগন্নাথের আজ্ঞা নিয়ে গৌড়দেশে গিয়েছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র সেই সময়ে বিজয়নগরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই যাত্রাতেই তিনি গৌড় রামকেলি গিয়েছিলেন। (চৈ. ম. বিজয়খণ্ড—৩। ৪)।

গৌড়দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে মহাপ্রভু বৃন্দাবন মথুরা পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অনুসারে তিনি গৌড়দেশ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে লোকসমাগমের ভয়ে একাকী বনপথে মথুরা যাত্রা করেছিলেন। মহাকাব্যেও কবিকর্নপুর একই তথ্য পরিবেশন করেছেন। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর মথুরাগমনের উল্লেখ করেছেন মাত্র—

ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায়।
* * * *
শেষ খণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার॥ (চৈ. ভা. আদি. ১ অঃ)।

চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে গৌড় থেকে প্রত্যাগমনের পরে মহাপ্রভু ভক্তদের ইচ্ছায় চারমাস নীলাচলে অবস্থান করেছিলেন, তৎপরে রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের ইচ্ছানুসারে বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে এক রাত্রি শেষে লুকিয়ে বনপথ দিয়ে মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রকাশে বলেছেন যে বৃন্দাবন যাত্রায় মহাপ্রভুর সংগী হয়েছিলেন নিত্যানন্দ তনয় অচ্যুতানন্দ। এ তথ্য অন্য কোন স্থান থেকে সমর্থিত হয় না। মহাপ্রভু পুরী থেকে নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করেছিলেন প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য। তৎপরে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। মহাপ্রভু ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ১৫১৫। ১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। সুতরাং অচ্যুতানন্দের সখী হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। লোচনদাস ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন গমনের উল্লেখ করেছেন—ঝারিখণ্ড পথে প্রভু চলিলা সত্বর (চৈ. ম. শেষ খণ্ড)। ঈশান লিখেছেন—

সুপ্রশস্ত পথ ছাড়ি উপপথে যায়।
ঝারিখণ্ডের পথে চলে লোকের বিস্ময়॥ (অঃ প্রঃ ১৫ অঃ)

মুরারির কড়চায় বলদেব প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর অনুগমন করেছিলেন। ঝারিখণ্ড দিয়ে বৃন্দাবনের পথের বর্ণনা কোন চরিতগ্রন্থে নেই। মুরারি, কৃষ্ণদাস, লোচন প্রভৃতি জীবনীকারেরা মহাপ্রভুর কাশীতে অবস্থানের উল্লেখ করেছেন, তপন নামক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ, চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে অবস্থান করে হরিভক্তি বিতরণ, প্রয়াগে মাধব ও অক্ষয়বট দর্শন করে ত্রিবেণীতে স্নান এবং রেণুকা গ্রাম ও রাজগ্রাম অতিক্রম করে গোকুল দর্শন করে তিনি মথুরায় উপনীত হয়েছিলেন মথুরায়। লোচনদাসের বর্ণনায় কাশীতে বিশ্বনাথ, প্রয়াগে মাধব ও অক্ষয়বট দর্শনান্তে ত্রিবেণীতে স্নান করে আগ্রার নিকটে যমুনা পার হয়ে পরশুরামের আবির্ভাব স্থান রেণুকা গ্রাম অতিক্রম করে মহাপ্রভু রাজ গ্রামের অপর পারে গোকুল দর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস পথে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাত্রিযাপন করে পরদিন তিনি কৃষ্ণদাসের সাহায্যে মথুরামণ্ডল দর্শন করেছিলেন (চৈ. ম. শেষখণ্ড)। কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণে কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে আতিথ্য এবং চন্দ্রশেখর বৈদ্যের বাড়ীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে মহাপ্রভু দশদিন

কাশীতে অবস্থান করেছিলেন। কাশীর পরে প্রয়াগে তিনদিন অবস্থান করে তিনি প্রথমে মথুরায় ও পরে বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ রাধাকুণ্ড উদ্ধার, গোবর্ধন দর্শন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল দর্শন প্রভৃতি সমাপন করে তিনি উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে পাঠান বিজুলীখান সদলে তাঁর ভক্ত ও সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছিলেন। প্রয়াগে মহাপ্রভু দশদিন কাটিয়েছেন। এই সময়েই বৈষ্ণবপণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবন যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলন। বারাণসীতে দুমাস অবস্থান কালে সনাতনকে শিক্ষা দিয়ে মহাপ্রভু অরণ্যপথে নীলাচলে ফিরে এসেছিলেন। এই সময়েই বারাণসীতে তিনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে স্বমতে আনয়ন করেন।

মুরারি ও লোচন প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন মথুরা থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে গৌড়মণ্ডলে এসেছিলেন। মুরারির কড়চায় বৃন্দাবন মথুরা থেকে তিনি কুলিয়াগ্রামে উপনীত হয়েছিলেন। সেকালে নবদ্বীপ থেকে আগত ভক্তগণের অনুরোধে নবদ্বীপে উপস্থিত হয়ে মাতৃচরণ বন্দনা করেছিলেন এবং শচীদেবীর রান্না চতুর্বিধ রসযুক্ত অন্নব্যঞ্জন নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে ভোজন করেছিলেন। মুরারির কড়চার একটি শ্লোক থেকে মনে হয় এই সময়ে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর বিগ্রহ নির্মাণ করে পূজা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু নবদ্বীপে শ্রীবাসাদি ভক্তগণের গৃহে কীর্তন নৃত্য করে অম্বিকা কালনায় নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করেছিলেন। গৌরীদাসকে শ্রীচৈতন্যও নিত্যানন্দ তাঁদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছিলেন। গৌরীদাসের গৃহ থেকে শ্রীচৈতন্য ভক্তদের সঙ্গে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উপস্থিত হন। অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপ থেকে শচীমাতাকে আনয়ন করেন। শচীমাতা ও অন্যান্য বৈষ্ণব পত্নীদের দ্বারা পাচিত অন্নব্যঞ্জন সুখে ভোজন করে সংকীর্তন ও নৃত্যে কয়েকদিন যাপন করে মহাপ্রভু নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

লোচনের কাব্যে মথুরা বৃন্দাবন থেকে মহাপ্রভু রাঢ়দেশ দিয়ে কুলিয়া নগরে উপস্থিত হয়েছিলেন। মাতা ও ভক্তদের আহ্বানে নিজের বাড়ীর কাছে বারকোণা ঘাটের নিকটে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে রাত্রি যাপন করে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি শ্রীক্ষেত্রের পথে রওনা হয়েছিলেন। শান্তিনগর অতিক্রম করে তাম্রলিপ্ত দিয়ে তিনি শ্রীক্ষেত্রে পেঁৗছেছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু সম্ভবতঃ দুবার গৌড়দেশে কুলিয়া-নবদ্বীপ শান্তিপুরে এসেছিলেন। একবার বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশে বহির্গত হয়ে গৌড়-রামকেলি থেকে শ্রীক্ষেত্রে ফিরে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে কুলিয়া-নবদ্বীপ শান্তিপুরে এসেছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বেই শ্রীচৈতন্য দুবার গৌড়মণ্ডলে এসেছিলেন। জয়ানন্দের বিবরণ যদি যথার্থ হয় তবে মোট তিনবার তিনি গৌড়দেশে এসেছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ ছাড়া আর কোন জীবনীকার বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে মহাপ্রভুর দুবার গৌড়ে আসার কথা বলেন নি।

বিভিন্ন সংস্কৃত বাংলা ও অসমীয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণের বিবরণ আছে। অসমীয়া গ্রন্থ ভট্টদেবের সৎ সম্প্রদায় কথা, কৃষ্ণভারতীর সন্তনির্ণয়, কৃষ্ণ আচার্যের সন্তবংশাবলী, আধুনিক কালে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার শ্রীশঙ্করদেব আর শ্রীমাধবদেব প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম ও মণিপুর ভ্রমণের উল্লেখ আছে, কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভুর আগমনের কিংবদন্তী আজও প্রচলিত। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, বৃন্দাবন থেকে ফেরার

পথে শ্রীচৈতন্য আসাম গিয়েছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান ২য় সং পৃঃ ৫১৮-২২)। কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য বৃন্দাবন থেকে গৌড় হয়ে পুরী গমনের পথের বিবরণও কেউই দেন নি। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের চৈতন্যোদয়াবলী ও চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়ে শ্রীচৈতন্য মাতার ইচ্ছানুসারে গার্হস্থ্য জীবনে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে শ্রীহট্ট গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য আসাম-কামরূপ গিয়েছিলেন কিনা তা যথাযথভাবে জানার উপায় নেই।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন প্রায় ২৪ বৎসর। তন্মধ্যে পূর্ব উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় তিনি ছয় বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ (চৈ. চ. মধ্য. ১ পরিচ্ছেদ)

অবশিষ্ট ১৮ বৎসর তিনি নীলাচলেই যাপন করেছেন। এই ছয় বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে তিনি দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তর ভারতে বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করতে ও প্রেমভক্তির পথে আনয়ন করতে যে সমর্থ হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তারই ফলে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী একটি প্রেমভক্তির আন্দোলন গড়ে উঠেছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। □

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য

সাধনচন্দ্র সামুই

তত্ত্ব এবং তথ্য দুটো কথা। তথ্য হ'ল ঘটনা, যা ঘটে। তত্ত্ব হ'ল সত্য, যা শাশ্বত। রাম-রাবণের যুদ্ধ তথ্য। ভগবান রামচন্দ্র ভক্ত রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন—এটা তত্ত্ব। শ্রীরাম মানবের ঘরে জন্মেছেন, তথ্য। শ্রীরাম পূর্ণব্রহ্ম—এটা তত্ত্ব। গদাধর জন্মগ্রহণ করলেন দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর ঘরে—এটা তথ্য। আবার গদাধর রাম ও কৃষ্ণ নবরূপে—এটা তত্ত্ব। পরম তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য সনাতন অনন্ত রূপ নিরঞ্জন বিভু। আপন মায়ায় মায়িক অথচ মায়ামুক্ত বৈকুণ্ঠ বিহারী আবার নেমেছেন। তত্ত্বদর্শিনী ভৈরবী মা দেখছেন এবার নিত্যানন্দের খোলে, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ। নিত্য আনন্দ সত্তা ভগবানের। সেই পরম আনন্দ নরকণ্ঠ আশ্রয় করে উচ্চারণ করলেন—তিনিই সব হয়েছেন। তিনিই বেত্তা, তিনিই বেদ্য, তিনিই পরমধাম। তিনিই জ্ঞান; তিনিই জ্ঞেয়। তিনিই বেদ; তিনি নব রূপে বেদের ভাষ্য।

'নাচে প্রাণের গোরা ভাবের ভরা মুখে বলে হরিহরি
ক্ষণে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণে রাই কিশোরী।'

তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য মধ্যে ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রতিভাত। আমরা তত্ত্ব বুঝি কই? তথ্য খুঁজি, তত্ত্ব তলিয়ে যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে পরমধাম রূপে আশ্রয় করতে পারি না। তথ্যের দারু খণ্ড সাজাই। তাতে ভক্তি-তত্ত্বের-হোমাগ্নি জ্বালতে পারি না। কথামৃত পান করে অমৃতময় হতে পারলে শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীচৈতন্যে ভেদ থাকতো না। তথ্যদর্শীরা শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণে ভেদ দেখে। শ্রীচৈতন্য সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ কথা অনুচ্চকণ্ঠে অস্ফুট বেদনায় নতমুখী। শ্রীরামকৃষ্ণ সভায় শ্রীচৈতন্য কথা উচ্চকণ্ঠে উক্ত হয় না।

একই ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণরূপে বিরাজ করছেন। তথ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য জীবন কথা আলোচিত হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণজীবন তথ্য বহুল। শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি শ্রীশ্রীঠাকুরের তথ্যপূর্ণ লীলার প্রামাণ্য গ্রন্থ। পক্ষান্তরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবৎ ইত্যাদি গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মানবিক ও দিব্যজীবনলীলার পদ্মসৌরভে পূর্ণ। বাংলার এই দুই মহাপুরুষের জীবনধারা তত্ত্বের দিক দিয়ে ভক্তের কাছে এক হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। ম্যাক্সমূলার ইংরাজীতে সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করতে চেষ্টা করেন। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের তথ্যসমূহ সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল। কাজেই দেখা যায় তথ্য আলোচনায় মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থ কম নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে। মোটামুটি সাড়ে তিনশো

বছরের ব্যবধান। তথ্যের দিক দিয়ে দেখলে সহজেই নজরে পড়ে যে শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের সাড়ে তিনশো বছর পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান প্রেমধর্ম একটা বিকৃত রূপ ধারণ করেছিলো। বৈষ্ণবধর্মে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ উঠেছিল প্রধান হয়ে। বৈষ্ণব ধর্মচর্চায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বাবাজী সম্প্রদায় এক বিকৃতরুচির আকর্ষণে আসল বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব থেকে সরে গিয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমতত্ত্ব প্রাকৃত রজকিনীর বিকশিত যৌবনে নিকষিত হেমপ্রভা আচ্ছন্ন করেছিল। লুপ্ত, সুপ্ত হয়েছিল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রকাশক বৈষ্ণব—প্রেমতত্ত্ব। মধুরভাবের স্খলিত লোলিত লালসায় বিপথগামী সেদিন শুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'। ভক্তের ভগবান কৃষ্ণ পরমদেবতা। তথ্যের দিক দিয়ে তিনি গোপবালক। বংশীনিনাদ করে আহ্বান করেন শ্রীরাধাকে। তত্ত্বের কৃষ্ণ গোপবালক নহেন। রাধা কেমন গোপবালা নহেন। বিশ্বপিতা বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করেন মুক্তিকামী আরাধিকা। মুমুক্ষু জীবকৃষ্ণবংশী নিনাদ-তরলা রাধাভাব ভাবিত। শ্রীচৈতন্য ঐ রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ রূপে কৃষ্ণ বিমুখ কলিহত জীবকে কৃষ্ণমুখী করবার জন্য আপন আচরণকে উদাহরণ রূপে বিশ্ববাসীর সম্মুখে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রেমধারার স্পর্শে কলুষমুক্ত হয়েছিল কলির জীব। ছুটেছিল মানুষ কৃষ্ণসন্ধানে। মানস-বৃন্দাবনে মানব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কৃষ্ণকে। বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠী সেই যবন-যুগে পেয়েছিল ভক্তি, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের 'রাখী'—মহামিলনের আকাঙ্ক্ষায় সমাজের বুকে জ্বলেছিল শুদ্ধপ্রেম শিখা। চৈতন্য হয়েছিল মানুষের। তারা পেয়েছিল নিত্যানন্দ। বিষ্ণুর চৈতন্য-অবতারত্ব হয়েছিল সার্থক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার অবতীর্ণ।

কিন্তু এ কি! পাশ্চাত্য-শাসন যুগে সেই বিকৃতি! মানুষ হারাল আত্মচৈতন্য। নিত্যানন্দ হ'ল তিরোহিত। ভোগের পঙ্ককুণ্ডে পৈশাচিক লোভের অগ্নিশিখা উঠল জ্বলে। তাইকি আবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্য রূপে এলেন রামকৃষ্ণ? পুরাতন মহান আদর্শকে নবরূপায়ণ করতে এবার সত্যই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যের স্রোতোহীন ভাবগঙ্গায় আবার জোয়ার আনতে রামকৃষ্ণ—অবতার। অবতার তো অসংখ্য। মর্ত্যমানবের প্রয়োজনে বিশ্বদেবতার নবরূপে মর্ত্ত্যা-বতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের বহুমুখী আন্দোলনের এটা একটা মস্ত বড় দিক।

তথা কথিত ভক্ত সম্প্রদায় বলেন হেলায় শ্রদ্ধায় যেমন করে পারো নাম করো, তাতেই হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিবাদ, 'তোতা পাখীতেও নাম বলে, তাতে কি তার মুক্তি হয় র‍্যা।' অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য ও নিষ্ঠাযুক্ত নামকীর্তন না হলে, নামে অনুরাগ না থাকলে মুক্তি মেলে না। তিনি পাণিহাটীতে চিড়া-উৎসবে গিয়ে ভক্তকীর্তনীয়ার অঙ্গভঙ্গী দেখে বিরক্তি বোধ করেছেন। আবার কলুটোলার গৌর সভায় গিয়ে চৈতন্য ভাবে বিভোর ঠাকুর বসেছেন বিষ্ণুখট্টায়। প্রতিবাদ কেউ করেন নি। অবশ্য শোনা যায় যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ চৈতন্য সভা পরিত্যাগের পর ভগবানদাস বাবাজী প্রতিবাদের-মৃদু ঝড় তুলে ছিলেন কিন্তু তা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য ভাব মেঘকে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্য জন্মস্থান নবদ্বীপ। ভক্তের নিকট এই স্থান ভগবানের লীলাস্থল। মহাতীর্থ। স্বয়ং তীর্থ রামকৃষ্ণ। লীলাচ্ছলে ভগবান রামকৃষ্ণ আসছেন প্রেমময় ভগবান শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান দর্শন করতে। ঠিক যেমন ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব গিয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখতে বৃন্দাবনে। রামকৃষ্ণদেব আসছেন গঙ্গাবক্ষে নৌকায় চড়ে। কালনায় প্রবেশ করলেন তিনি! কালনায় ভগবান দাসের সন্ধান পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রী-অঙ্গের পদ্ম সৌরভ নিলেন ভগবান দাস বাবাজী। স্বীকার করলেন তাঁকে নদীয়ার গৌরহরি বলে। নদীয়ার গৌরহরি রামকৃষ্ণ বেশে এলেন ভক্তজনে দিতে পদতরী। বর্তমান নবদ্বীপ ধামের যে স্থান দিয়ে মজা-গঙ্গা সে যুগে সে স্থানেই ছিল গঙ্গার প্রবাহমান পথ। গঙ্গাপথে নৌকায় বসে নীল-পীত বসন পরিহিত দুই কিশোরের দিব্য মূর্তি তিনি দর্শন করেন। উভয়েই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অঙ্গে গৌরভাব উদ্দীপন বিভাব দ্বারা সহজেই প্রকাশ পেত। যেন আপন সুপ্ত চৈতন্যের স্তর থেকে

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্বাহ্যদশায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জাগ্রত হতেন। তাঁর স্ত্রীভক্তদের মধ্যে গৌরীমা ছিলেন তাঁর কাছে গৌরদাসী। নবদ্বীপ ধামে সেই পুতঃভাবা, প্রেম-পবিত্রা গৌরীমার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে কালের কপোলতলে আজও বিলীন হয়নি। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের অভেদত্ব প্রচারিত হয়ে চলেছে। 'কথামৃত' গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রগুপ্ত মহাশয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তবৃন্দের শিরোমণি বলরাম বসুকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীচৈতন্যের পরিকর রূপে চিহ্নিত করেছিলেন।

সবথেকে আশ্চর্যের কথা এই যে—যিনি পড়াশুনা মোটেই পছন্দ করতেন না, যিনি গ্রন্থকে গ্রন্থী বলতেন বার বার ; তিনিই ভৈরবীমার কাছে সরল শিশুটির মত বসে বসে শ্রবণ করতেন তন্ত্র কথা এবং চৈতন্য ভাগবত। তিনি বার বার আপন অন্তরঙ্গ পার্ষদদের শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করার উপদেশ দিতেন। শুধু বাক্যে নয় নিত্যলীলায় তাঁর মধ্যে চৈতন্য ভাব হত প্রকাশিত।

কোটি সূর্য প্রভা শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্যোতি। অনন্ত ভাবময় ঈশ্বর। যুগের অবতার বরিষ্ঠ। জীবকল্যাণে নর তনুধারী নারায়ণ—নরের আশ্রয়। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন দিব্য জ্যোতির তমোনাশী আলোক বর্ষণে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, তথাগতবুদ্ধ প্রমুখ ঈশ্বর অবতার গণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ঠিক পূর্ববর্তী প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চিরমহিম মণ্ডিত রসের থেকে তিনি আমাদের রঞ্জিত করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্য জীবনের উপলব্ধির দ্বারা তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যে ভাবে গ্রহণ করে প্রকাশ করেছেন তার অভিনব গুরুত্বের সীমা নাই। 'মা' 'মা' ডাকে আকাশ ফাটানো ক্রন্দনকারী রামকৃষ্ণের দিব্য অনুভূতিতে শ্রীচৈতন্য জীবন—সংবাদ শোনার আকর্ষণে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজার অর্ঘ্য এই প্রবন্ধ-পুষ্প।

যুগের ধর্মগ্লানি দূর করে, সাধুদের পরিত্রাণ, অসাধুদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য ভগবান অবতার হয়ে অবতরণ করেন এই মর্ত্যলোকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অবতারতত্ত্ব ধারণা করা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব সহজেই বোধগম্য হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'চৈতন্যদেব অবতার,-ঈশ্বর অবতীর্ণ"।

"তিনি (চৈতন্যদেব) ঈশ্বরের অবতার। তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফর্‌ ফর্‌ করে উড়ে গেল, ভিজল না। সর্বদাই সমাধিস্থ! কতবড় কামজয়ী! জীবের সহিত তাঁর তুলনা!" 'চৈতন্য ভক্তির অবতার, জীবকে ভক্তি শেখাতে এসেছিলেন। তাঁর উপর ভক্তি হ'ল তো সবই হল।" 'ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব।··· ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের মধ্যে খুঁজতে হয়।' 'অদ্বৈত জ্ঞান না হলে চৈতন্য দর্শন হয় না। চৈতন্য দর্শন হলে, তবে নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ। বেদান্ত মতে অবতার নাই। সে মতে চৈতন্য অদ্বৈতের একটি কুট। ভক্তিমতে অবতার।' 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।'

অবতারের অবতারত্ব অবতারেই ব্যাখ্যা করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন—বিবেকানন্দ কি করে গেল, আর একটা বিবেকানন্দ না এলে বোঝা যাবে না। সেই-রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টিতেই শ্রীচৈতন্য প্রতিভাত হন। সাধারণ মানুষ তথ্যপূর্ণ চৈতন্য জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে গবেষণা করেন। ভগবানের নরদেহ কোথায় গেল সে নিয়ে নানা ঘটনার উল্লেখ কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে। যুগ অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে প্রেমঅবতার নররূপে নারায়ণ। ব্রহ্ম ও শক্তি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।

সনাতন হিন্দুধর্মে চারিটি আশ্রমের উল্লেখ আছে। এগুলি ব্রহ্মচার্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। মানুষ যখন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে তখন তার পূর্বাশ্রমের নাম ত্যাগ করে নূতন নামে

পরিচিতি লাভ করেন। অধিকাংশ ঈশ্বরাবতার সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন না। কেবল ব্যতিক্রম বুদ্ধ ও চৈতন্যের ক্ষেত্রে। অবতার পুরুষ হ'য়েও শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন—

"চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন। সাধুসন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও, লোক শিক্ষার জন্য কামিনী কাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী-সন্ন্যাসী-জগদ্‌গুরু। তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের আপন কণ্ঠের উচ্চারণ,—তিনি নিত্যানন্দকে বলেছিলেন, 'নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তাহলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার করতে চাইবে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেহ চেষ্টা করবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেন, "আপনার কাছে গুড়ের নাগরী রয়েছে, পরকে বলছে গুড় খেওনা।" তাই ভেবে চৈতন্যদেব সংসারে না থেকে চলে গেলেন সন্ন্যাস নিয়ে। 'তা না হলে জীবের উদ্ধার হয় না। আবার এক প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"চৈতন্যদেব সন্ন্যাস করলেন—সকলে প্রণাম করবে বলে; যারা একবার নমস্কার করবে, তারা উদ্ধার হয়ে যাবে।"— অবতার পুরুষ হয়ে লোকশিক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্যের এই সন্ন্যাস-গ্রহণ। একথা স্বীকার করলেন, অনুভব করলেন এবং প্রচার করলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর অভিনব আবার সনাতন। নব নব লীলায় নব নব ভাব, কিন্তু পুরাতনী ঐক্যসূত্র সকল জায়গায়। বনের বেদান্তকে কেবল নগরে আনার প্রচেষ্টা মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের—দিব্যদৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের তাৎপর্য সহজ সরল ভাষায় জনসমাজে প্রচারিত হল। যুদ্ধোত্তর শতাব্দীর মহান লোকশিক্ষক, রামকৃষ্ণ আপন করুণায় ভগবানের কারুণ্যঘন লীলাময়তা প্রকাশ করলেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যকে মধ্যযুগের প্রথম নবজাগ্রত চেতনার পুরোধা শিক্ষক রূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি সমূহের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের তৎকালীন লোকনায়কত্ব পেল একালের নবগৌরার স্বীকৃতি। সত্য, great men think alike.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নরলীলা অনুপম মানবলীলা। মর্ত্যের মানুষের ঘরে স্বর্গের লীলাপটুর অভিনব পটুত্ব হয়েছিল প্রকাশিত। জননীকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে স্বীকার করেছে শাস্ত্রে। নরলীলায় পরম চৈতন্য, নিমাই দেহ আশ্রয় করে মাতার প্রতি যে মমত্বময় ভক্তি বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেছেন তার দৃষ্টান্ত ঈশ্বরের অন্যান্য অবতার দেহে বিরল দৃষ্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবের সাধক। শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও সেই মাতৃভক্তি লক্ষ্য করেছেন। স্পষ্টভাষায় তিনি বললেন, "চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন—'মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব'।" মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সাধক শ্রীচৈতন্য মাতৃভক্ত রূপে প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উল্লেখ করেন যে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।" গর্ভধারিণী জননী সাক্ষাৎ মহামায়ার মানবিক মূর্ত্তি। মহামায়ার কৃপা না হলে জীব মুক্তি পথে পা বাড়াতে পারে না। যোগীশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য পর্যন্ত মাতৃআজ্ঞা ছাড়া সন্ন্যাস নেন না। ভগবান অবতার হ'য়ে এসেও লৌকিক জননীর জঠর-আশ্রয় করে লীলার পুষ্টির পথ পান। এই মাতাই জগন্মাতার প্রতিরূপ। সেকারণেই নরলীলায় শ্রীচৈতন্য মার মনের বিরহ দূর করতে তাঁকে দর্শনদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। মাতৃভক্ত শ্রীচৈতন্যের পক্ষে জগন্মাতাকে বরণ করা স্বাভাবিক।

মহাভাবাধিকারী মহাভাগবত শ্রীচৈতন্য। মহাভাবময় নরদেব শ্রীরামকৃষ্ণ। উভয়েই মহাভাবময়ী শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি স্বীকার করেছেন। 'রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা' জগৎকে জানাতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। একই অঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণ। 'দুঁহু তনু এক তনু হোয়।' ঈশ্বর সাধনার

সকল মতকে স্বীকার করে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব মতে মধুর ভাবের সাধনা করলেন। কালী রূপী-কৃষ্ণকে সখীবেশে চামর ব্যজন করছেন তিনি। রসের ভাণ্ডারী জামাতা মথুর বিশ্বাস। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অষ্টনায়িকার অন্যতমা রূপে স্বীকৃতা রাসমণীদেবীর জামাতা এই মথুর। হেঁজি পেঁজি লোক নন। মাতা ভবতারিনীর শ্রীঅঙ্গে চামর ব্যজনরতা জনৈকা নবাগতাকে দেখছেন। মহাভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে সে কী মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার আবেশ তৎপরতা। ঠাকুর নিজ মুখে স্বীকার করেছেন—যে মধুর ভাবের সাধনার সময় তাঁর পবিত্র পুরুষ-স্তনাযুগলে দুগ্ধের সঞ্চার হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যলীলায় মহাভাবময়তার পরিপূরক রূপে বর্তমানে ভক্তানুকম্পার্থে ধৃত বিগ্রহ নবীন গৌরাঙ্গ তার দৃষ্টিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাবময় জীবন অভূত পূর্ববর্ণন কৌশলে জন চিত্তহারী।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে মনের ঘনীভূত ভক্তিভাব থেকে মহাভাব বা প্রেম জাগ্রত হয়। ভক্ত-নরদেহ ধারণ করার জন্য ভগবানকে ভক্তি আশ্রয় করতে হয়। ভক্তিশাস্ত্রে বৈধীভক্তি, তামসিক ভক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ভক্তির কথা আছে। সত্বগুণ ভক্তিরসের স্ফুরক। এই ভক্তি রসের প্রকাশ হল ভাব। রস সাহিত্যে আদি, করুণ, রুদ্র ক্রান্ত ইত্যাদি প্রায় দশ বিধি রসের কথা আছে। সত্বগুণ থেকে শান্ত মতান্তরে ভক্তি। কৃষ্ণ মেঘ দেখে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়। ক্রমে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ভক্তের মনে পূর্বরাগ জাগল। ক্রন্দন, হাস্য উন্মত্ততা ইত্যাদি সঞ্চারী তথা ভাবের ভিতর দিয়ে ভক্তির নিষ্পত্তি। এই ভক্তির প্রকাশ আট রকম ভাবের মধ্য দিয়ে হয়। ইহা অষ্টসাত্বিক ভাব নামে ব্যাখ্যাত। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ (মলিনতা), অশ্রু ও মূর্চ্ছা হল অষ্ট সাত্বিক ভাব। ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট ভক্ত শরীরে যুগপৎ এই-অষ্ট সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। এগুলির কয়েকটি স্থায়ীরূপে ভক্ত দেহে বিরাজ করে। সুদীপ্ত সাত্বিক ভাবে আবিষ্ট ভক্তবর মহাভাবদশা প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীচৈতন্য ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মহাভাব দশার অবস্থান করতেন। মহাভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য মহাভাবময় বিষ্ণুবিগ্রহ।

"শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাব—প্রেম। এই প্রেম হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যাবেই। নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।" ভাবের চেয়ে মহাভাব—প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।"

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীচৈতন্যের ভাবের কথা আবার বলেছেন—"উর্জ্জিতা ভক্তিতে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। যদি কারুর এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর স্বয়ং বর্তমান। চৈতন্যদেবের ঐরূপ হয়েছিল।" আবার বলছেন ঠাকুর, "চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হোত—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্য দশা, ও বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হতেন—জড় সমাধির অবস্থা হত। অর্ধবাহ্যে একটু বাহিরের হুঁস থাকতো। বাহ্যদশায় নাম গুণগান করতে পারতেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান,—জ্ঞান সূর্যের আলো! আর ভিতরে ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তি প্রেম, দুইই ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি প্রকৃত মানবের দৃষ্টি নয়। তিনি রূপময় কৃষ্ণ, রাম রূপ-একধারে রামকৃষ্ণ। চৈতন্যচরিতামৃতে কথিত আছে এক দৈবজ্ঞ শ্রীচৈতন্যের হস্ত রেখা দেখে তার মহান পুরুষোত্তমের লক্ষণ বলায় শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন পূর্বজন্মে তিনি গোরাবালক ছিলেন। এবার শ্রীরামকৃষ্ণও বুঝি আপন পূর্বজন্ম কথা অর্থাৎ চৈতন্যকথা বর্ণনা করতে অসুবিধা বোধ করেন। আপনার কথা আপনি বলেন রামকৃষ্ণও বেশী গৌরাঙ্গ। বিশ্বমানব অমৃতময় ঈশ্বরের সন্তান। সকল মানবের মানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ। কিন্তু মোহে, মায়ায় স্বার্থের লোলুপতায় তারা ভুলে যায় নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। বলবান, দুর্বলকে করে পীড়ন। মানুষের মধ্যে লোভ-লুব্ধ দানবী শক্তি হয় প্রবলা। সাধুত্ব রসাতলে যায়। মানবের পৃথিবীতে চলে দানবের দৃপ্ত

শাসন। জীবনের কর্তব্য বিস্মৃত মানুষ করে হানাহানি। ভাইয়ের রক্তে হাত হয় রক্তিম। শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ হয় উপেক্ষিত। উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল ওঠে আকাশে বাতাসে। তখন বিশ্ববিধাতার আসন চলে। অবতীর্ণ হয় বিধাতার শক্তি নূতন নর শরীর গ্রহণ করেত সর্বপাপহারী হরি। লোককল্যাণ দায়িনী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন ভ্রান্ত মানুষকে। শ্রীচৈতন্য ছিলেন কলি-কলুষিত জীবের কল্যাণকামী করুণাময় লোক শিক্ষক। তার শিক্ষা ও কর্মধারার উল্লেখ করে লোকগুরু রামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে সব কথা বলেছেন তার প্রকৃত প্রতিধ্বনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত,—শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর আকর গ্রন্থ।

শ্রীচৈতন্য ছিলেন কৃপাময় লোক শিক্ষক। তিনি যা ছিলেন তা বোঝালেন তিনিই একদেহে অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ রূপে। নবরূপে নবদ্বীপচন্দ্র—চন্দ্রামণি-হৃদয়চন্দ্র, রামকৃষ্ণ।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ; তোমাদের পক্ষে তা নয়; তোমাদের পক্ষে চৈতন্যদেব যা বলেছিলেন—জীবে দয়া,ভক্ত সেবা আর নাম-সংকীর্তন।"—

(কথামৃত-পঞ্চম-ষোড়শ অধ্যায়)

"যিনি পাপ হরণ করেন, তিনিই হরি। হরিত্রিতাপ হরণ করেন। আর চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন।—অতএব ভাল। দেখো চৈতন্যদেব কতবড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন, এ অবশ্য ভাল"— (কথামৃত, চতুর্থ—উনবিংশ অধ্যায়)

'জাতিভেদ? এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। গৌর নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুধু পবিত্র হয়।"—(কথামৃত, পঞ্চম খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়)

"নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্য দেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্নিসের উপরে বীজ রেখে গিয়েছিলেন অনেক দিন পরে বাড়ী ভুমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হল ও তার ফলও হল।" —(কথামৃত প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়)

"ভেক দেখলে সত্যবস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন। —(কথামৃত চতুর্থ—৩)

"যেখানে দুষ্ট লোক, সেখানে দূরে থেকে প্রণাম করবে। কি চৈতন্যদেব? তিনিও 'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সম্বরণ।' শ্রীবাসের বাড়িতে তাঁর শাশুড়ীকে চুল ধরে বার করা হয়েছিল।"—(কথামৃত দ্বিতীয় সপ্তদশ)

"হেঁজি পেঁজি লোক লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না চাপরাশ থাকলে তবে লোকে মানবে ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না। যে লোক শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই।... চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি রয়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই' তার লেকচারে কি উপকার হবে?" —(কথামৃত, প্রথম, ১১শ)

লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে উচ্চারিত উক্তিগুলি প্রতি ধ্যান করলে বোঝা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে কোন নতুন ধর্মমতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন নি। প্রকৃত শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর অন্তরের শিক্ষককে জাগ্রত করে তাকে দিয়েই সব করিয়ে নেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদ্রূপ ভক্তের অন্তরে সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করার জন্য আপন ভাবময় তত্ত্ব দর্শনের সারবস্তু লোককল্যাণে জীবের সম্মুখে উত্থাপন করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যের অবতার তত্ত্ব কলিহত জীবের মনে নতুন প্রেম গঙ্গার তরঙ্গ তুলুক—এটাই ছিল তাঁর কামনা। প্রাকৃত মানবের ন্যায় অপরের ভাবকে খাটো করে নিজের ভাবপ্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াস শ্রীরামকৃষ্ণ অমৃত বচনে কদাচ শ্রুত হয় না। গৌর

বেশে হরি এসেছিলেন রামকৃষ্ণ বেশে সেই, সেই গৌরাঙ্গ সুন্দরই আপন লীলার মাহাত্ম্য জীবের কল্যাণে প্রচারের প্রয়াসী। ঈশ্বর সকল বিধি ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে। নররূপী নারায়ণ জীব-ব্রহ্মে আপন অমৃতময়তা আবিষ্কার করেছেন। ইহাও শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন।

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাও যায়। শ্রীশ্রী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চতম আধ্যাত্মিক জীবনে অতীন্দ্রিয় জগতের সকল কিছুই প্রত্যক্ষ দর্শন হত, যা সাধারণ জীবের জীবনে ঘটে না। প্রসঙ্গ পেলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে নিজের দিব্য অনুভূতি তথা দর্শনের কথা বলতেন :— মাতৃকরুণায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মানস-গঙ্গা কখনও নিত্যে কখনও বা লীলার হত প্রবাহিত। লীলায় যখন তাঁর মন আসত নেমে তখন রাধা ভাবে তন্ময় হয়ে দেখতেন রাধাকৃষ্ণ। কখনও গৌরাঙ্গ চিন্তায় লীলাময় হরি দর্শন করতেন শ্রী গৌরাঙ্গ রূপ।

কুরুক্ষেত্র মহা সমরাঙ্গনে ধর্ম স্থাপনার্থে যুদ্ধের জন্য অর্জুনের রথাশ্বের বল্গা ধরেছিলেন কৃষ্ণ। ইহা তথ্য। কিন্তু তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ঐ কৃষ্ণ জীবের পরম লভ্য পরমাত্মা। তিনি অর্জুন নামক জড়তাগ্রস্ত ক্লীবত্ব প্রাপ্ত জীবের অঙ্গে করেছেন চৈতন্যের কশাঘাত। জাগ্রত চেতনার জীব-দেহ ধারী ভগবানের অচ্ছেদ্য অঙ্গ-ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবৎ শরীরে দেখেছেন বিশ্বরূপ। তথ্যের নিছক বর্ণনার বর্ণাঢ্য আলিম্পনে দেখা যায় বস্তু জগতের মায়িক রূপ। ভাগবতী তনুধৃত রামকৃষ্ণের তত্ত্বদৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন আপন পূর্ব অবতারলীলা দর্শন মাত্র। চৈতন্য চিন্তায় তন্ময় হন ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ রামকৃষ্ণ। দেখা যায় :—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে— 'হা কৃষ্ণচৈতন্য!' "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ ; হরেকৃষ্ণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ।" আবার ভাবমুখে উচ্চারিত হয় মহতী বানী, "অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ। অদ্বৈত জ্ঞান হ'লে চৈতন্য হয়,—তবেই নিত্যানন্দ হয়।" (কথামৃত চতুর্থ—অষ্টম, ১ম পরিচ্ছেদ) সেই লীলাময় হরি, নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ সমক্ষে উচ্চারণ করলেন শেষ কথা—

"আমি অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ' একধারে তিন।"

এই স্বীকৃতি এবং ঘোষিত মহাবাক্যের উদ্ধৃতির পর শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টিতে গৌরাঙ্গ তত্ত্ব আলোচনার দুর্বলতা প্রকাশের আর প্রয়োজন থাকে না। □

উদ্ধৃতি অংশ উদ্ধৃত হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি থেকে—

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম কথিত
২. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ
৩. শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে শ্রীচৈতন্য কথা—নির্মল কুমার রায়
৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য

পরিমল কান্তি দাস

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বর্তমান কালে যতটুকু মূল্যায়ন হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে তিনি একজন অসামান্য প্রতিভা সম্পন্ন মননশীল সন্ন্যাসী। তুলনামূলক ভাবে একথা বলা যায়, যে, তাঁর মধ্যে শঙ্করের ধী এবং বুদ্ধের হৃদয়ের সমন্বয় ঘটেছিল। এহেন বিবেকানন্দ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে প্রাচ্যের বেদান্ত বাণী পাশ্চাত্যে প্রচার করতে গিয়েছিলেন। জয় করেছিলেন চিকাগো ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ আসন। পরবর্তীকালে এই প্রতিভাদীপ্ত সন্ন্যাসী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বহু আলোচনা করেছেন। এ সবের মধ্যে ভারতীয় মহাপুরুষদের দিব্যজীবন প্রসঙ্গেও তিনি বক্তব্য রেখেছেন। দেখিয়েছেন, তাঁদের আবির্ভাবের তাৎপর্য এবং যুগোপযোগী তাঁদের মতবাদের বিশিষ্টতা। এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু হল বিবেকানন্দের মননে-চিন্তনে শ্রীচৈতন্যদেব কিভাবে উদ্ভাসিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাবে যখন সনাতন হিন্দু ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত, সেই সময় এলেন অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর। সনাতন হিন্দু ধর্মকে তিনি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। শঙ্করের প্রবর্তিত ধর্মের মধ্যে আচার অনুষ্ঠানই প্রধান এবং তা জাতিগত ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। সেজন্য সর্বসাধারণ তা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। শঙ্করের আবির্ভাবের কয়েক'শ বছর পরে এলেন রামানুজ। নূতন করে প্রচার করলেন লুপ্ত প্রায় বৈষ্ণব ধর্মকে, ভক্তি সাধনকে। পরবর্তী বেশ কিছুকাল এই সাধনা ভারতভূমিকে অভিসিঞ্চিত করলো। তারপর ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল এই উপাসনা। পরিবর্তন এলো সমাজে। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্বে বংগদেশে তন্ত্র সাধনাই প্রচলিত ছিল। নবদ্বীপে তখন একটি ছোট গোষ্ঠী বৈষ্ণব ধর্মের একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল মাত্র। এই সময় সমাজে স্বকপোল-কল্পিত মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, বিষহরি ইত্যাদির পূজাই প্রচলিত ছিল। পাষণ্ডেরা সৎলোকের ঈশ্বর আরাধনায় বিঘ্ন ঘটাতো। ব্যাভিচারী শাক্তদের অত্যাচারের হাত হতে জনগণকে রক্ষার জন্য আচার্য রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়মাকারে প্রবর্তনের জন্য চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন, এগুলি যথাক্রমে শ্রী, রুদ্র, চতুর্মুখ ও চতুঃসন। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় শুদ্ধাচার, অহিংসা, ভক্তি ও সাত্বিকভাব বজায় রেখে চলতো। এই সম্প্রদায় ধর্মের মধ্য দিয়ে প্রথমতঃ ভক্তি ও প্রেম ধর্মের উদয় হয়। মাধবেন্দ্র পুরী, যামুনাচার্য প্রভৃতি সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণ পরম ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁদের জীবনের প্রেমভক্তির ধারা প্রবাহিত হয়ে শ্রীবাস, অদ্বৈত ও হরিদাসকে অভিসিঞ্চিত করে সাগর সদৃশ শ্রীচৈতন্যের হৃদয় পরিপ্লাবিত করে পরবর্তীকালে মহাপ্লাবনের রূপ নেয়।

স্বামীজী যুক্তিবাদী মানুষ। সহজে সব কিছু গ্রহণ করেন না। সুনির্দিষ্ট যুক্তি বা অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানকেই তিনি স্বীকার করেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করেছেন কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সহজে গ্রহণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে এক সময় তিনি ঠাকুরের সঙ্গে তর্কও করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বৃন্দাবনের কথা তুলে ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার সেই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।[১]

অনুরূপভাবেই স্বামীজী শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্বকে সহজে গ্রহণ করেন নি। স্বীকার করেন নি তাঁর সংকীর্তন ও নাচানাচিকে। এর প্রধান কারণ, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধনার স্তিমিত ভাব। তাঁর মতে, শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামীরা কেবল তাঁর (মহাপ্রভুর) নাচ ও সংকীর্তন গ্রহণ করে নরম হয়ে গেছে। কীর্তনের জোরে ভগবানে তন্ময়তা আসে, চোখে জলও আসে কিন্তু কীর্তনান্তে সেই ভাব সহজেই নেমে যায়। ভাবটিকে ধরে রাখা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের ত্যাগটাকে ভক্তেরা গ্রহণ না করে প্রেমটাকে গ্রহণ করেছেন বলেই এই দশা। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম সাধারণ মানুষের বোধের বাহিরে। কারণ, সে প্রেম মানবিক প্রেম নয়—ঐশ্বরিক প্রেম।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে দেশে ধর্মের নামে অনাচার চলছিল। বৌদ্ধধর্মের অবসান হলেও বিকৃত বামাচার সাধনা তখনও দেশে প্রবল। এই বিকৃত ভোগবাসনা ও ধর্মাচার থেকে দেশকে রক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও প্রেমধর্মের প্রচার। তাঁর মতে সচ্চিদানন্দ মন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই জগতে একমাত্র পুরুষ বাকী জগতের যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ, জীবকুল প্রত্যেকেই তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশ বিশেষ। সে কারণে তারা সকলেই স্ত্রী। যদি জীব শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে তাঁকে (সেই পরমাত্মাকে) পতিরূপে সর্বান্তঃকরণে ভজনা করেন তবে তাঁর কৃপায় মুক্তি ও নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যায়। এটাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মধুর ভাব, সাধনার মূল কথা। মহাভাব সর্বভাবের একত্র সমাবেশ।

অবশেষে অবতারতত্ত্বের আলোচনায় স্বামীজী শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতার পুরুষ হিসাবে স্বীকার করে বলেছেন, 'নদীয়ার অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাভাবের যেমন বিকাশ হইয়াছিল, তেমনটি আর কখনও হয় নাই।'[২] অবতার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার, কারণ ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল।'[৩] স্বামীজীর উক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যে তিনি হৃদয়বত্তাকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছেন। মানুষের সদ্‌গুণ গুলির মধ্যে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হলেও তাঁর ধারনা হৃদয়বত্তা বুদ্ধির উপর। স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে হৃদয় প্রসঙ্গে যদিও তিনি বুদ্ধকে উল্লেখ করেছেন তথাপি তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের মহান হৃদয়ের কথা ভোলেন নি।

স্বামীজীর ধারণা ছিল যে যে কোন মানব হিতৈষীমূলক কাজ করতে হলে মহান হৃদয়ের প্রয়োজন। মনের উদারতা ও হৃদয়ের প্রসারতা ভিন্ন নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ না করলে যথার্থ কল্যাণমূলক কাজ করা যায় না।

স্বামীজী দক্ষিণদেশের সংস্কারকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁরা যে পথিকৃৎ একথা তিনি উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, 'তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। তাঁহাদের বিশাল হৃদয়, তাঁহাদের স্বদেশ প্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচারিত জনগণের প্রতি ভালবাসার জন্য আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসি।......ভারতে কি কখনও সংস্কারের অভাব হইয়াছিল? তোমরা তো ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর? নানক? চৈতন্য? কবীর দাদু? এই যে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ ভারত-গগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন?'[৪] মানবতাবোধ সম্পর্কে তিনি তাঁদের জীবন আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, নীচ জাতির জন্য তাঁদের মন কেঁদেছিল। সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয়তা আনবার চেষ্টা করেছিলেন।

রামানুজের কথা উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন, তিনি আচণ্ডালে উপাসনার পথ খুলে দিয়েছিলেন। এই পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে চিহ্নিত করে বলেছেন, 'আর্যাবর্তে ঐ তরঙ্গের আঘাত লাগিল। সেখানে কয়েকজন আচার্য ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার বহুদিন পরে মুসলমান শাসনকালে ঘটিয়াছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর্যাবর্তবাসী আচার্যগণের মধ্যে চৈতন্যই শ্রেষ্ঠ।'[৫]

বর্তমান ভারতের সম্প্রদায়কে স্বামীজী মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। দ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে অন্যান্য সম্প্রদায় এই দুইয়েরই অংশভুত। রামানুজের দ্বৈতবাদ এবং ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। এইসব সমন্বয়তা লক্ষ্য করে তিনি শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে বলেছেন, 'অন্যান্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আচার্যপ্রবর মাধবমুনি এবং তাঁর অনুবর্তী আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব মধ্বের মতই বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন।'[৬]

'সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্তীগণও যে মহাত্মা মধ্বের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই মহান দাক্ষিণাত্য।[৭] আবার দেখা যায় শ্রীচৈতন্যদেব যে নৃত্য-কীর্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেছিলেন তার আদিস্থান দাক্ষিণাত্য।'[৮]

দাক্ষিণাত্যবাসীদের কাছে আর্যাবর্তবাসী বিশেষভাবে ঋণী। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী উদারকণ্ঠে সেই কথা স্বীকার করে বলছেন, 'শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ইঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছিলেন। যে মহাত্মা শঙ্করের নিকট জগতের প্রত্যেকটি অদ্বৈতবাদীই ঋণী, যে মহাত্মা রামানুজের স্বর্গীয় স্পর্শে পদদলিত পারিয়াগণকেও আলওয়ারে পরিণত করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্যাবর্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ।'

শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রেমাবতার বলা হয়। বাস্তবিক তাঁর মধ্যে যে প্রেমের স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল, এরূপ আর কোন কালে কারও হয়েছিল বলে জানা যায় না। অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ এবং বাহিরে শ্রীরাধার বিরহ এ এক অত্যাশ্চর্য লীলা। এই প্রসঙ্গে ভাবতন্ময় হয়ে স্বামীজী একদিন আলোচনা করেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমাস্পদ শ্রীরাধিকার মিলনের মুহূর্তটি রায় রামানন্দ সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সেদিনের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী ঐটির উদ্ধৃতি দেন,

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢল অবধি না গেল॥
ন সো রমন না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি॥

স্বামীজী বলছেন, 'কাম থাকতে প্রেম হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব মহাত্যাগী পুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না।'[৯] অর্থাৎ স্বামীজীর দৃষ্টিতে ত্যাগই প্রধান। আসক্তিহীন হলে তবে নিঃস্বার্থভাবে মানব কল্যাণের কাজ করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের ত্যাগের দিকটা আমাদের প্রথমে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে তাঁর আচণ্ডালে সহানভুতির ভাব। তাঁর মধ্যে যে প্রেমের প্রকাশ তা হল রাধা প্রেম। সেটা সাধারণ লোক গ্রহণ করতে পারে না। মহাত্যাগী পুরুষরাই তা অনুধাবণ করতে পারেন। ভক্তিবাদের অন্যতম অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ভারতে এতই বিস্তৃত যে এখনও সেই ভাব পরিলক্ষিত। হয়। যদিও আজ সেই দল বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত তবুও মূল সূত্রটি এখনও অনুরণিত হচ্ছে। স্বামীজী তাঁর পরিব্রাজক জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেজন্য তিনি বলছেন, 'সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানেই ভক্তিমার্গ পরিজ্ঞাত, সেখানেই লোকে তাঁহার বিষয়ে সাদরে চর্চা করেও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সংশোধিত শাখা মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ

জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিভাবে সমগ্র ভারতে সক্রিয়। কি করিয়াই বা জানিবেন? শিষ্যগণ গদিয়ান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন, আচণ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে তাহারা ভগবানকে ভালবাসে।'[১০]

কোন এক সময় স্বামীজী গুরুভাইদের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থকে ব্যঙ্গ করে পড়তে দেখে বলেছিলেন, এই রকম করে ভাল জিনিষটা মাটি করে? আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন।'[১১]

বিধর্মীদের স্বধর্মে আনয়নের ব্যাপারে স্বামীজীর মত হচ্ছে যে যারা অন্যধর্ম হতে হিন্দুধর্মে আসতে চান তাদের সকলকেই গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সমাজের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'স্মরণ রাখিবেন, বৈষ্ণব সমাজে ইতিপূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি হইতে যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল, আর সে জাতি বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভদ্র জাতি। রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকল বড় বড় বৈষ্ণব আচার্যই ইহা করিয়াছেন।'[১২]

অবতার পুরুষের অন্তরঙ্গতা প্রসঙ্গে স্বামীজী অনেক কথা বলেছেন। বলেছেন, 'তাঁরা চিহ্নিত পুরুষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তিনি শুনেছিলেন, অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহ ধারণ করে জগতে আগমণ করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান কার্য করেন বা জগতে ধর্মপ্রচার করেন।...শঙ্কর রামানুজ শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরু পরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করে আসছেন।'[১৩]

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিবাদের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ছিলেন দ্বৈতবাদী। তবে তাঁর অদ্বৈত জ্ঞানও ছিল। একথা জানা যায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। পুরীতে সার্বভৌমের ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি একথা উল্লেখ করেছেন। সেই কারণে এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন, 'চৈতন্যদেব পুরীতে সার্বভৌমকে বলেছিলেন যে ব্যাসসূত্র আমি বুঝি, তাহা দ্বৈতবাদ, কিন্তু ভাষ্যকার অদ্বৈত করিতেছেন'...।[১৪]

স্বামীজী তাঁর পরিব্রাজক জীবনে এইটুকুই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের প্রকৃতরূপ ও তার অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা জানবার জন্যে ঘরে ঘরে যেতে হবে, জানতে হবে তাদের অবস্থা। প্রকৃত মানবদরদী পুরুষ জানবে তার রূপ এবং চেষ্টা করবে সমস্যাগুলি সমাধান করতে। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ভারত পরিক্রমা সম্পর্কে বলছেন,—"তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন, আচণ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে তাহারা ভগবানকে ভালবাসে।'[১৫] শ্রীচৈতন্যদেবের এই পরিব্রাজক জীবনকে স্বামীজী মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন এবং বুঝেছেন তিনি সত্যই মানব প্রেমিক। মানবের কল্যাণের জন্য, নীচ জাতির উদ্ধারের জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে আহ্বান জানিয়েছেন। আলিঙ্গন দিয়েছেন আচণ্ডালে। কি তার প্রেম, কি তার ভালবাসা। একবার যিনি তাঁর উদাত্ত আহ্বান শুনেছেন, তিনিই ধন্য হয়েছেন।

অবতার বা আচার্যেরা যুগোপযোগী এক একটি মত অনুসরণ করে ঈশ্বরলাভে আত্মনিয়োগের জন্য ভক্তদের উপদেশ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যতমত ততপথ এই সমন্বয় বাণীর পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতার পুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে তাদের জীবৎকালে ঐরূপ 'দলফল' সচরাচর হয় না।'[১৬] তবে শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে দল প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলছেন, 'হ্যাঁ এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখনা, চৈতন্যদেবের এখন দু-তিনশ সম্প্রদায় হয়েছে, যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে। কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায় চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে।'[১৭] স্বামীজীর মতে কালে দল হবেই তবে তার মূল ঐক্যটি থাকবে সেই মহামানবের আদর্শের মধ্যে, তাঁর প্রচারিত মতের মধ্যে।

শ্রীচৈতন্যদেব বা রামানুজ প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ছুৎমার্গ পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয়েছে তা কেবলই বিকৃতভাবেই হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ এবং অন্যান্য খাদ্য বর্জন সম্পর্কে যে নীতি বর্তমানে চালু আছে তা সঠিক নয়। আচার্য রামানুজ খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে যে নিয়ম নিষ্ঠা করেছিলেন তা প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা—

১। জাতিদোষ অর্থাৎ উত্তেজক খাদ্য বর্জন।

২। আশ্রয় দোষ অর্থাৎ দুষ্ট লোকের অন্ন বর্জনীয় এবং

৩। নিমিত্ত দোষ অর্থাৎ ময়লা পচা খাদ্য বর্জনীয়।

এগুলি কিন্তু পরবর্তীকালে বিকৃত হয়েছে, ছুৎমার্গ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর উক্তি, 'খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ক্ষেত্রে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়।'[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতাররূপে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর অশেষ গুণাবলীর প্রশংসাও করেছেন। নবদ্বীপ 'ন্যায়' শাস্ত্রের পীঠস্থান। ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করতে আসতেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কালে বা তার পূর্বে বঙ্গদেশে বেদ চর্চা বিশেষ হোত না। সেই সময় এখানে কোন পতঞ্জলির ভাষ্য পড়াবার লোক ছিল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব মেধার কথা স্মরণ করে স্বামীজী বলছেন, 'একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল; কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।'[১৯]

সময়োপযোগী সেইকালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল, একথা স্বামীজী বুঝেছিলেন। সেই সময় মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম এবং আচণ্ডালে তা বিতরণ ছিল প্রয়োজন সঙ্গত নতুবা সনাতন হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম প্রাধান্য লাভ করত। স্বামীজী শ্রীচৈতন্যের ভাবকে প্রথমে যে ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর সে ধারণার পরিবর্তন হয়। ফলে বৈষ্ণব সম্প্রাদায়ের নাম সংকীর্তনকে তিনি গ্রহণ না করলেও শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব প্রেমের স্ফুরণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আরও অভিভুত হয়েছিলেন মহাপ্রভুর পরিব্রাজক জীবন এবং তাঁর আচণ্ডালে সহানুভূতির ভাবকে লক্ষ্য করে।

সেই সময় সমাজে ছিল ঘোর শাক্ত প্রভাব, ছিলনা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ অভিব্যক্তি। ভক্তিবাদ ছাড়া অবতারের আবির্ভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং ভক্তি সাধনার পুনরুত্থান এই কালে বিশেষ 'তাৎপর্যপূর্ণ' ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনকালে স্বামীজী এসেছিলেন বলে তাঁর মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃত প্রেম কি? শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভক্ত ও সন্ন্যাসী সন্তানদের শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব ও আবির্ভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও তাঁর অদৃষ্ট পূর্ব সাধন ইতিহাস বর্তমান যুগে আমাদের ঐ চরম তত্ত্ব বিশদ ভাবে শিক্ষা দেয়। সাধক জীবনের প্রথম দিকে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে ঠাকুরের বিরূপ ধারণাই ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল তিনি মহাপ্রভুকে অবতার রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সত্ত্বা দেখেছেন, গৌর-নিতাই তাঁর দেহ হতে নির্গত হয়ে আবার দেহেই লীন হলেন। ভাবাবেশে লক্ষ্য করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন, কলুটোলা চৈতন্য সভায় ভাগবত পাঠ শুনে শ্রীচৈতন্য ভাবে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। আবার গৃহী-ভক্ত নবগোপাল ঘোষকে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে দর্শন দিয়ে কৃপা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ভাবে অনুভব করেছেন শ্রীচৈতন্য সত্ত্বাকে। তাঁর অনুভূতি লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা তিনি পরবর্তীকালে ভক্ত ও সন্ন্যাসী সন্তানদের কাছে বলেছেন।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি লব্ধ ঘটনাকে স্বামীজী সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং দেখেছেন ঠাকুরের মধ্যে সেই প্রেমের স্ফুরণ, আর্তদের কৃপাদান এবং মানুষের কল্যানের জন্য বিভিন্ন স্থানে

গমন। অজ্ঞানী মানুষদের জন্য, আর্ত জীবের নিমিত্ত কতটা প্রেম, কতটা ভালবাসা, কতটা হৃদয়বত্তা থাকলে তবে এই আচরণ সম্ভব! সেই কারণেই অবতার বরিষ্ঠ সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই স্বামীজী খুঁজে পেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবকে, বিশ্বাস করেছিলেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্যকে। ☐

উৎস নির্দেশ :

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড) স্বামী সারদানন্দ, ১০ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলি-৩, পৃঃ ২৭৩-৭৪
২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৪র্থ খণ্ড) ১ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয় পৃ-৩৩৯
৩. ঐ (৭ম খণ্ড) ঐ ঐ পৃ-৩৪৩
৪. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৫ম খণ্ড), ১ম সংস্করণ উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ১১৮
৫. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃ. ১৬০
৬. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃ. ২২১
৭. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৫ম খণ্ড) ১ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৪৪৭
৮. তদেব (৭ম খণ্ড) ... ... পৃ. ৯০-৯১
৯. তদেব (৯ম খণ্ড) ... ... পৃ. ৪২৮
১০. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃ. ৪৫১
১১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীম কথিত, ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট। বরাহনগর মঠ/১ম পরিচ্ছেদ : পৃ. ২৫৮
১২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড) ১ম সংস্করণ উদ্বোধন কার্যালয় পৃ. ৪৮৫
১৩. তদেব (৯ম খণ্ড) ... ... পৃ. ২৫১
১৪. তদেব (৬ষ্ঠ খণ্ড) ... ... পৃ. ২৯২
১৫. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃ. ৪৫১
১৬. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড) ১ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয় পৃ. ১১১
১৭. তদেব (৯ম খণ্ড) ... ... পৃ. ১১২
১৮. তদেব (৬ষ্ঠ খণ্ড) ... ... পৃ. ১৭৩
১৯. তদেব (৫ম খণ্ড) ... ... পৃ. ৪৫১

শ্রীচৈতন্য ঃ মুসলমান ভক্তদের দৃষ্টিতে

সাহাজাদা শেখ

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর আবির্ভাবের ফলে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু মুসলমান সাধু—সন্তদের উদার মিলনের বাণীর দ্বারা সে যুগে যে সমন্বয়ধর্মী মিলনের মতবাদ গড়ে উঠেছিল শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন তাঁর একজন সার্থক রূপকার। তাঁর উদার মতবাদের দ্বারা সে সময়ের সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে অনেক ভারতবাসী তাঁর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এই সকল ভক্তদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষকেও দেখা যায়।

দিল্লী সুলতানী ছিল কট্টর গোঁড়া মোল্লাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। আলাউদ্দিন খলজী ও মহম্মদ-বিণ-তুঘলক ছাড়া বিশেষ কেহ পক্ষপাত শূন্য অসাম্প্রদায়িক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে সক্ষম হন নি। এইরূপ রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন তখন দিল্লীতে লোদী বংশের সুলতানেরা রাজত্ব করতেন। তাঁর জীবনকালের মধ্যে দিল্লীতে পাঁচজন সুলতান রাজত্ব করেছিলেন। এদের মধ্যে তিন জন হলেন লোদী বংশের এবং দু' জন মোগল (বহলুন, সিকন্দর ও ইব্রাহিম লোদী এবং বাবর ও হুমায়ুন)। মহাপ্রভুর জন্মকালে বাংলার সুলতান ছিলেন জালালউদ্দিন ফতে শাহ। মহাপ্রভুর জীবনকালের বেশির ভাগ সময়েই দিল্লীতে সিকন্দর লোদী (১৪৮৮-১৫১৭) রাজত্ব করেছিলেন। সিকন্দর লোদীর রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য না হলেও তিনি হিন্দু প্রজাদের উপর সুবিচার করেন নি। এইরূপ রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই মহাপ্রভু তাঁর মতামত প্রচার করেছিলেন।

কিন্তু সুলতানী যুগের আর একটা দিক দেখলে দেখা যাবে যে হিন্দু মুসলমান ধর্ম সমন্বয়ের বাণী মুসলমান ফকিরদের সহজধর্মী সুফীবাদে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সকল সুফী সাধকদের মধ্যে খাজা মইনউদ্দিন চিশ্‌তি ও নিজামউদ্দিন আউলিয়ার নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সুফীবাদে মানুষের স্থান অনেক উর্ধে এবং সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। তাই সুলতানী যুগে হিন্দু মুসলমান মিলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল সমাজ জীবনে। কবীর শিষ্য পরম সাধক দাদু তাই বলেছিলেন ঃ

"সব ঘট একৈ আত্মা,
ক্যা হিন্দু-মুসলমান।"

এই সমন্বয়ধর্মী সাধনার একজন সার্থক রূপকার হলেন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি

১৩০৭ শকে (১৩৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারীর) সন্ধ্যা ৬।৭ ঘটিকায় ফাল্গুণী পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণের দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃত সুপণ্ডিত পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ১৮ বৎসর নীলাচলে (উড়িষ্যায়) বাস করেছিলেন। পরে ৬ বৎসর দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়সে (১৫৩৩ খৃঃ) আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিনে তাঁর অপূর্ব লীলা শেষ হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর এই স্বল্পকালীন জীবন এদেশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য—এক কথায় সমস্ত ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করে "চন্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠাঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ" উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। ইতর জাতির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করলে সামাজিক খর্বতা হয়, কিন্তু হরিভক্তির হানি হয় না—এ কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। "মুচি যদি ভক্তি সহ ডাকে কৃষ্ণধনে, কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে॥' (গোবিন্দের কড়চা)—এ তাঁর উক্তি।

ভারতীয় সমাজের সমন্বয়-ধর্মী সাধনার মহাসাধক শ্রীচৈতন্যদেবের এই উদার বাণী সকল গণ্ডীর সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতব্যাপী ব্যাপ্ত হয়েছিল। তৎকালীন মধ্যযুগীয় ভারতীয় মুসলমান সমাজও তাঁহার ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই মুসলমান ভক্তদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঠাকুর হরিদাসের নাম স্মরণীয়। বর্তমান ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত বুরন গ্রাম নিবাসী প্রায় বৃদ্ধ মুসলমান হরিদাস শ্রীচৈতন্যের প্রাণপ্রিয় হয়েছিলেন। তৎকালীন মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু এই ঠাকুর হরিদাসকে মহাপ্রভুর প্রতি যে অকৃত্রিম ভক্তি ছিল তার ভিত্তি একটুও নড়াতে পারে নি। মহাপ্রভুর প্রতি হরিদাসের ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায় মহাপ্রভুর নীলাচল গমন কালে, ঃ

"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম না পাইলে তোমার দরশন।
কিমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥" (চৈ· চ·, ৩য় প· মধ্য)

মহাপ্রভু ভক্তের দুঃখে দুঃখী হয়ে বলেছিলেন ঃ

"প্রভু কহে—কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥" (চৈ· চ·, ৩য় প· মধ্য)

এরপর মহাপ্রভু নীলাচলে চলে যান এবং হরিদাস নীলাচলে পরে গমন করলে মহাপ্রভু হরিদাসকে নিজের বক্ষে আবদ্ধ করলেন কিছুক্ষণের জন্য। হরিদাস অত্যন্ত লজ্জিত হলে মহাপ্রভু বললেন ঃ

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে তুমি যজ্ঞ-তপ-দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥" (চৈ· চ· ১১শ প· মধ্য)

এ থেকে বোঝা যায় মহাপ্রভুর উপর এই প্রায় বৃদ্ধ মুসলমানের কি প্রগাঢ় ভক্তি।

গয়া থেকে ফিরে আসবার পর শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত ও পূজারী ব্রাহ্মণের একটি বড় অংশ তা বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁরা জগাই-মাধাই নামক দুইজন মদ্যপ গুণ্ডাকে মহাপ্রভুর পিছনে লাগালেন এবং নবদ্বীপের কতকটা প্রশাসক স্থানীয় কাজীর নিকট নালিশ জানালেন যে তাদের ধর্ম পূজা-আচার সমস্তই সর্বনাশ হল শ্রীচৈতন্যের জন্য। কিন্তু জগাই-মাধাই সহজেই পরিবর্তিত হল। তখন মহাপ্রভু

এক বিরাট কীর্তনের দল নিয়ে কাজীর বাড়ী চললেন। কাজী সমস্তই বুঝতে পেরে শ্রীচৈতন্যদেবকে গ্রাম সম্পর্কীয় ভাগিনেয় সম্বোধন করে কথা দিলেন যে তিনি সংকীর্তন ও ভক্তিধর্মের বিরোধিতা করবেন না। তিনি নিজে চৈতন্য ভক্তে পরিণত হলেন এবং চৈতন্যদেব তখন হয়ে উঠলেন তাঁর আরাধ্য দেবতা। চাঁদকাজী সম্পাদিত দুই একটি পদ থেকে আমরা এর পরিচয় পাই :

"চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥"

বা

"ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
বিরহিনী নারী আমি হে সাঁতার নাহি জানি॥"

(বৈষ্ণব পদাবলী : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)

শ্রীচৈতন্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কালিঞ্জর দুর্গের অধিকারী বিহারী খাঁ-এর পুত্র বিজুলী খাঁ অনেক পাঠান অনুচর সহ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ জ্ঞানে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাঠান মুসলমান নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী মহাপ্রভুর ভাবধারার কথা কতটুকু অবগত ছিলেন তা জানা নাই ; কিন্তু বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৯) মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। দীক্ষার পর মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলী নগরে উপস্থিত হন। হোসেন শাহ মহাপ্রভুর আগমনবার্তা কেশর খাঁর কাছ থেকে পান। শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম প্রচার করতেন না, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক ভাব ও শক্তি অনেক উপর তলার মানুষকেও সর্বত্যাগী বৈষ্ণবে পরিণত করিতে সক্ষম হত। একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এইরূপ অপূর্ব আকর্ষণ শক্তির পরিচয় পেয়ে সুলতান হোসেন শাহ মুগ্ধ হলেন এবং তিনি কেশর খাঁকে বললেন :

"গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিত লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এতলোক যার পাছে ধায়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহ ইহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ইহার মন॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যখণ্ড)

সুলতান হোসেন শাহ একজন কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়ে মহাপ্রভুর অনুরাগী হন এবং বাংলা দেশে কৃষ্ণনামে যাতে কেহ বাধা দিতে না পারে তার ব্যবস্থা কর দেন।

"সর্বলোকে লই সুখে করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন॥
কাজী বা কোটাল তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥"

—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়—বৃন্দাবনদাস

হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অনেকদিন যুদ্ধ চলেছিল। নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্যদেবের কোনরূপ যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য মহাপ্রভু-ভক্ত হোসেন শাহ সৈন্যবাহিনীর নিকট নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের অব্যাহিত পরবর্তী ও পরবর্তী যুগে অনেক মুসলমান কবি তাঁর সমন্বয়ধর্মী

ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এ'দের মধ্যে আকবর, সৈয়দ মরতুজা, সৈয়দ আলাওল ও নাসির মামুদ এবং বর্তমান শতাব্দীর নজরুল ইসলাম প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে নাসির মামুদের একটি পদের উল্লেখ করলাম ;

"নাসির মামুদ করত আশ—
চরণে শরণ দান রি ॥"

দিল্লীর মোগল সম্রাট আকবর শ্রীচৈতন্যের ঠিক পরবর্তী কালের মানুষ। কিন্তু তিনি তাঁর উদার ধর্মনীতির ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর ভক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ; 'The 16th century was an age of enquiry ard doubt, and Akbar was its most perfect representative. Thc ground had already been prepared him by Kabir, Nanak, chaitanya and other reformers who had inveighted against the tyrauny of caste, emphasised the unily of godhead, and pointed out the utter hollowness of distinctions between man and man., (Muslim Rule in India Iswari Prasad.)

এছাড়া সাহ আকবর নামে একজন মুসলমান পদকর্তার শ্রীচৈতন্যের প্রতি—ঐকান্তিক ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায় :

"ঐ ছন পহুঁকে যাহু বলিহারী।
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী।"

সর্বশেষে বর্তমান শতাব্দীর একজন বলিষ্ঠ মুসলমান কবি কাজী নজরুলের শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তি একটা কবিতার তিনটি লাইন উল্লেখ করলাম :

"বর্নচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায় তোরা দেখবি যদি আয়।
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা কেউ বলে তা'য় শ্যামরায় ॥
সে আপনি কেঁদে হরি প্রেমে ত্রিজগৎ কেঁদে ভাসায় ॥"

মহাপ্রভু সর্বকালের সর্ব যুগের। ধর্ম, জাতি, দেশ ভাষা, সমাজ—সমস্ত প্রকার গণ্ডীর তিনি উর্ধ্বে। তাই তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে এদেশীয় মুসলমান সমাজের কেউ কেউ তাঁর ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে ভগবানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা মহাপ্রভুর চরণ প্রান্তে একটু আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তাই কবির ভাষায় :

"পরমাত্মা নহ তুমি, (তুমি) পরমাত্মীয় মোর।
(হে) বিপুল বিরাট। মোর কাছে তুমি, প্রিয়তম চিতচোর ॥"

—কাজী নজরুল

এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে মহাপ্রভুর প্রতি যে একালের একজন মুসলমান কবির ও অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসা ছিল তাই উল্লেখ করা হল। □

শ্রীচৈতন্য জীবনে দুই নারী

ড. অরুণা চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন সময়ে চৈতন্য জীবনীকার ও চরিতকারেরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ঐশ্বরিক মহিমা, তাঁর প্রেমঘন রূপকে রূপায়িত করেছেন। সেই সব বর্ণনা তাঁর দেবত্বকেই বার বার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু গোরাচাঁদ—তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই শ্রীচৈতন্য। তবে মহাপ্রভুর দেব মহিমাকে অক্ষুন্ন রেখে কোন কোন চরিতকার তাঁর সংসার জীবনের টুকরো টুকরো ছবিও চিত্রিত করেছেন। সেখানে তাঁর মানব মহিমা কিঞ্চিত প্রকাশিত। তাঁর এই সংসার জীবনের একদিকে শচীমাতা আর অপরদিকে দুই পত্নী লক্ষ্মীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। চৈতন্যদেবের সংসার জীবনে গৃহীর অনুশাসন, বোধবুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ সবই আবর্তিত হয়েছে তাঁর দুই পত্নীর প্রতি তাঁর বাহ্যিক ব্যবহারে। তবে মনে হয় গৌরপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া যেমন বহু আলোচিত ঠিক বিপরীত দিকে চৈতন্যদেবের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী কাব্য, সাহিত্য, জীবনী বিশ্লেষণে নিতান্তই উপেক্ষিতা। চৈতন্য জীবনীকারেরা কেউ কেউ শুধুমাত্র লক্ষ্মীদেবীর নাম উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ লক্ষ্মীদেবী সংক্রান্ত কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন।

কথিত আছে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বিবাহ প্রেমজ ; লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎও খুব আকস্মিক ভাবে ঘটেছিল। সুদর্শন বিশ্বম্ভর মিশ্র গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়মিত পাঠশিক্ষা নেন। সঙ্গে শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ফেরেন। এই সময়ে একদিন বল্লভ আচার্যের কন্যা সর্বগুণান্বিত, সুলক্ষণা লক্ষ্মীদেবী সখীপরিবৃতা হয়ে গঙ্গা স্নানে এসেছেন। গৌরচন্দ্রও এসেছেন গঙ্গাস্নানে। তিনি নিজের লক্ষ্মীকে নিজে চিনতে পারলেন। লক্ষ্মীও বন্দনা করলেন মনে মনে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম। লক্ষ্মীদেবী চতুরা। উপস্থিত বুদ্ধি তাঁর প্রখর। জয়ানন্দ তাঁর শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল কাব্যে বলেছেন যে' গৌরচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর সাক্ষাৎ হলে লক্ষ্মীদেবী নিজেকে সোভাগ্যবতী বলে মনে করলেন। কিন্তু কিভাবে সকলের সম্মুখে গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগল অন্তরে ধারণ করবেন। কারণ অন্তরে আছে তাঁর নারীত্বের লজ্জা এবং সমাজে লোক লজ্জা ও ভয়। তাই ছল চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই—

গজমতি হার ছিল গলায় তাহার
ছিঁড়িয়া ফেলিল ভূমে পড়িল অপার ॥
বামকর বক্ষে রাখি সেই মুক্তা তোলে।
কোথা পাব কোথা পাব এই বাক্য বোলে ॥
সকল সঙ্গিনী মুক্তা চাহে হেট মুখে।
গৌরচন্দ্র লক্ষ্মী প্রতি চাহে একদিঠে ॥

এই সুযোগে দুজনে দুজনের নিবেদনে সাড়া দিলেন। গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীদেবীর প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে প্রভুর পদধূলি মাথায় নিলেন। বনমালী আচার্য গৌরচন্দ্রের মনের কথা জানতে পেরেছিলেন। শুভদিনে গোধূলি লগ্নে বনমালীর মধ্যস্থতায় বিশ্বম্ভর মিশ্র—লক্ষ্মীদেবীর বিবাহও সম্পন্ন হল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে লক্ষ্মী দেবীর পিতা বল্লভ আচার্য মাত্র পাঁচটি হরীতকী দিয়ে মেয়েকে মহাপ্রভুর হাতে সমর্পণ করেছিলেন; কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল কাব্যে আছে লক্ষ্মী দেবীর পিতা—

আপন কন্যারে নানা অলঙ্কার দিল।
গন্ধচন্দন মাল্যে সুবেশ রচিল॥

আর সর্ব অঙ্গের এই অলঙ্কারের উজ্জ্বল কিরণে অন্ধকার দূরে গেল। সমস্ত প্রথা, নিয়মরীতি অনুয়ায়ী বিবাহ কার্য শেষ হল, মহাপ্রভু লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন। শচীমাতা নববধূকে বরণ করে ঘরে তুললেন। পুত্র এবং বধূকে আশীর্বাদ করলেন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে—

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল পুত্রবধূ মুখে,
আজি ঘর দ্বার মোর সম্পন্ন হইল। [চৈতন্যমঙ্গল]

লক্ষ্মীদেবী এসে সংসারের হাল ধরলেন। স্বামীর সংসারে অর্থের প্রাচুর্য নেই। নিজের হাতে গৃহ সংসারের সব কাজ করেন। আর এই কাজের মধ্যে আনন্দ মাধুর্যের স্পর্শ পান লক্ষ্মীদেবী—

উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম।
আপনে করেন সব এই তার ধর্ম॥

গৃহ দেবতার নিত্য পূজা অর্চনার আয়োজন করেন, শাশুড়ীর সেবা করেন। তবে এই সব কাজের মধ্যে স্বামীর সেবা করতে তিনি কোনদিন ভোলেন না। স্বামীর সেবায় ব্যাঘাত ঘটবে এই আশংকায় লক্ষ্মীদেবী বিবাহের পর একদিনের জন্য বাপের বাড়ী যান নি, নিজের সুখ চিন্তা তিনি করতে পারেন নি। স্বামীর সব দায়িত্ব নিজেই পালন করতেন। লক্ষ্মীদেবীর কর্মনিপুণতা শচী-দেবীকে মুগ্ধ করে। তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। শচীদেবীর কাছে লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং নারায়ণী, কমলা সদৃশা—

কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র পদতলে।
[শ্রীচৈতন্য ভাগত—বৃন্দাবন দাস]

লক্ষ্মীর চারিত্রিক মাধুর্য বিস্মিত করে, আকৃষ্ট করে গৌরসুন্দরকে। পতিগত প্রাণা, কর্তব্যনিষ্ঠ, সাধ্বী লক্ষ্মীদেবী ভাবেন তাঁর মত সৌভাগ্যবতী নারী ক'জন আছেন? তাঁর চোখে গৌরসুন্দর স্বয়ং নারায়ণ। নবদ্বীপের পুর নারীরা একথাও বলতেন যে লক্ষ্মী দেবী নিশ্চয় অনেক ত্যাগ, তপস্যার দ্বারা নিমাই-এর মত স্বামী পেয়েছেন।

বিবাহের পরেও গৌরাঙ্গের জ্ঞান আহরণ এবং পঠন পাঠন সবই নিয়মিতভাবে এগিয়েছে। স্বামীর বিদ্যারস অর্জন এবং ন্যায় অধ্যয়নে যাতে কোনরকম বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্মীদেবীর যথেষ্ট নজর ছিল। কোনভাবেই সাংসারিক ব্যাপারে তিনি স্বামীকে বিব্রত করেন নি। তবে সাংসারিক জটিলতার মধ্যে গোরাচাঁদ প্রবেশ করেন নি ঠিকই কিন্তু সাংসারিক কোন কোন ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকেন নি। গোরাচাঁদের বিবাহের পরেও শচীমাতা যখন রান্নার দায়িত্ব পুত্রবধূর হাতে ছাড়লেন না, গৌরাঙ্গ একদিন রান্নাঘরে ঢুকে মাকে হেসে বললেন—

বৃদ্ধ শরীর তোমার কত দুঃখ পায়
তোমার বধূ রান্ধেন যদি তুমি অন্ন খায়

*   *   *

আজি হৈতে মাতা তুমি ছাড়হ রন্ধন
লক্ষ্মীর রন্ধনে মাতা করহ ভোজন।
[চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ]

পত্নী ঘরে থাকতে বৃদ্ধা মা রান্না করছেন এই ঘটনা গোরাচাঁদকে বিচলিত করেছিল। তবে লক্ষ্মী-দেবীর জীবনে এই ঘটনা আশীর্বাদ স্বরূপ প্রতিভাত হল। শাশুড়ীকে রান্না করে লক্ষ্মীদেবী খাওয়াবেন এটা লক্ষ্মীদেবীর চরম সৌভাগ্য কিন্তু পরোক্ষভাবে এর দ্বারা স্বামী সেবার সুযোগ পেলেন সেটা জেনে লক্ষ্মীদেবী মনে মনে খুব খুশী হলেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে রান্না ঘরে প্রবেশ করলেন। রান্না করে প্রথমেই খাওয়ালেন হরিদাসকে। হরিদাস প্রভুর সেবক এবং একনিষ্ঠ ভক্ত আর প্রভুর সেবক-কে খাইয়ে লক্ষ্মী দেবী নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিলেন।

একদিকে গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য সম্পাদন অপরদিকে স্বামীর অধ্যয়নে সহায়তা দান—এই উভয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রকে অসামান্যতা দান করেছে। বিদ্যারস অর্জনে শিষ্যদের নিয়ে বৈকুণ্ঠের নায়ক গোরাচাঁদ যখন মত্ত থাকেন তখন তাঁর বাড়ির কথা মনে থাকে না। এক একদিন বেলা দুপ্রহরও চলে যায় তবুও তিনি বাড়ি ফেরেন না। লক্ষ্মীদেবী কিন্তু মহাপ্রভুর এই খেয়ালী আচরণে বিরক্তি প্রকাশ বা স্বামীকে অনুযোগ করেন না ;—

'পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে॥
গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি হরি হরি॥
লক্ষ্মীদেন অন্নখান বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥ [শ্রীচৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস]

বৈকুণ্ঠের পতিকে লক্ষ্মীদেবী অন্ন পরিবেশন করেন আর তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপকে দেখে ভাবেন তাঁর মতো সৌভাগ্যবতী নারী ক'জন আছেন। সার্থক তাঁর ভালবাসা।

একটি অর্বাচীন গ্রন্থ 'পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য'—সেখানে লক্ষ্মীদেবী প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলা হয়েছে। ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈতাচার্য এবং অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভু ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ 'কৃষ্ণলীলা' শ্রবণে ও আলোচনায় মত্ত। দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাড়িতে গৌরপ্রিয়া লক্ষ্মী ও শচীমাতা অভুক্ত। মহাপ্রভু কুণ্ঠিত হয়ে বাড়িতে ফিরে লক্ষ্মীদেবীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন—

অভুক্ত রাখিয়া সবে সারাদিন
অন্যায় হয়েছে মোর, কহি আমি ঠিক।

লক্ষ্মীদেবী মহাপ্রভুর এই ব্যবহারে লজ্জিত হলেন। তাঁর দেবতুল্য স্বামী তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন—লক্ষ্মীদেবী মনে মনে শঙ্কিত হয়ে বললেন—

কহিলেন লক্ষ্মীদেবী শশব্যস্ত হয়ে
আর্যদের একথা বলিও না মোরে॥
তুমি যদি ক্ষমাভিক্ষা চাও মোর কাছে।
নরকেও স্থান মোর না হবে, না হবে॥

গৌরাঙ্গ যখন চিন্তায় আত্মমগ্ন থাকতেন, লক্ষ্মীদেবী মৃদু হেসে স্বামীকে বলতেন—

কি ভাবিছ দেব এত আনমনা হয়ে ?
সকল সময় ভাবেন আপনি ন্যায়শাস্ত্র কথা।

মনের মাঝারে স্থান, পাইনা আমরা
প্রেমময় দৃষ্টিতে লক্ষ্মীদেবী পানে
চেয়ে রন বিশ্বম্ভর পুলকিত মনে

লক্ষ্মীদেবী দুঃখ প্রকাশ করলেও গৌরাঙ্গের হৃদয় রাজ্যে লক্ষ্মীদেবী স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।

স্বামীর অতিথি সেবার আদর্শে লক্ষ্মীদেবী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অবিরাম গৌরাঙ্গের গৃহে অতিথি সমাগম হত। মহাপ্রভু দুঃখীর দুঃখে কাতর হতেন। অন্ন, বস্ত্র, অর্থ দু'হাতে বিতরণ করতেন। এমনও হয়েছে মহাপ্রভু দশ-কুড়ি জন সন্ন্যাসীকে গৃহে নিমন্ত্রণ করেছেন। ঘরে অথচ কিছু নেই যা দিয়ে অতিথি সন্ন্যাসীদের আপ্যায়ন হতে পারে। লক্ষ্মী-দেবী কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না কিংবা স্বামীর প্রতি বিরূপও হলেন না। অসীম তাঁর ধৈর্য কিন্তু রান্নার সামগ্রী মুহূর্তেই পৌঁছে গেল—

চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন জনে
সকল সম্ভার আনি দেয় সেই ক্ষণে।

আর এই সব সম্ভার পেয়ে লক্ষ্মীদেবী আনন্দের সঙ্গে রান্না করলেন। লক্ষ্মীদেবী কত রকমের রান্না করে দিলেন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তার সুন্দর বর্ণনা আছে—

রন্ধনশালায় প্রবেশিলা লক্ষ্মীমাতা
শচী ঠাকুরাণী গেলা দেখিবারে তথা ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধিল কৌতুকে।
পিষ্টক পায়স অন্ন রান্ধিল একে একে ॥

গৌরাঙ্গের যে কোনো আদেশকে লক্ষ্মীদেবী হাসিমুখে পালন করেছেন তা পালন করার মধ্যে কোনোরকম আলস্য বা দ্বিধার প্রকাশ ছিল না। এইভাবে যখন মহাপ্রভুর সর্বাঙ্গসুন্দর সংসার জীবন প্রবাহিত হচ্ছিল সেই সময় মহাপ্রভু শচীমাতাকে জানালেন—

'লক্ষ্মী বিভা করি আমি সংসারে পড়িল ॥
ইষ্টমিত্র কুটুম্ব রমণী দাস দাসী।
রক্ষণ পোষণ করি ইহা ভালবাসি ॥
অর্থ উপার্জ্জন বিনু সংসার না চলে।
বঙ্গদেশ জাব আমি অর্থের ছলে ॥ [চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ]

অর্থ উপার্জনের জন্য বঙ্গদেশে যাবেন সেজন্যে লক্ষ্মীদেবীকে মায় হাতে সমর্পণ করলেন। পত্নীর উদ্দেশে বললেন—

লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর।
মাতার সেবায় তুমি রহিবে তৎপর ॥
মায়ে যত বৈল কিছু না শুনিল পহুঁ।
শুভযাত্রা করি যায় হাসে লহু লহু ॥ [শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস]

লক্ষ্মীদেবী ছিলেন কর্তব্যপরায়ণা; তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভুর আস্থাভাজন হয়েছিলেন। তাই তিনি মায়ের দায়িত্ব লক্ষ্মীদেবীর উপর দিতে এতটুকু দ্বিধা বা সংশয় প্রকাশ করেন নি। এবার কিন্তু লক্ষ্মীদেবী মনে মনে বেদনা বোধ করলেন। তাঁর এই বেদনা গৌরাঙ্গকে ঘিরে। কারণ তিনি মহাপ্রভুকে অনেক দিন দেখতে পারেন না, তাঁর চরণ সেবা করতে পারবেন না এই কথা চিন্তা করে তিনি কেঁদে উঠলেন, মহাপ্রভু তাঁকে প্রবোধ দিলেন—

বঙ্গ যাত্রা শুনি কান্দে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
প্রবোধিল তাঁরে গৌরচন্দ্র দ্বিজমণি ॥

আমার মায়ের সেবা করিহ নিরবধি।
কান্ধের যজ্ঞসূত্র তাঁরে দিল দয়ানিধি ॥
আমার চরণধূলি রাখ কটুয়া ভরি।
কপালে তিলক নিহ মন্ত্র জাপ্য করি ॥ [চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ]

লক্ষ্মীদেবীর জীবন গতানুগতিকভাবে চলতে লাগল। শাশুড়ীর সেবা, দেবমন্দিরে দেবতার পূজা অর্চনার সঙ্গে যুক্ত হল গৌরাঙ্গের পাদুকাকে মালা-চন্দন, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে দিন রাত্রি পূজো করা। মহাপ্রভুর অদর্শন জনিত বিরহ লক্ষ্মীদেবীকে অস্থির করে তুলল। মহাপ্রভুর দেওয়া চরণ ধূলোয় তিলক কেটে হলুদ বসন পরলেন। প্রভুর সঙ্গে তাঁর এই বিচ্ছেদ লক্ষ্মীদেবীর জীবনে অভিসম্পত রূপেই প্রতিভাত হল। সংসারের সব কর্তব্যই করেন আর ভাবেন কতদিনে তাঁর এই অভিসম্পাত শেষ হবে।

অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে ॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥
নামেরে সে মাত্র অন্ন পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিত অন্তরে ॥ [চৈতন্যভাগবত]

শয্যায় শুয়ে সারারাত তাঁর কাটে চোখের জল ফেলে। বঙ্গদেশে মহাপ্রভু অনেক বিদ্যারস অর্জন করলেন। অনেক পদবী, যশ, খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি তিনি পেলেন আর নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী চির-বিরহিনী হয়ে রইলেন। এ অন্তরবেদনা তো কাউকে বলবার নয়। কিন্তু বেশিদিন এই বেদনা চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না। সখি চিত্রলেখার কাছে নিজেকে প্রকাশ করে ফেললেন—

'কতদিন সম্পাত ঘুচিব চিত্রলেখা
আমার ঠাকুর সনে না হইল দেখা' ॥ [চৈতন্যমঙ্গল]

লক্ষ্মীদেবী ধরেই নিয়েছিলে তাঁর সঙ্গে গৌরাঙ্গের আর দেখা হবে না। সে জন্যে মৃত্যুবরণ করাতেই লক্ষ্মীদেবী শ্রেয় বলে মনে করলেন। নিয়তির অমোঘ বিধান। শাশুড়ীর সঙ্গে রাত্রি-বেলায় তিনি নিদ্রায় মগ্ন সেই সময়—

রাত্রি অবশেষে কাল সর্পরূপ ধরি
দংশিল দক্ষিণ পদে কনিষ্ঠ অঙ্গুলী [চৈতন্যমঙ্গল]

চৈতন্যভাগবতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর কারণ-সর্পদংশন বলে দেখান হয় নি। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে পৃথিবীর এই মায়াময় সংসারে লক্ষ্মীদেবী নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না—

'ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সম্মুখে যাইতে ॥

মৃত্যুর আগে প্রভুর পাদপদ্মে হৃদয়ে স্থাপন করলেন তার প্রভুর দেওয়া যজ্ঞসূত্র নিজের গলায় ধারণ করে 'ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মহাপ্রভু খ্যাতি, যশ, অর্থ উপার্জন করে ঘরে ফিরলেন, মায়ের মুখ বিরস হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শচী দেবী পুত্রবধূর সংবাদ শোনালেন। সে সংবাদ শুনে মহাপ্রভু—

এ বোল শুনিঞা প্রভু শুনহ বচন,
ছলছল করে আঁখি করুণার জল ॥

লক্ষ্মীদেবীর বিরহে মহাপ্রভু মর্মাহত হলেন। শচীদেবীকে শান্ত করার জন্যে এবং নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দিলেন—

পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
ক্ষণেক বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার
স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব বেদসার ॥

*　　　*　　　*

প্রভু কোলে মাতা দুঃখ ভাবকি কারণ।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমন ॥ [শ্রীচৈতন্যভাগবত]

॥ ২ ॥

লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধানের পর শচীদেবীর হৃদয় শূন্য হল, ঘর শূন্য হল। মহাপ্রভু ঘোরতর সংসারী ছিলেন না কিন্তু প্রথমা পত্নীকে কেন্দ্র করে সংসারের কর্তব্যকর্মের প্রতি আকর্ষণ এবং দায়িত্বশীলতা যেটুকু দেখা গিয়েছিল সেটাও আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগল। উদাসীনতা বেশি করে প্রকটিত হতে লাগল। এই অবস্থায় শচীদেবীর সঙ্গে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সহধর্মিনীর গঙ্গার ঘাটে পরিচয় ঘটল; সঙ্গে ছিল সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীকে প্রণাম করলেন। তাঁর সলজ্জ বিনম্রভাব শচীদেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে তাঁর পুত্রের যোগ্য বলে মনে করলেন। শচীদেবী গঙ্গা স্নানে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তাতে সম্মতি জানালেন।

নবদ্বীপের মুকুন্দ পণ্ডিত তাঁর 'গৌরাঙ্গ উদয়' গ্রন্থে শচীমাতার প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়ার এই মনোভাবের কারণ উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহের অনেক আগে জাহ্নবী ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে সেই থেকে নবানুরাগের সঞ্চার হয়। সেই থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া যখনই গঙ্গাঘাটে আসতেন তাঁর নয়নযুগল অনুসন্ধান করত গৌরাঙ্গকে। পদকর্তা বাসুঘোষের একটি পদে বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অনুরাগ ধরা দিয়েছে—

'গোরারূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে সপনে ॥
যে দিকে ফিরাই আখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আখি ॥
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা কিনা মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল ॥'

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত তখন পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত। সংসাসের প্রতি নির্লিপ্ত মনোভাব তাঁর বেড়েই চলল। শচীদেবী খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গৌরাঙ্গের পুনরায় বিবাহের জন্য। তিনি সনাতন মিশ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন তাঁর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে পাওয়ার জন্য। এই শুভ প্রস্তাবে মিশ্র পরিবার রাজি হলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ স্বয়ং এই বিবাহে মত দিলেন না। প্রামাণ্য গ্রন্থ মুরারী গুপ্তের কড়চায় গৌরাঙ্গের এই বিবাহে অমত আছে এরূপ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। লোচনদাস তাঁর কাব্যে এই তথ্যেরই অনুসরণে লিখেছেন—

গণক কহিল শুন শুন হে পণ্ডিত।
আসিতে দেখিল গৌরচন্দ্রে আচম্বিত ॥
তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি যে কৈল বচন ॥
কালি শুভ অধিবাস হইবে তোমার।
বিবাহ হইবে শুন বচন আমার ॥

এ বোল শুনিয়া তেহো কহিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যা বর॥

আগামী কাল যাঁর অধিবাস তিনি নিজেই জানেন না তাঁর বিবাহের কথা। কিন্তু শচীদেবী তো কথা দিয়ে দিয়েছেন মিশ্র পরিবারকে। সনাতন মিশ্র সেই অনুযায়ী সব আয়োজনও সমাপ্ত করেছেন। গৌরাঙ্গ নিজে দোটানায় পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্নেহময়ী জননীর কথা রাখবার জন্যে তিনি এই বিবাহে মত দিলেন। তিনি গণকের কাছে কৌতুকছলে এই সব কথা বলেছিলেন সেটা লোচনদাস তাঁর কাব্যে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কৌতুক রভসে আমি গণকেরে বৈল
না বুঝি কার্য্যে কেনে অবহেলা কৈল
* * *
মায়ে যে কহিল, তাহে আছে কোন কথা।
তাহার উপরে কেবা করয়ে অন্যথা॥
মিছা কার্য্য ক্ষতি, মিছে দুঃখ পাও চিতে।
করহ বিভার কার্য্য যে হয় উচিতে॥

গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ সমারোহ এবং বহু অর্থ ব্যয়ে সুসম্পন্ন হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তার বিস্তৃত এবং সৌন্দর্যময় বর্ণনা আছে। উল্লেখযোগ্য মহাপ্রভুর অধিবাস—

সবে বলে ধন্য ধন্য অধিবাস॥
* * *
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে
এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥

বিবাহ বাসরে যাবার জন্য মহাপ্রভুর ভুবনমোহন অনন্ত সুন্দর রূপ মাধুর্য অবর্ণনীয়—

'দিব রত্ন অলঙ্কার রক্ত প্রান্তবাস।
মহ মহ করে গোরা—অঙ্গের বাতাস॥
* * *
নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
ঝলমল অঙ্গ তেজ চাহিতে না পারি॥ [শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল]

সনাতন মিশ্র মেয়েকে দিয়েছিলেন—

পণ্ডিত শ্রীসনাতন হোথা নিজ ঘরে
নিজ কন্যা ভুষা কৈল নানা অলঙ্কারে॥
গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গছটায় আলো করে দেশ॥

শুভদৃষ্টির সময় চার চোখের মিলন হল। শ্রীমতীর চোখে লজ্জা থাকলেও, মুখে ছিল আনন্দের উজ্জ্বল হাসি। গৌরাঙ্গকে পেয়ে শ্রীমতী আত্মহারা হলেন—নয়নে তাঁর প্রেম অশ্রুজল, দেহ হল পুলকিত। বিষ্ণুপ্রিয়াকে পেয়ে শচীদেবীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের অস্থিরতা কিছুটা প্রশমিত হল। তিনি মনে করলেন অন্তর্হিতা লক্ষ্মীদেবীকে তিনি যেন পুনরায় ফিরে পেলেন।

পতি ভিন্ন অন্য দেবতাকে জানা এবং সেবা করা বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে সায় পায় নি। গৃহে নারায়ণের সেবার জন্য আয়োজন করতেন, ভোগ রান্না করতেন কিন্তু চির আকাঙ্ক্ষিত গৌরসুন্দর ছিলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুর। এদিকে গৌরাঙ্গ সারাদিন জ্ঞানচর্চা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতেন—স্নানাহারের সময় শুধুমাত্র তিনি বাড়ি যেতেন। আর সেই সময়টুকু বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে মহাপ্রভুর

সেবা করার অধিকার পেতেন। পা ধোয়ার জল, খড়ম, গামছা, তেল গুছিয়ে রাখতেন। নারায়ণের ভোগ দেওয়া শেষ হয়ে গেলে বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভরের সামনে ভোগ অন্ন রেখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতি নয়নে ঘোমটার আড়ালে থেকে মৃদুমধুর হেসে হৃদয় সখার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। চিরসুন্দর প্রিয়তম গৌরাংগ কেবল তাঁকে নিয়ে কালাতিপাত করুক—বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে এই আকাংক্ষা থাকলেও স্বামীর কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তাদান করাকে তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

গয়া থেকে পিণ্ডদান করে ফেরার পর গৌরাঙ্গের প্রেমাবেশ ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে লাগল। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি পাগল। গৌরাংগের এই অস্থির অবস্থায় বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর চরণ সমক্ষে উপস্থিত হলেও গৌরাংগ সেদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দিতেন না। স্ত্রীর প্রতি তাঁর মায়া মমতার প্রকাশ ছিল না। এই উপেক্ষা পেয়েও বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে প্রভুর সেবা করার চেষ্টা করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে শান্তি নেই। তিনি সব সময় অমংগলের পদধ্বনি শুনতেন। লোকমুখে তিনি যখন শুনলেন গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিতে চলেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তখন চিন্তা করলেন—

কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ॥ [চৈতন্যমংগলে]

তিনি আশঙ্কার সত্যতা নিরূপণের জন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—

শুন শুন প্রাণ নাথ, মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা বিদারিতে চাহে হিয়া
সগুনেতে প্রবেশিব আমি॥
তো লাগি জীবনধন রূপ নবযৌবন
বেশ-বিন্যাস ভাব-কলা। [চৈতন্যমঙ্গল]

তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হল এ কথা চিন্তা করে যে তাঁর প্রাণনাথ—

'কেমনে হাটিয়া যাবে পথে
শিরীষ কুসুম যেন সুকোমল চরণ
পরশিতে ডর লাগে যাতে॥ [চৈতন্যমঙ্গল]

মহাপ্রভু কাটোয়ায় গিয়ে যেদিন সন্ন্যাস নিলেন সেদিন থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া—

'তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া
দিবানিশি পিয়ে গোরা নাম সুধা খনি।
* * *
হেনমতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ-বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥

মহাপ্রভু শান্তিপুরে এলে বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া তার সংগে আর সবাই দেখা করতে গেলেন। শচীমাতাও গেলেন। প্রিয়াজীর সংগে মহাপ্রভু দেখা করবেন না এ নির্দেশ স্বয়ং মহাপ্রভু দিয়েছিলেন। প্রিয়াজী তাঁর এই নির্দেশ মেনে নিলেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পূর্বে যে বিষ্ণুপ্রিয়া বলেছিলেন—

তোমার চরণ বিণি আর কিছু নাহি জানি
আমারে ফেলাহ কহি ঠাঞি

সন্ন্যাস পরবর্তী অধ্যায়ে মহাপ্রভুর এই নির্দেশ পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বিচলিত হলেন না, অভিমান প্রকাশ করলেন না। স্বীয় প্রাণনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে প্রকাশ পেল তার মর্মার্থ হল—বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর অর্ধাংগিনী। তিনি প্রেমময়। জীবের মংগল, জীব উদ্ধারের জন্য তাঁর সন্ন্যাস। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে জগৎকে দেখালেন যে জীবের জন্য তিনি তাঁর

প্রণয়িনী অর্ধাঙ্গিণীকে ত্যাগ করেছেন। তিনি মহাপ্রভুর অর্ধাঙ্গিনী এটাই তাঁর সৌভাগ্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর অতি প্রিয়জন। বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার কঠোর, ভয়ঙ্কর, ভীষণতম বিরহের ছবি পদকর্তা এবং চরিতকারেরা এঁকেছেন কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগের মনোভাব মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও সন্ন্যাস পরবর্তী জীবন ধারায় সহায়তা করেছিল।

গৌরাঙ্গ-লীলায় মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য ধর্ম বিকাশের তেমন স্ফূর্তি দেখতে না পাওয়া গেলেও কিছু কিছু গার্হস্থ ধর্ম আচরণ তিনি করে গেছেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে কেন্দ্র করে সংসার জীবনের কিছু তথ্য পরিবেশিত হলেও, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর যে সংসার জীবন তার থেকে মহাপ্রভু যেন সবসময় আড়ালে থেকেছেন। গৃহের বাইরে ব্যস্ত থাকতেন পড়ুয়া ভক্ত, শিষ্যদের নিয়ে। গৌরাঙ্গের লীলা-লেখকগণ চরিতাখ্যানের সকল দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে করেন নি বলে প্রামাণ্য গ্রন্থ মুরারি গুপ্ত তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে সামান্য কথার মাধ্যমে অনেক কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বিভ্রমৈঃ
ররাজ রাজম্বর হেম গৌরঃ
বিষ্ণুপ্রিয়া—লালিত পাদ পঙ্কজো
রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্র মৌলিঃ॥

পরবর্তী সমালোচনার ধারায় লক্ষ্মীপ্রিয়াতত্ত্ব ও বিষ্ণুপ্রিয়া তত্ত্বকে এক এক অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই ধারনার মূলে কিছু কারণও আছে। সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখছেন—

তাঁর কন্যা আছেন পরম সুচরিতা
মূর্তিমতী লক্ষ্মী প্রায় সেই জগন্মাতা।

লোচনদাস লিখেছেন— প্রভুর নিকটে আনি জগ-মন-মোহিনী,
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী নামা।

আবার— এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা
পৃথিবীতে কৈল আগমন॥

সুতরাং সনাতন মিশ্র নন্দিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও বল্লভাচার্য নন্দিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী যে একবস্তু; প্রভুর ইচ্ছায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দেহে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত লোচনদাস প্রকাশ করলেন।

প্রবাসে যাবার পূর্বে দিনটিতে লক্ষ্মীদেবী প্রাণ বল্লভের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ঐ দিনটির যুগল-বিলাস মিলন যে শেষ মিলন সেটা মহাপ্রভু মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন। প্রেম-ভক্তিভরে তিনি প্রভুকে বেঁধেছিলেন। তিনি তার প্রতিদানে ঐশ্বর্য চান নি, চেয়েছিলেন প্রাণ বল্লভের পদ-রাজ, প্রসাদী ত্যজ্য বস্তু আর তার ব্যবহৃত যুগল-বিলাস যজ্ঞোপবীতটি। তাঁর পতি-বিরহ দুঃখ বর্ণনার অতীত। সন্ন্যাসের পূর্ব দিনটিতে মহাপ্রভু দ্বিতীয়া ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্মীদেবীর মত নিজ-হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলে নীরবে নির্জ্জনে পড়ে থেকে গৌর চিন্তা, গৌর-নাম জপ করতেন অনুক্ষণ।

গার্হস্থ্য জীবনে, মহাপ্রভু প্রবাসে গেলে এবং তিনি সন্ন্যাস নিলে এই দুই বিরহিনী নায়িকার মনোভাবের কোন পরিবর্তন আমরা পাই না। সংসার জীবনে প্রবেশ করে এই দুই ঘরণী যে দৃষ্টিতে মহাপ্রভুকে দেখেছিলেন আমৃত্যু সেইভাবে তারা তাঁদের মনের আশঙ্কা, উচ্চাগের প্রেম, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে তাঁদের যে গৃহী জীবন বিবর্তিত হয়েছিল তাঁরই উদ্দেশে জীবনকে তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ও নারীসমাজ

ড. সবিতা মিশ্র

খৃষ্টাব্দ ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮—এই সময়ে হুসেন শাহ এবং তাঁর বংশধরদের হাতে ছিল বাংলার শাসনভার। এই সময়ের অল্প কিছুকাল আগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। হুসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যের কর্ম ও ভাব জীবনের প্রসার। শাসকবর্গের অপশাসন এবং সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে তিনি ভক্তিবাদী ধর্মের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার দিয়েছিলেন। ষোড়শ শতকের বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি ও প্রেমবাদের প্লাবনে সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষেরা পেয়েছিল নতুনভাবে বাঁচার মন্ত্র। এই নিচুতলার মানুষেরাই ছিল শ্রীচৈতন্যের আসল শক্তি। তিনি জানতেন যুগ যুগ ধরে অপশাসিত এবং অবহেলিত মানুষদের প্রেমভক্তির মাধ্যমে সহজেই আকৃষ্ট করা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়াবাড়ি এবং ছুৎমার্গ সহজ চিত্তে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ছুঁৎমার্গের পাল্লায় মানুষকে সামাজিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়। বাঁচার তাগিদে মানুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্য জানতেন ভক্তির বাধা বন্ধনহীন পথই মানুষের একমাত্র উদ্ধারের পথ। এই ভক্তির পথে সব মানুষকে মেলাতে হবে। সুলতান, বাদশা কিংবা নবাবেরা কোনও ভাবেই তাদের ধর্ম জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না।

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ। চৈতন্যদেব হুসেন শাহের দুই মন্ত্রীকে তাঁর প্রেমভক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করে ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন। প্রেমভক্তিবাদের বাণী নিয়ে তিনি একেবারে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্রে নিঃশব্দে আঘাত হেনেছিলেন। হুসেন শাহের পরেই যিনি গৌড়ের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পদটি অধিকার করেছিলেন সেই সাকর মল্লিক তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সনাতন নামে আত্মপ্রকাশ করেন। অন্যজন মন্ত্রী দবীর খাস সনাতনের ভাই রূপ নামে স্বীকৃত হন। ব্রাহ্মণ নিবন্ধকারেরা যে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখতে চাইতেন না চৈতন্যদেব সেই পথের পথিক ছিলেন না।

বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক কোনও গুরু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নারী ও শূদ্রদের অধিকার ঘোষণা করেছিলেন তিনি। চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারতীয় ভক্ত গোপালভট্ট তাঁর হরিভক্তি বিলাসে স্কন্দপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি সহকারে জানিয়েছিলেন, শালগ্রামশিলার পূজার অধিকার শুধু ব্রাহ্মণের নয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদেরও আছে; আছে নারীদেরও। সনাতন গোস্বামীও এই মতের পরিপোষক ছিলেন। দীর্ঘ অবহেলিত নারীর প্রতি সম্মান জ্ঞাপনেরই দৃষ্টান্ত এটি।

শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর কোনও স্থান ছিল না। একবার শ্রীবাসের গৃহে নিমাই ভগবৎ ভাবে মগ্ন ছিলেন। তখন শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনা ও তাঁর তিন ভ্রাতার স্ত্রী-এই

চারজনে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা স্ত্রীলোক বলে ঘরে ঢ্কতে পারিছেন না অথচ ঘরে স্বয়ং শ্রী ভগবান। তখন শ্রীকান্তকে (শ্রীবাসের সর্ব কনিষ্ঠ) কাতরভাবে বলছেন, তুমি একবার আমাদের হয়ে ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর আমরা স্ত্রীলোক বলে কি তার চরণ দর্শন করতে পারব না। তখন নিমাই কাতর ধ্বনি লক্ষ্য করে বলছেন, "যাঁরা আমাকে দর্শন করবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়ে পিঁণয়ি দাঁড়য়া আছেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আসিতে পারেন। এসে দর্শন কর্ন।" তাঁরা ভূমিতে ল্ণ্ঠিত হয়ে শ্রীচরণ প্রান্তে পতিত হলেন তখন নিমাই তাঁদের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। এই সময় নিমাই বিভিন্ন দেবভাবে ভগবত প্রেমে আবিষ্ট থাকিতেন। একবার শিবের কথা শ্নে শিবের যতভাব সবই তাঁর শরীরে প্রকাশ পেতে লাগল অর্থাৎ তিনি শিবভাবে ভাবিত হলেন। একদিন বরাহ অবতারের কথা শ্নে তিনি ম্রারিকে বরাহম্তিতে দর্শন দিয়েছিলেন। যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতেন তখন নিজেকে দাস্যভাবে দীনের দীন বলে ভাবতেন।

শ্রীচৈতন্য ছিলেন অসীম শক্তির অধিকারী। তিনি তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন একথা যেমন সত্য সের্প শৃংখলা, নিয়মান্বর্তিতা সব দৃঢ়হস্তে বজায় রেখেছিলেন। মাধবীদেবীর কাছ থেকে ভিক্ষা নেবার ফলে তিনি ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই দ্ঃখে ছোট হরিদাস জীবন বিসর্জন করেন। একবার প্রীতে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি দেবদাসীর দিকে ছ্টে যান তখন পরিকর গোবিন্দ বাধা দেওয়ায় তিনি খ্ব সন্ত্ষ্ট হয়েছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি মা শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন শান্তিপ্রে এসে কিন্ত্ স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করেন নি। বিষ্ণুপ্রিয়াও স্বামীর সন্ন্যাসব্রত যাতে ভঙ্গ না নয় সেইজন্য শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। তিনি গৃহে থেকে নীরবে সাধনা করেছেন। তিনিই প্রথম চৈতন্যের ম্তি নিমকাঠ দিয়ে তৈরী করে প্জা আরম্ভ করেন। পরবর্তী য্গে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় শ্রীমা তাঁর ফটোতে প্জা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে বলেছিলেন, একদিন এই ছবি ঘরে ঘরে প্জিত হবে।

চমৎকার দৃশ্য—একদিকে নদীয়ায় স্ত্রী-বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের ম্তির সম্ম্খে সমাধিস্থা; অপরদিকে প্রীধামে শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত হয়ে উন্মাদ অবস্থায়। সন্ন্যাসের প্বে নিমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণভাব রাধাভাব থাকলেও সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব নিজেকে প্রকৃতির্পে কল্পনা করে রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় রত থাকেন। এটাই নারীজাতির বিরাট প্রাপ্য। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যের মত নারীভাবে সাধনা করেন।

চৈতন্য গোষ্ঠীর মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য নারীর বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও প্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা অত্যন্ত উন্নত জীবন যাপন করতেন। এই সময় বৈষ্ণবদের মধ্যে যে বিবাহ পদ্ধতি ছিল তার মধ্যেও নত্নত্ব দেখা যায়। কণ্ঠিবদলের মাধ্যমে বিবাহ এবং কণ্ঠিপরিত্যাগের মাধ্যমে বিচ্ছেদ। ভক্তদের মধ্যেই বিবাহ হত। কাজেই জাতের কোনও কিছ্ প্রশ্ন ছিল না।

বৈষ্ণব মেয়েরা কীর্তনে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। লেখাপড়ারও প্রচলন ছিল। আলপনা দিতে তাঁরা খ্ব ভাল জানতেন। নিজেদের অলকা-তিলকার সাহায্যে সজ্জিত রাখতেন। শিল্পকলার দিকে বৈষ্ণব মেয়েদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁদের সৌন্দর্যবোধও অসাধারণ ছিলেন। দেবতাদের অঙ্গসজ্জায় বৈষ্ণব মেয়েদের দান অতুলনীয়। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নারীদের সমাজ প্রগতির প্রবাহে য্ক্ত করে দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব।

যতই শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে চিন্তা করা যায় ততই তাঁর লোকোত্তর অলৌকিক আচরণ আমাদের স্তম্ভিত করে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর সন্ন্যাসব্রত পালনের জন্য প্রেমের সাগর চৈতন্য মহাপ্রভু পত্নী শ্রীমতী

বিষ্ণুপ্রিয়ার ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করেন নি। অথচ তিনিই আবার নিত্যানন্দকে বিবাহ দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দের সুযোগ্য উত্তরাধিকারিণী ছিলেন তাঁর পত্নী জাহ্নবী দেবী বা জাহ্নবা দেবী। জাহ্নবী দেবীই কৃষ্ণমূর্তির বামে রাধার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে বৈধী সাধনাকে সমাজে মর্যাদার আসনে বসিয়ে ছিলেন। তিনি নিজে খেতুরির মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা অধিবাস সঙ্কীর্তনের আগে নরোত্তম ঠাকুর মালা চন্দন দিয়ে জাহ্নবাদেবীর পূজা করেছিলেন। পূজার প্রাসাদী মালাচন্দনও প্রথমে দেওয়া হয়েছিল জাহ্নবাদেবীকে। বিষ্ণুপ্রিয়াও বৈষ্ণব সমাজে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছিলেন।

কীর্ত্তন মণ্ডপেও তাঁর নেতৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। এই ভাবে ধর্ম আন্দোলনে জাহ্নবা দেবীর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেব নারী সমাজের বন্ধ অর্গল খুলে দিয়েছিলেন বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল।

মিশনারী মেয়েদের পূর্বে বৈষ্ণব মেয়েরা বিশেষ শিক্ষিত হয়ে সমাজে শিক্ষকতার কাজ করতেন। আমরা সাহিত্য সাধক চরিতমালার দ্বিতীয় খণ্ডে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) স্বর্ণকুমারী দেবীর নিজের লেখা প্রবন্ধ হতে তা জানিতে পারি— 'স্নান বিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূত হতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না। সংস্কৃতিবিদ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। অতএব বাঙ্গালা ভাল; ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনা শক্তি ছিল। একদা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন।

'যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেবদেবীর বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কোতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন।'

চৈতন্য সমসাময়িক কালে এভাবেই নারীরা আপন অস্তিত্বের উপর ভর দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করেছিলেন, সমাজ-প্রগতির প্রবাহে যুক্ত করেছিলেন। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত নারীরাই নয়, চর্যাপদে বর্ণিত অন্ত্যজ গোত্রের রমণীরা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গ্রামীন অশিক্ষিত নারীরাও এইসময়ে অনেকাংশে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিলেন। চৈতন্য উত্তরকালে ব্যাপক হারে নারীদের ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার মধ্যেই তা প্রমাণিত। মধ্যযুগের নারীদের উপর সামন্ততান্ত্রিক যে অত্যাচার চলে আসছিল, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছিল—এটাও সত্য। রায় রামানন্দের নাট্যদলের অভিনয়ে নারীর যোগদান এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এভাবেই অনেকাংশে নারীসমাজ এগিয়ে গিয়েছিল সামনের দিকে। □

বাংলা সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্য

ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচশ' বছর আগে বাংলার মাটিতে চৈতন্যদেবের ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাটি অবিস্মরণীয় বিষয়। তাঁর আবির্ভাবেই নবজাগরণের হাওয়া সারা ভারতে ছড়িয়ে যায়—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধটি পরিচিত হয়েছে 'One man golden age' হিসেবে। বাংলার তথা ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে তিনি এনেছিলেন বিপুল গতিবেগ। তাঁর আগে কি ছিল এবং পরে কি হল তার বিশদ খতিয়ান দেওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা তাঁর জীবন চরিতকারগণ, কাব্য-নাট্যকারগণ এবং বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক মন্তব্য করেছেন। এখানে চৈতন্য-আবির্ভাব সম্পন্ন না হলে কি হত এবং বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ জীবনে তাঁর প্রভাব নিয়ে আলোচনাই আমার প্রতিপাদ্য।

পাল-সেন রাজত্বের অবসানের পর বাংলার ভাগ্যাকাশে সৃষ্টি হয়েছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধতা যতই থাক, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটা সামাজিক কাঠামো বজায় ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সামাজিক আবহাওয়ার নিঃশ্বাস নিতে পারত। রাজা-কেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিরও বিকাশ ঘটত। রাজসভা সাহিত্যের অলংকারিক ঐশ্বর্যের পাশাপাশি চর্যাগানে ডোম-শবর-তাঁতী-জেলেদের জীবনও অংকিত হত। লোকায়ত জীবনে নৃত্য গীত চলিত ছিল। কিন্তু তুর্কী আক্রমণের ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি নিয়ে বংকিমচন্দ্র যে মন্তব্যই করুন না কেন, তখন যে বাঙালীর চিত্তদেশে একধরণের অবসাদ ও হতাশা ছড়িয়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অতঃপর বাংলা সমাজ—সংস্কৃতিতে যে অন্ধকারের ছায়া নেমে এলো তা একমাত্র পাঠান শাসক হোসেনের সংস্কৃতিমনা আচরণে আংশিক দূর হয়। কিন্তু তা যতটুকু সাহিত্যে তার সামান্যটুকুও সমাজ-চিন্তায় যদি হত! হয়নি বলেই পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমাজে চলছিল ব্রাহ্মণদের আধিপত্য—জাতি ও বর্ণভেদের নিষ্ঠুর প্রাধান্য।

ঠিক সেইসময়ই শ্রীচৈতন্যের উপস্থিতি সমাজের নানা স্তরের নানা বৃত্তির অসংখ্য মানুষের জীবন সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। চৈতন্যদেব দেখেছিলেন হিন্দু সমাজে চাতুর্বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার ফল কি মর্মান্তিক। নানক, কবীর, দাদু রামদাস, সুরদাস প্রমুখদের মত তাঁর মনটিও সে দৃশ্য দেখে কাতর হয়েছিল। এক শ্রেণীর বৌদ্ধরা যেমন ধম্মপদে অন্ত্যজ মানুষদের গুরুত্ব দিয়েছিলেন তেমনি শ্রীচৈতন্যও হিন্দুসমাজে অপাংক্তেয় বৈশ্য শূদ্রে, পতিত মানুষদের সামনে আশার আলো জেলে দিলেন। অদ্বৈতাচার্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন—

যদি ভক্তি বিলাইবা। / স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥ (চৈ. ভা.)

শ্রীচৈতন্য যে সমাজ সংস্কারে কতখানি আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার পরিচয় মেলে রামকেলি গ্রামে অবস্থানের সময় রাজার ভয়ে ভীত পরিকর অনুচরদের সাহস প্রদানের ঘটনায়। নবদ্বীপে চাঁদকাজী দলনে মহাপ্রভুর এগিয়ে আসার ঘটনাটি ঐতিহাসিক সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মানুসারীদের বিরুদ্ধে কাজী সতর্ক করে বলেছিল—'সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু' (চৈ-চ)। শ্রীচৈতন্য প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—'আজি সব যবনের করিব প্রলয়' (চৈ. ভা.)। এরপর তিন সম্প্রদায়ের নগর সংকীর্তন দেখে কাজীর পরাজয় স্বীকার। এভাবেই বহু যবন-পাঠান-পীরকে তিমি বৈষ্ণব ভক্তে রূপান্তরিত করেন। যবন হরিদাসকে অন্তরঙ্গ পার্ষদের স্থান করে দেন, বলেন তাঁদের জাতি এক। সেই যুগে দাঁড়িয়ে এমন শাস্ত্রবিরোধী বক্তব্য

প্রকাশ তাঁর প্রগতিশীলতারই পরিচয়বাহী। তিনি নিত্যানন্দকে নীলাচল থেকে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন ভাগীরথীর দুই কুলে অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে হরিনাম বিতরণের উদ্দেশে।

চৈতন্যদেবের এই সমাজ সংস্কারের ফল ঃ ক. নিম্ন বর্ণের মানুষদের ব্যাপকহারে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ; খ. সদগোপ ও তিলিদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি; গ. সমাজে নারীর সম্মানবৃদ্ধি।

দুঃখের কথা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৃহত্তর জনমনে মানবিকতার সম্প্রসারণ ঘটলেও আশ্চর্যজনকভাবে বৈষ্ণব মহান্তদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঐশ্বর্যস্পৃহা এবং নীচু তলার মানুষদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখা যায়। মহাপ্রভুর উদার মানবধর্ম খণ্ডিত হয় বৈষ্ণব সহজিযাদের একাংশের অনাচার, গুরুপ্রসাদী প্রথা ইত্যাদির মধ্যে। চৈতন্যোত্তর যুগে ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলন যে ভাবে বাধা পেল তার অবসান উনিশ শতকের আগে ঘটতে পারল না। উনিশ শতকে ব্যাপক চৈতন্য চর্চা সেই অভাব পূরণ করল! ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীতে যে সব নতুন পর্যায় সৃষ্টি হয়েছিল, তার গতি যদি অব্যাহত থাকত তাহলে বৈষ্ণব পদাবলীর দৈন্যদশা আমাদের দেখতে হত না। কেবল তাই নয়, মুঘল পদানত বাঙালী সমাজ নিজ শিরে করাঘাত না করে চৈতন্যের কাজী-দমনের অনুরূপে অত্যাচারী দলনে সমষ্টিগতভাবে সংহত হতে পারত।

একথা সত্য উনিশ শতকেও সেক্সপীয়ার-চর্চা, বেকন-চর্চা এবং কালিদাস-চর্চার সমকক্ষ শক্তি চৈতন্য-চর্চায় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারতেন। গিরিশচন্দ্রের পূর্বের নাট্যকারগণও চৈতন্যের দিকে তাকাননি। পরবর্তীকালের চৈতন্য-জীবনাশ্রয়ী নাটকগুলি নাটকীয়তার অভাবে ভুগেছে। অত্যধিক পুরাণ প্রভাব চৈতন্যাশ্রয়ী নাটককে অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন করায় একজন সমাজ-সংগঠকও দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন, সেটাই বেদনার কথা।

মনে রাখা ভাল, গিরিশচন্দ্রই প্রথম বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মাবলম্বীদের এক রাখীডোরে বাঁধার জন্য চৈতন্য জীবনও বাণী অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। আর বলাই বাহুল্য সে প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবন-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী থেকে—'আন্তরিক হইলে সর্বধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান খৃষ্টান এঁরাও পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। ...এসব বুদ্ধির নাম মতুয়া বুদ্ধি। অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকল ধর্ম মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ ধরে পৌঁছানো যায়।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ এক্ষেত্রে মানব-ঈশ্বরের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। অজ্ঞ, মুচি মেথরকে এক রক্ত মনে করে এবং পংক্তিতে বসাবার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মানবসেবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কার্লমার্কসের সর্বহারার শক্তি প্রতিষ্ঠার কথা তিনিও বলেছেন 'শূদ্র জাগরণ' সম্পর্কিত আলোচনায়। নানা মতপার্থক্য থাকলেও উদার মানবতাবাদ এবং শোষণ মুক্তির প্রশ্নে চৈতন্য-মার্কস ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় আশ্চর্যজনক নৈকট্য লক্ষ্য করা যায়।

২

সামাজিক বিবর্তনে শ্রীচৈতন্যের অবিস্মরণীয় ভূমিকার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর পল্লবিত প্রভাব আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের আকাশটি ছিল ছোট, খুবই ছোট। দশম থেকে দ্বাদশের মধ্যে লেখা চর্যাপদের কবিতাগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে। চৈতন্য সমসাময়িককালের অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা, দরিদ্রজনের উপর বিত্তশালীর অত্যাচার, শোষণ চর্যার কালেও ছিল। সাধনতত্ত্বের রূপকে সমাজের সেই ছবি চর্যার কবিরা প্রতিফলিত করেছেন। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচিত হয়েছিল। যদিও এই কাব্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে এই শতাব্দীতে। কার্যতঃ চৈতন্য পূর্ব কালের সাহিত্য নিদর্শন রূপে ডাক, খনার বচন, শূন্যপুরাণ ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা হত চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের আগে। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট

রচনাগুলি অনেক পরের রচনা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন চৈতন্যের আবির্ভাবের আগেই। শ্রীচৈতন্য ঐ কবিতাগুলি পড়ে মুগ্ধ, ভাবাবিষ্ট হতেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য চৈতন্য পূর্ববর্তী কালেই হয়েছে রচিত। এছাড়া মনসাকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রয়াসও চলেছে।

এই পটভূমিতে শ্রীচৈতন্য আবির্ভাব। স্বভাবতঃ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে সমাজ জীবনে যেমন পরিবর্তন সূচিত হল—সাহিত্যেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেল। এই সূত্রে দেখা মিলল অসংখ্য বৈষ্ণব কবিজনের। শ্রীচৈতন্যকে সামনে রেখে জীবনী সাহিত্যের সার্থক সূত্রপাত হল। বৈষ্ণব কবিতায়ও শ্রীচৈতন্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান তৈরী হল। বৈষ্ণব কবিতা বহু কবির লেখনীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের ধারায় চৈতন্য প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রভাবের মূলে ছিল মানবীয় চেতনা। মানুষের জয়, মানুষের সংগ্রাম—এসব প্রাধান্য পেল। দৈবীসত্তার প্রভাব কমে এল। ১৭ দশ—১৮ দশ শতাব্দীতে লোকচেতনার বহিঃপ্রকাশে লোকসাহিত্যের ধারায় চৈতন্য প্রভাব কার্যকরী হয়েছে বিশেষভাবে। বৈষ্ণবপদাবলীর পাশাপাশি শাক্তপদাবলীর আত্মপ্রকাশ চৈতন্য প্রভাবেরই ফল।

বৈষ্ণবপদাবলীর ধারায় জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রমুখ কবিরা যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা চৈতন্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণেই সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, চূড়ামণি দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি। এর আগে এইভাবে বাস্তবের মাটি থেকে জীবনের সম্পূর্ণ কাহিনী লীলায়িত ছন্দে প্রকাশ করা হয় নি। এই প্রথম শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই তা সম্ভব হয়েছে।

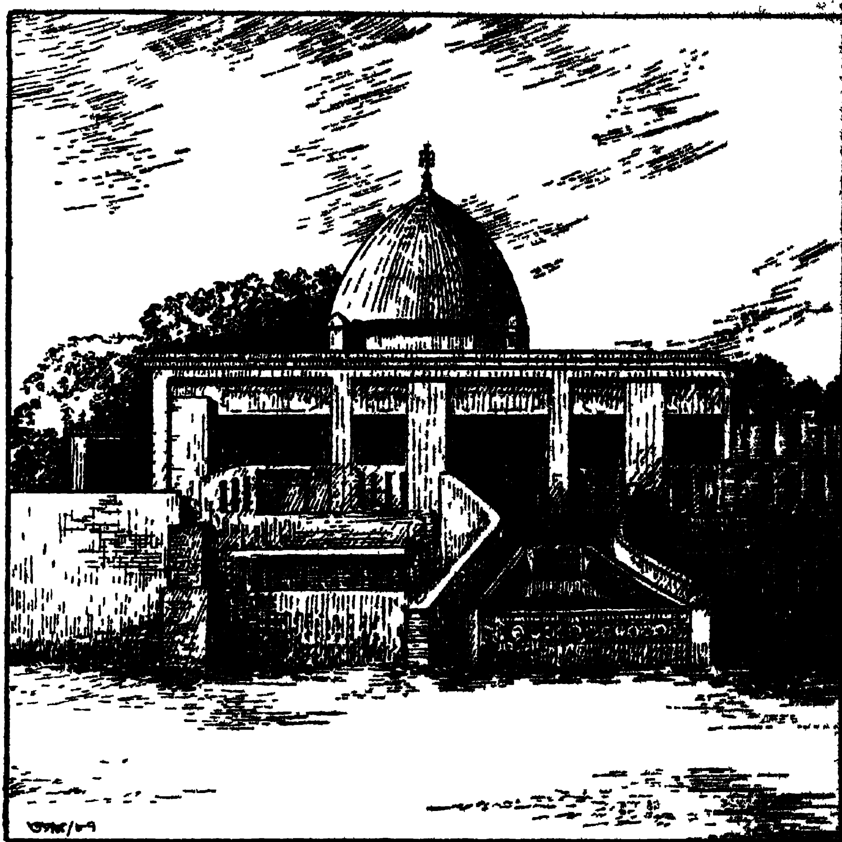
এছাড়া শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সূত্র ধরে ইতিহাসের সন-তারিখ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রকাশিত হল। সাহিত্যে ইতিহাস চেতনার সম্প্রসারণ ঘটল। মানবতাবাদী চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হল বিশেষভাবে। এই সূত্রে ভাষা-ছন্দ পরিশীলিত হল। সাহিত্য-সৌকুমার্য দেখা দিল চৈতন্য প্রেমধর্মের আবেগ—প্রশান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত ব্যাপ্ত করে নিয়ে এল প্রবল উদ্দীপনা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্রের লেখা চৈতন্য জীবন নিয়ে নাটক ও শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাইচরিত'—এই প্রবাহে সার্থক সংযোজন।

৩

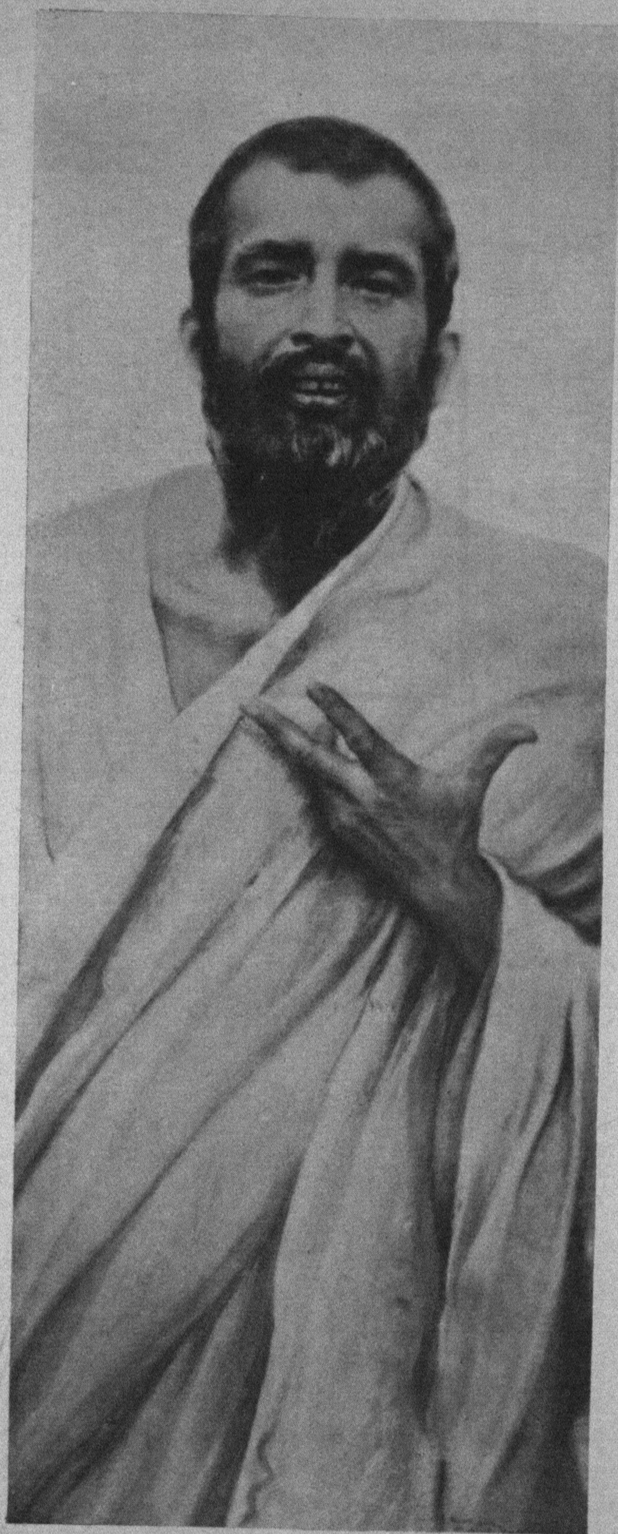
সমাজজীবন ও সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চৈতন্যের প্রভাব পড়িল দীর্ঘভাবে। সেই প্রভাব আজও অব্যাহত। বাংলার নিজস্ব সাংগীতিক ধারা কীর্তনের জনপ্রিয়তা, জনজীবনে তার প্রসার চৈতন্য উত্তরকালে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। শুধু কীর্তন নয় সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও চৈতন্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। নৃত্যকলা, চিত্রচর্চা, নাটক বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

এদেশে, একটু ব্যাপকভাবে বললে বলতে হয়—পূর্বভারতের সংস্কৃতিচর্চায় শ্রীচৈতন্য বড় একটা ভূমিকা নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে লিখেছেন—'চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এক কণ্ঠ বিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোলে সহস্র কণ্ঠ উচ্চারিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ-রাগিনী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল। একজনকে ছাড়িয়া সহস্রজনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল।' (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ২য় খণ্ড, চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫২৯)

এইভাবেই শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে নূতন প্রাণপ্রবাহ যুক্ত করে আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন সামনের দিকে। □



□ প্রসঙ্গ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী



যত মত তত পথ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব



যদি শান্তি চাও তবে কারো দোষ দেখ না।

শ্রীমা সারদাদেবী

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী

স্বামী গহনানন্দ

ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
আবিরাবির্ম এধি॥

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন যে, তিনি যুগে যুগে ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন। বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্যরূপে ভগবানই এসেছিলেন ধর্মসংস্থাপনের জন্য। আর এই গত শতাব্দীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবও সেই একই উদ্দেশ্যে। আজকের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহৎ জীবন ও উদ্দীপনাময়ী বাণীর অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কারণ বর্তমানে আমাদের দেশে যে-সব জটিল সমস্যার কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, সেগুলির সমাধানসূত্র তাঁর জীবন ও বাণীতেই আমরা সহজে পেতে পারি।

অনেকের ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিরক্ষর, অশিক্ষিত ছিলেন। এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। যদিও তিনি তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তবু নিঃসন্দেহে তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন এবং সর্বপ্রকার দৈনন্দিন আচারে-আচরণে তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত মনের অধিকারী ছিলেন। একথা অবশ্য সত্য যে, অর্থকরী বিদ্যার্জনের পরিবর্তে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি অধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত করেছিলেন। তবু আমরা লক্ষ্য করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপরা বিদ্যারও সমাদর করতেন। যে একটি বিদ্যাতে নিপুণ তার পক্ষে ঈশ্বর লাভ সহজ, 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'—ইত্যাদি উক্তি তাঁর উপদেশে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর নিরক্ষর শিষ্য লাটুকে (পরবর্তী কালে স্বামী অদ্ভুতানন্দ) বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই আদর্শ স্মরণ ক'রে যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি একজনকেও কিছুটা শিক্ষিত করবার চেষ্টা করেন তাহলে শিক্ষা-প্রসারের অগ্রগতি হতে পারে।

জাতিভেদের কুফলের কথা আমরা সকলেই জানি এবং বর্তমানে এই বংশগত জাতিভেদ প্রথা দূর করতে অনেকেই সচেষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি; ভক্তের জাত নেই। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতের ভক্তি থাকলে শুদ্ধ পবিত্র হয়।' তিনি নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশে জন্মেও সুবর্ণ বণিকের ঘরে খেয়েছেন এবং উপনয়নের সময় কামারকন্যা ধনীর কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর এইসব উক্তি ও আচরণের সারমর্ম এই যে, তিনি গুণগত জাতিভেদ চাইতেন, বংশগত জাতিভেদ নয়। কে কোন্ বংশে জন্মেছে, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল কে কতটা

গ্নণের অধিকারী এবং কত বেশী দেশের ও দশের সেবা করতে সমর্থ। স্নতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রদর্শিত পথে চলতে পারলে বংশগত জাতিভেদপ্রথার কুফল থেকে আমরা সহজেই মুক্ত হতে পারবো।

সদাচার ও সত্যনিষ্ঠার অভাবের ফলে কালোবাজারী, মুনাফাখোর, চোরাচালান, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক কাজ—রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের তিরিশ বছর পরেও আমাদের দেশে অব্যাহত রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'যারা বিষয়কর্ম করে—অফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও 'সত্য'তে থাকা উচিত। সত্য কথা কলির তপস্যা', 'সত্যে আঁট থাকলে ঈশ্বরলাভ হয়' ইত্যাদি। তাঁর ধাত্রীমাতা কামারকন্যা ধনীকে তিনি ভিক্ষামাতা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই উপনয়নের সময়—যখন তাঁর বয়স ন বছর—বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সে সত্য রক্ষা করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে আশ্চর্য ঘটনা রয়েছে তাঁর জীবনে। সত্যনিষ্ঠার সর্বোচ্চ আদর্শ কি হতে পারে তা তিনি নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন। সেই আদর্শের আংশিক অনুসরণ ও দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারে সন্দেহ নেই। সত্যানুরাগীর চারিত্রিক বলই আদর্শ সমাজের ভিত্তিস্বরূপ।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে যুবসমাজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তরুণেরাই দেশের আশা-ভরসার স্থল। তাদের অশেষ প্রাণপ্রাচুর্য স্নুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত পথে সুষ্ঠু পরিচালিত হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। এই যুবকদের শ্রীরামকৃষ্ণদেব খুবই ভালবাসতেন। ব্যাকুলতার সঙ্গে তাদের আহ্বান করতেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আয়!' এসেছিলেনও সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ ইয়ং বেংগল। তাঁর সান্নিধ্যে এসে নরেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ঈশ্বরতন্ময়তায় ডুবে থাকতে—নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'ছি, ছি তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজেরমুক্তি চাস!' নরেন্দ্রনাথ বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হৃদয় কত মহান্। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, নির্বিকল্প সমাধির চেয়েও উঁচু অবস্থা আছে। তিনি বলতেন: 'চোখ বুজলেই ভগবান আছেন আর চোখ খুললেই নেই'। অর্থাৎ ধ্যান বা সমাধিতে ডুবে থেকে নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন সক্রিয়, সেই জাগ্রত অবস্থাতেও সর্বভূতে ভগবানকে প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁরই সেবা করতে হবে। এইভাবে তিনি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মহিমময় দিকটি তুলে ধরলেন। যুবসমাজের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এটি চিরন্তন আহ্বান। যুবসমাজ কি সে ডাকে সাড়া দেবে না?

একবার বেরিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে সেবক মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে। বৈদ্যনাথধামের কাছে একটি গ্রামের অধিবাসীদের দুঃখদারিদ্র্য তাঁর হৃদয় করুণাপূর্ণ হল। মথুরবাবুকে বললেন, 'তুমি তো মার দেওয়ান। এদের একমাথা কোরে তেল, একখানা কোরে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।' মথুরবাবুকে ইতস্তত: করতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন 'দূর্ শালা, তোর সঙ্গে কাশী আমি যাবো না। আমি এদের কাছেই থাকবো; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাবো না।' অগত্যা মথুরবাবু তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত সব ব্যবস্থাই করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুকে মা ভবতারিণীর দেওয়ান বলতেন। ধনীরা যদি নিজেদের ধনসম্পদের একচ্ছত্র মালিক মনে না ক'রে সে ধনকে ভগবানের সম্পদ এবং নিজেদের তার অছি (Trustee) মনে করেন এবং সেই সম্পদ 'বহুজনহিতায়' ব্যয় করেন, তাহলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রয়েছে তার অবসান হতে পারে—শান্তি ও শৃংখলা বজায় রেখে।

বৈষ্ণবমতে একটি প্রচলিত কথা আছে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ভক্তদের এই কথাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সর্বজীবে 'দয়া' পর্যন্ত বলেই হঠাৎ

তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরেই অর্ধবাহ্যদশায় বলতে লাগলেন, 'জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূর শালা। কীটাণু-কীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথা সকলেই শুনে গেলেন, কিন্তু একমাত্র নরেন্দ্রনাথই তার তাৎপর্য বুঝলেন এবং তারই ফলস্বরূপ আজ তাঁর প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর সর্বত্র এই শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর্ত মানুষের ত্রাণকার্যে, রোগীদের সেবাশুশ্রূষায় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক অসংখ্য নরনারীর কাছে আধ্যাত্মিকতার উদারতম বাণী পেঁৗছে দিতে রামকৃষ্ণ মিশন নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে।

সংসারীরা কিভাবে সংসারে থাকবেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে বিষয়ে কি বলছেন তা সকলেরই জানা দরকার। তিনি বলতেন: 'একহাতে সংসারের কাজ করবে. অন্য হাতে ভগবানের পাদপদ্ম ধরে থাকবে'; 'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়, তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায় ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়', 'নৌকা জলে থাকে, কিন্তু জল যেন নৌকায় না ঢোকে। অর্থাৎ সংসারে থাকো, কিন্তু মনের ভিতর সংসার ঢুকিও না—অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকো।' এই ধরনের সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সংসারী মানুষ কি ভাবে সংসারে থাকবে। তিনি বলতেন 'মানুষ—মানহুঁস। অর্থাৎ 'যার হুঁস আছে, চৈতন্য আছে'—সেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ। যে নিজেকে হীন তুচ্ছ অকর্মণ্য মনে করে, যার নিজের উপর আস্থা নেই, সে ওই ধরনের চিন্তার ফলে ক্রমশঃ সত্যসত্যই অপদার্থ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, সে স্বভাবতই কোন হীন কাজ করতে পারে না। তার পক্ষে চরিত্রবান হওয়া সহজ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই 'মানুষ—মানহুঁস' কথাটি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটি অনুসরণ করলে একজন ছাত্র ভাল ছাত্র হবে, একজন শিক্ষক আরও ভাল শিক্ষক হবেন; উকিল ডাক্তার সেবিকা ব্যবসায়ী শিল্পী শ্রমজীবী—প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নততর জীবনের অধিকারী হবেন। তাই এই সব কথা অনুসরণ ক'রে চললে প্রত্যেক মানুষই সংসারে থেকেও যথার্থ সুখী হতে পারবেন, অপরের সুখের কারণ হবেন—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আমরা সকলেই জানি আজ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ করে ভারতে তথা এশিয়া ভূখণ্ডে। তাই বেশ কিছুকাল আগে থেকেই আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্মরণ করতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা। তিনি বলেছিলেন: 'দু-একটি সন্তান হলেই স্বামী-স্ত্রী ভগবানে মন রেখে ভাই-ভগিনীর মত সংসারে থাকবে।' তাঁর এই একটি উপদেশ আমাদের দেশ গ্রহণ করে, তাহলে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

মার্ক'স ফ্রয়েড প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীরা সমাজের মূলে নিয়ন্তারূপে অর্থ ও কামের কথাই বলে গেছেন। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহ্য তা নয়। এদেশে যুগযুগান্ত ধরে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের কথাই বলা হয়েছে। অর্থ ও কামকে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তাই ধর্মের স্থান সর্বাগ্রে। ধর্মব্যতিরিক্ত অর্থ ও কাম উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। তারপর আসে মোক্ষের কথা—চরম ও পরম পুরুষার্থের কথা। ধর্মই সেই চরম লক্ষ্যের অভিমুখে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রাচীন ভারতের এই বাণী যুগোপযোগী ভাষায় ব্যক্ত ও নিজ জীবনে মূর্ত করে গেছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবীও সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস সুদীর্ঘকাল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান ভারতীয় পন্থাতেই হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার সার্বভৌম বাণীর প্রতিও

তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। ম্যাক্সমূলার, রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ আরও পাশ্চাত্য মনীষীরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের প্রাণপুরুষ···যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ।' মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে আমাদের সহায়তা করে।' তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শত শত প্রণাম। প্রার্থনা করি—তাঁর জীবন ও বাণী যেন আমরা সর্বদা পুরোভাগে রেখে জীবনের পথে চলে অপার শান্তি ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারি, আমাদের মানব জীবন যেন সার্থক হয়।

ওঁ বন্দে জগদ্বীজমখণ্ডমেকং
বন্দে সুরাসেবিতপাদপীঠম্।
বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং
ত্বমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণম্॥
ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু॥ □

সারদাদেবী

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

সারদাদেবীর জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়েও বর্ণাঢ্য। শুধু তা-ই নয়—আরও অনেক কঠিন, আরও অনেক বিরুদ্ধতার সমাবেশ সারদাদেবীর জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনও গার্হস্থ্যজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়নি। গৃহীজীবনের পরীক্ষা এবং তিক্ততার সম্মুখীন হতে হয়নি তাঁকে। প্রকৃতির কোলের শিশু তিনি—মুক্ত, সদানন্দ, সদা হাস্যময়। পারিবারিক জীবনের জটিলতা থেকে নিজেকে সব সময় দূরে সরিয়ে রেখেছেন। আদর্শ সন্ন্যাসী তিনি। সংসারের মজা দূরে থেকে দেখতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু এর ফাঁদে যাতে জড়িয়ে না পড়েন, সে-বিষয়ে তিনি অতি-মাত্রায় সতর্ক। সারদাদেবী কিন্তু এর ঠিক বিপরীত। তিনি সংসারের একেবারে মাঝখানেই ছিলেন। আত্মীয় অনাত্মীয় মিলিয়ে বিরাট সংসার তাঁর। বিচিত্র সংসার। কেউ মহাপুরুষ—যেমন স্বামী সারদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সন্তান। কিন্তু কেউ কেউ আবার অত্যন্ত নীচ, হিংসুটে এবং স্বার্থপর। অথচ এঁদের সবাইকে নিয়ে একসাথে তিনি আছেন, একটুও মানসিক স্থৈর্য হারাচ্ছেন না। আর প্রত্যেকেই মনে করছেন 'মা' তাঁকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। এটাই সবচেয়ে বড় রহস্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ যতদিন স্থূলশরীরে ছিলেন, সারদাদেবী অন্তরালে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষার আগে সারদাদেবীকে বলেছিলেন যে, তাঁকেও অনেক কিছু করতে হবে—তাঁর চেয়েও অনেক বেশী। সারদাদেবী সম্মত হননি, সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বিশ্বাসও করেননি। কিন্তু একথার সত্যতা নিশ্চয়ই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর লোকসংগ্রহের কাজ সারদাদেবী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সারদাদেবী ধর্মগুরু, কিন্তু জগতে যত ধর্মগুরু এসেছেন, সবার চেয়ে তিনি আলাদা। তাঁর আচার্যরূপ মাতৃত্বে মণ্ডিত। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন জীবন দেখিয়ে। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। বহুলোক তাঁর কাছে এসেছে। এমন কি অবাঙালী এবং বিদেশীরাও। তিনি নির্বিচারে সবাইকে কৃপা করেছেন। সকলের মনের সংশয় দূর করে দিয়েছেন, এমনভাবে যা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর কাছে শিষ্যভক্ত যাঁরা আসতেন, বিশেষ করে তাঁর চারপাশে যাঁরা থাকতেন—আত্মীয়স্বজন—তাঁদের অনেকের ব্যবহারই বিরক্তিকর। অন্য কেউ হলে অধৈর্য হয়ে যেতেন। কিন্তু মায়ের শিক্ষাপদ্ধতি অন্যরকম। তিনি জানতেন ছেলে যদি ভুল করে, মায়ের কর্তব্য নিজে সঠিক আচরণ করে ছেলের ভুল শুধরে দেওয়া। মুখে শুধু বলা নয়—দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। মানুষের সবচেয়ে মন্দ দিকটাও তিনি দেখেছেন, কিন্তু কখনও তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাননি। তিনি জানতেন: স্নেহ-ভালবাসা পেলে, সহানুভূতি এবং সঠিক পথনির্দেশ পেলে একজন মন্দ মানুষও তার সমস্ত দোষত্রুটি দূর করে ফেলতে পারে। তিনি বলতেন: ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা-ঠাট্টা সবাই করতে পারে, কি করে মন্দকে ভাল করতে হয়, তা বলতে পারে কজন। সারদাদেবী সারাজীবন ধরে এই গড়ার কাজই করে গেছেন—মন্দকে ভাল করা; পাপীকে পুণ্যাত্মা করা, মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করা।

সারদাদেবী মানবী না দেবী? তাঁর জীবন আলোচনা করলে মনে হয় তিনি উভয়ই। তিনি মানবী—কারণ এমন মানবিকতা কোন দেবীতে দেখি না। তিনি দেবী—কারণ এতসব দৈবীগুণের সমাবেশ কোন মানুষে দেখা যায় না। সংসারে অবস্থিত, কিন্তু নিমজ্জিত নন—নির্লিপ্ত। সর্বদা কর্মব্যস্ত, কিন্তু মন ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত। সরলা গ্রাম্য নারী, অথচ ব্রহ্মবাদিনী। সাধারণ নারীর মতো জীবন কাটিয়ে গেলেও সারদাদেবীর সব কিছুই অসাধারণ। □

দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ

ডাঃ সচ্চিদানন্দ ধর

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব :

বিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সর্বজনগ্রাহ্য একটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। বর্তমান শতাব্দীতে মানুষ অধিকমাত্রায় বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মিকতা বিহীন হয়েছে—এই জাতীয় একটা অস্পষ্ট অভিযোগ সবদেশেই আছে। এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। সব দেশেই ধর্ম এবং ধর্মাচরণের আচারমূলক আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তন হয়েছে,—এবং বহুক্ষেত্রেই বিচারহীন ধর্মাচারের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উঠেছে। যুক্তি এবং বিজ্ঞান দৃষ্টিতে ধর্মের অনুষ্ঠান এবং আচারকে যাচাই করে নেবার মানসিকতাকে-ই আমরা অনেক সময় ধর্মহীনতা নামে অপবাদ দেবার চেষ্টা করেছি। আচার সর্বস্বতাকে আঁকড়ে ধরে আমরা নিজধর্মকে খর্ব করেছি—অপরের সঙ্গে ধর্মদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছি। এ যুগের সত্যসন্ধিৎসা ধর্মবোধের সহায়ক।

ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ফলশ্রুতি জীবনের রূপান্তর,—কল্যাণ এবং শান্তির পথে অভিযাত্রা। যে আচার,—যে ধর্মচর্যা ব্যক্তি জীবনকে প্রশান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে না,—যে ধর্মাচার মত এবং পথের একদর্শিতা এবং অহংকারে মদমত্ত, অন্ধ এবং সংকীর্ণ—সেই ধর্মাচারের বিরুদ্ধে যদি যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসুর সংশয় এবং বিরূপ সমালোচনা থাকে, তবে তা অবশ্যই অভিনন্দনীয়। আধুনিক মানুষ বস্তুবাদী। সন্দেহ নেই,—কিন্তু তারা কার্য্য কারণে কল্যাণ এবং শান্তিকামী নিঃসন্দেহ। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন কল্যাণ এবং শান্তির একটি মূর্ত্তরূপ। অতি বিশ্বাসী, সংশয়-বাদী এবং তথাকথিত অধার্মিকের কাছেও এই বিগ্রহের একটি বিশেষ আবেদন আছে। এই আবেদনের হেতু তাঁর জীবনের 'ত্যাগ'—যা শান্তির একমাত্র কারণ ;—এবং তাঁর 'করুণা (শিবরূপে জীবসেবা),—যা কল্যাণের একমাত্র উৎস,—একমাত্র উপায়।

ত্যাগ এবং করুণা-মহিমায় প্রশান্ত, ধ্যানস্তিমিত এই মূর্ত্তিটি—দেশ বিদেশের আপামর' জন-সাধারণের মনোহরণ করে। শ্রীবুদ্ধের পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। কালে এই জীবনের প্রভাব হবে আরও ব্যাপক এবং গভীরতর।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ভাব

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে আছে একটি ভাব। এই ভাবকে প্রাত্যহিক জীবনে আবাহন করেই আমরা ব্যক্তিগতভাবে কৃতকৃতার্থ হতে পারি ;—পরিবারকে শান্তির নীড় করতে পারি ; সমাজকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ-বিহার করতে পারি ;—দেশ এবং রাষ্ট্রকে অকুতোভয় এবং বিশ্বমিত্ররূপে পরিণত করতে পারি।—বিশ্বকে প্রেম এবং মৈত্রীতে "এক" করতে পারি। বর্তমান বস্তুবাদী মানুষও

তাই চায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করেও যদি কেউ তাঁর 'ত্যাগ' এবং সেবার ভাবকে গ্রহণ করে তা'হলেও ব্যক্তির শান্তি এবং বিশ্বের কল্যাণ সুনিশ্চিত।

শান্তিকামী মানুষ মাত্রেই অধ্যাত্মবাদী। একমাত্র ব্যক্তিগত শান্তিমাত্রই যদি কারও কাম্য হয়—তা' হলে ও সে অন্যের শান্তি এবং কল্যাণেরই প্রেরণা হয়ে উঠবে। শান্তি চায় না—এমন মানুষ নেই। সুতরাং মানুষ মাত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধ্যাত্মবাদী। এই শান্তিলাভের প্রেরণাকে জাগরিত করা এবং শান্তির পথকে প্রদর্শন করাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সাধনার মূল তাৎপর্য।

এই শান্তির অন্বেষায় চৈতন্য প্রদানই শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ

কয়েকজন অনুগত ভক্তের প্রতি করুণায় প্রসন্ন হয়ে তাঁর মানবলীলা সম্বরণের কিছুদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ যে আশীর্বাদ করেছিলেন, তা' হলো—"আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ—উদ্বোধন, ১৩২৫, পৃঃ ৩৭৪)। আমরা শান্তিকামী হলেও শান্তির স্বরূপ এবং শান্তিলাভের পন্থা সম্পর্কে আমাদের 'চৈতন্য' নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মাধ্যমেই আমরা গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাসজীবনে যথার্থ শান্তির সন্ধান পেতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্বাদ শুধু তাঁর সমকালীন বিশেষ কয়েকজন অনুগত গৃহী ভক্তের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়নি। "তোমাদের হোক" বলতে—বিশ্ববাসীর চৈতন্যকেই লক্ষিত হয়েছে।

শ্রীমা সারদাদেবীও শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনকে,—তাঁর জীবন এবং বাণীকে বিশ্ব-চৈতন্যের হেতু বলেই বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। শ্রীম যখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রকাশ করেন শ্রীমা লিখলেন—"এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত, না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে।"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। প্রথমভাগ)

ত্যাগভিত্তিক, শান্তিলক্ষ্য অধ্যাত্ম সাধনার একটা সর্বজনীন রূপ আছে। মত-পথের বিচিত্রতার এবং পার্থক্যের ঊর্ধ্বে এই সনাতন ধর্মের ভিত্তি। ব্যক্তিচৈতন্য এবং বিশ্বচৈতন্য উৎপাদনের জন্যই অবতার পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রয়োজন সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

"দেশ-কালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কাল বশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন, ১৩৬৯ পৃঃ ৫)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধিত আধ্যাত্মিক ভাব ভারতের এবং বিশ্বের কল্যাণের হেতু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব পূর্ব অবতারগণেরই সংস্কৃতও যুগোপযুক্ত প্রকাশ মাত্র।—"এই নব যুগ ধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগ ধর্ম প্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম প্রবর্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ।" (তদেব, পৃ ৬)।

বর্তমান যুগ-মানসের উপযোগী সর্বদেশীয় মানব সমাজের ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগত সমস্যার সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সাধনার মধ্যেই নিহিত আছে। প্রাত্যহিক জীবনচর্যার মধ্যে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে হবে এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং পন্থানির্দেশক হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। "নরেন শিক্ষে দেবে"—অর্থাৎ নরেন আমার ভাবকে যথাযথ ব্যাখ্যা ও প্রচার করবে'—এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের লিখিত নির্দেশ। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনায় ব্যক্তি ও সমাজজীবনের আদর্শ

"ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু"—"ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য"—এই মহাবাক্যটি শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১ম উদ্বোধন-পৃঃ ৪৬৫)

ঈশ্বর সর্বস্বতাই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদের প্রণব মন্ত্র। এর উপলব্ধির মধ্যেই জীবনের চরিতার্থ তা শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরভাবনা জীবনের মৌলিক সত্তারেক উপলব্ধিকে লক্ষ্য করে আবার জৈব প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে না। রাষ্ট্র এবং সমাজ যখন একমাত্র বস্তুতন্ত্রতার মাধ্যমেই জীবনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে—সেখানে একধাপ এগিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে এর সমাধানের যথার্থ সূত্রটি ধরিয়ে দেন। জীবকে আগে বুঝতে হবে সে শুধুমাত্র উদর সর্বস্ব নয়—উদরের উপরে আছে হৃদয়—আছে মস্তিষ্ক—তার উপরে আছে তার আসল সত্তা। জীবনের সমস্যা হল আত্মস্বরূপের—আসল সত্তার বিস্মৃতি। এই স্বরূপ-চেতনা লাভই জীবনের উদ্দেশ্য,—ইহাতেই সকল সমস্যার সমাধান। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ—"তোমাদের চৈতন্য হউক।"

নিম্নদৃষ্টি পোকার মত কিলবিল করা লোকের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা

আমরা সাধারণ মানুষ নিম্নদৃষ্টি। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার মাধ্যমেই আমরা জীবনকে কৃতকৃতার্থ-বোধ করতে চাই। তাই উদর সংস্থানের জন্য—এবং যাদের উদরের চিন্তা নেই তারা নাম যশ ইত্যাদির জন্য দিবারাত্র ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখনই কলকাতা শহরে যেতেন তখনই সহরের লোকজনের কর্মব্যস্ততা এবং উদ্দেশ্যহীন বিচিত্র কর্মজালের আবেষ্টনী দেখে কাতর হতেন। অথচ তখন কলকাতা শিক্ষা-সংস্কৃতি, বাণিজ্য-রাজনীতি এবং ভোগ-চর্চার বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল। তথাকথিত শিক্ষিত এবং ধনীলোকদের নিজেদের বিদ্যা এবং ধনের অহমিকাও ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে এই সব ভোগলিপ্ত দেহসর্বস্ব ঈশ্বরবিমুখ মানুষগুলো ছিল নিম্ন দৃষ্টি! তাদের আনন্দমত্ততা ছিল তার কাছে ক্ষতদেহের বা গলিত পচা জিনিষে জাত পোকার আনন্দের অভিব্যক্তি কিলবিল করার মত।

তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বহু সন্তান পূর্ণ, বহু সম্পদ সজ্জিত আবাসকে রজোগুণীর ভোগের নিকেতন রূপেই দেখেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহু পাণ্ডিত্য গভীর দয়া সত্বেও বলেছেন—"সোনা চাপা আছে, আসল জিনিষের খপর নাই।" নন্দবসু আর যদুমল্লিকের রাজ-প্রাসাদকে দেখেছেন ইটপাথরের স্তূপ। পাণ্ডিত্যজ্ঞানে গর্বিত ঈশ্বরবিমুখ পণ্ডিতদের তুলনা করেছেন চিল-শকুনের সঙ্গে। ভোগের লোভে ধর্ম-ত্যাগী মধুসূদনের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতে তাঁর প্রবৃত্তি হয় নি। মো-সাহেব পরিবৃত্ত যদুমল্লিককে ঈশ্বর প্রসঙ্গ বিমুখতার জন্য তিরস্কার করেছেন। পরিহাস হলেও, বঙ্কিমের মুখে 'মানব জীবনের উদ্দেশ্য আহার নিদ্রা-'ইত্যাদি—শুনে তাঁকে ভৎর্সনা করেছেন। কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ ঈশ্বর প্রসঙ্গ করেন বলে বার বার তাঁদের সঙ্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ধর্মজিজ্ঞাসু থিয়োসফিষ্ট শ্যাম বসুকে সহানুভূতির সঙ্গে ধর্মকথা শুনিয়েছেন। ভক্ত ভগবানের সংসার, ভক্ত বলরামবসুর গৃহকে মন্দির জ্ঞানে নিজের বৈঠকখানা করে নিয়েছেন। জগন্নাথকে নিবেদিত অন্নকে পবিত্র জ্ঞানে গ্রহণ করেছেন। সত্ত্বগুণীর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—গৃহের আসবাবের চাকচিক্য বা বাহ্য পোষাকের পারিপাট্য নেই,—আহারে বিহারে সারল্য। অধিক অর্থোপার্জনের জন্য অন্যের তোষামোদ বা মো-সাহেবীর নিন্দা করেছেন। ঘুষ নেওয়াকে ঘৃণা করেছেন—অন্যায়ভাবে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা ক্রীত মিষ্টান্নের দিকে হস্ত প্রসারিত করেই ফিরিয়ে এনেছেন,—অপবিত্র দানকে গ্রহণ করতে পারেন নি। ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী ভক্তদেরও সৎভাবে অর্থোপার্জ্জনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। জুলুম করে রোগীর কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত অর্থরোজগারী ডাক্তার-ধাত্রীর দানকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। ভক্তিসঙ্গীত

পারদর্শী ভক্ত ও জিজ্ঞাসু বিদ্যাসুন্দর যাত্রাওয়ালার সঙ্গে আপনজনের মত ধর্মালোচনা করেছেন। নন্দবসুর প্রাসাদ থেকে রাজ আতিথ্য পেয়ে শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর জীর্ণগৃহের ধর্মীয় পরিবেশে ভক্তির আতিথ্যকে অধিক প্রিয় রূপে গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মণীর ভাইয়ের সরল ভক্তের জীবনকে প্রশংসা করেছেন। এঁরাই তখনকার কলকাতার নাগরিকদের প্রতিভূ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক কালের কলকাতার বিভিন্ন স্তরের গৃহস্থের সঙ্গে মিলনের চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি গৃহীদের বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে কত গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন—এবং তিনি তাঁদের চৈতন্য-উদয়ের জন্য কিভাবে তাঁদের অনুপ্রাণিত করতেন। সমাজের অবহেলিত এবং নিজেদের স্বভাব দোষে দুষ্ট নাগরিকদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁদের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি এবং আশীর্বাদ। সমাজের প্রতিস্তরের মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তাঁদের অধ্যাত্ম জীবনের সন্ধান দেওয়াই ছিল তাঁর জীবন ব্রত।

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ আমাদের দ্বারে এসেছেন

শ্রীরামকৃষ্ণ যতদিন মানবদেহে সক্ষম ছিলেন ততদিন তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করে কলকাতার নাগরিকদের দ্বারে দ্বারে অযাচিত এবং অবহেলিত হয়েও বার বার আসতেন—তাদের ধর্মীয় চৈতন্য উৎপাদনের জন্য,—তাদের পারিবারিক শান্তি এবং সামাজিক কল্যাণের জন্য। তিরোধানের একশ বছরের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছে আমাদের দেশের প্রতিগৃহে,—বিদেশের ও সত্য সন্ধানী বুদ্ধিজীবিদের বুদ্ধিতে—এবং অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুর আধ্যাত্মিক জীবনে। চিত্র এবং ভাবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সর্বত্র।

তাঁর জীবদ্দশায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই নিজের ছবির পূজা করেন—দক্ষিণেশ্বরের নহবতে শ্রীমা সারদাদেবী এবং লক্ষ্মীদি যে ছবিকে পূজা করতেন। নিজের ধ্যান স্তিমিত নয়নের সমাহিত চিত্রকেও তিনি আধ্যাত্মিক ভাবের বিশেষ প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন। কাশীপুরে তিনি স্বামী সারদানন্দজী প্রমুখকে নিজের ছবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন—ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি—কালে এই মূর্তির ঘরে ঘরে পূজা হইবে—(শতরূপে সারদা—রামকৃষ্ণ মিশন ইনিষ্টিটিউট অব কালচার, ১৯৮৫ পৃঃ ১২-১৩ চিত্র সম্পর্কিত তথ্য)। একথা আজ বাস্তবে রূপায়িত!

চিত্ররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ আজ প্রতি গৃহেই শুধু নন,—হাটে-বাজারে, দোকানে, বাসে-পণ্যর ট্রেডমার্কে বিরাজ করছেন। এই একশ বছরে তিনি নিজেই নিজের প্রচার করে চলেছেন। রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশন,—অথবা ধর্মীয় কোন সংস্থা রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের ছবি প্রচারের জন্য তৎপর হন নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাধারণ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিকে নিজ কল্পনামত—বিশেষত মা কালীকে সঙ্গী করে ছাপিয়ে বিক্রি করছে। ক্যালেণ্ডারে এবং গৃহ সজ্জার চিত্র হিসাবেও রামকৃষ্ণ চিত্রটি খুবই জনপ্রিয়। শিখ বাস ড্রাইভার বা মালিক—অথবা মুসলিম দোকানী, জৈন ব্যবসায়ী —বৈষ্ণব শাক্ত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছেই রামকৃষ্ণের ছবি এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত খুবই প্রিয়। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রাতঃকালীন সুভাষিতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর প্রাধান্য এবং জনপ্রিয়তা লক্ষ্যণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সুভাষিত শুনে দিনটি আরম্ভ হলো মনে হয় দিনটি শান্তি-পূর্ণই হবে,—শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ভোরবেলা দর্শন করলে মনে একটা প্রশান্তভাব আসে—যা দিনের প্রতিটি কাজে একটা শুভ প্রেরণা এবং উৎসাহ দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তা এবং কর্মের নিয়ন্তা হলেই আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবন সার্থক এবং শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগীর পরিচয় কি ?

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপটের, তাঁর সর্ব ধর্ম সমন্বয় ভাবের এবং তাঁর নরনারায়ণ সেবার মহৎ আদর্শের জনপ্রিয়তার কথা জানি। আমরা তাঁর বিষয়ে বিশেষ কিছু পড়াশুনা না করেও শুধু ভাল লাগে বলে তাঁর ছবির সম্মান করি। গল্প কথায়, নানা সিনেমা থিয়েটারে বা দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির দর্শন করতে গিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক অলৌকিক কাহিনী শুনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হই।

আবার বুদ্ধিজীবী হিসাবে বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ করে ভারতের ও বিশ্বের সামাজিক রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে চর্চা ও চিন্তা করি। আধুনিক প্রগতিশীল রাজনীতি ও অর্থনীতির চিন্তায় বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের তুলনামূলক আলোচনা বুদ্ধিজীবী মহলে আগ্রহের সঞ্চার করেছে। রাশিয়া এবং চীনদেশের রাষ্ট্রীয় ভাবনার বিশেষ ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ বেদান্তভিত্তিক মানবতাবাদের তুলনামূলক আলোচনা হয় বলে আমরা গর্ব-অনুভব করি। শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে, বহু সভাসমিতি ও সেবামূলক কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছে। এঁদের সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নামে বহু আশ্রম, সমিতি, পাঠচক্র, সেবায়তন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের সভাসমিতির ঘোষণায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্পর্কিত আলোচনার বিজ্ঞপ্তি রামকৃষ্ণের জনপ্রিয়তাকেই প্রমাণ করে। এর উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী।

আর এক শ্রেণীর শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী আছেন যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্ট বা আরাধ্য মনে করে—অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ আদিষ্ট বিশেষ কোন পদ্ধতিকে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য অবলম্বন করেছেন। তাঁরা রামকৃষ্ণ মঠের সংঘ গুরুদের কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে গুরু আদিষ্ট পদ্ধতিতে উপাসনা এবং নিত্যকর্মাদির অনুষ্ঠান করে থাকেন। এঁরা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দীক্ষিত, বিশেষ চিহ্নিত অনুরাগী বা "ভক্ত"। সাধারণভাবে—যাঁরা শুধুমাত্র ছবিকে ভালবাসেন বা যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের তাত্ত্বিক দিকের আলোচনা করেন, যাঁরা তাঁর বাণীকে শ্রদ্ধা করেন যাঁরা তাঁর সেবাকার্যকে গ্রহণ করেন—অথবা যাঁরা তাঁর ভাব এবং মূর্তিকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করেন—তাঁদের সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী। তবে যাঁর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, প্রেম, অনাসক্তি ঈশ্বর পরায়ণতা, সর্বমতসহিষ্ণুতা—প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণের বিকাশ হবে যত বেশী তিনিই হবেন সেই পরিমাণে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী।

প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুভব

'ত্যাগীশ্বর' 'নরবর' শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রাত্যহিক চিন্তা এবং কার্যে প্রয়োগ করবার প্রেরণা দিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান বা দেবতার আসনে বসিয়ে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করেই যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সমাপ্তি করি তা হলে আমরাও বঞ্চিত হব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও যথাযথ সম্মানিত হবেন না। স্বয়ং ভগবান হলেও নররূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচর্যার অনুসরণ এবং অনুকরণেই আমাদের জীবনের শান্তি,—সকল সমস্যার সমাধান। ভগবান বা পূর্ব পূর্ব অবতারের স্বরূপ এবং কার্যাবলী আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়। তাঁদের অনুকরণ ও কষ্টসাধ্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা-সারদাদেবী এবং তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ যে জীবনচর্যা দেখিয়ে গেছেন—তাঁকে আমরা অনুসরণ করবার চেষ্টা অনায়াসেই করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার যুগ্ম জীবন সনাতন হিন্দুর আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ গার্হস্থ্য এবং ত্যাগৈকলক্ষ্য সন্ন্যাসজীবনের সম্মিলিত পরিপূর্ণ রূপ। এই যুগ্মজীবনের প্রাত্যহিক চর্যার অনুকরণই আমাদের সাধনা।

ভারতীয় জীবনচর্যায় বর্ণাশ্রম ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে ধাপে ধাপে যোগ্যতানুসারে ত্যাগের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়ে তাঁকে যথার্থ শান্তি ও আনন্দের অধিকারী করা। গার্হস্থ্য জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আমাদের আরাধ্য, প্রিয় বা ইষ্টরূপে আসবেন তখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে তাঁর বিগ্রহ এবং চরিত্রের পূজা এবং ধ্যান করে আমরা তাঁর মত কতটা ত্যাগী, সরল, মানবদরদী, ঈশ্বরবিশ্বাসী—এবং সর্বতোভাবে সংসার-অনাসক্ত হতে পেরেছি। আর, যে পর্যন্ত না আমরা তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভক্তি-বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী হতে পারছি সেই পর্যন্ত আমাদের জীবনের শান্তিও

নেই—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবলে আমাদের পরিচয় দেবারও অধিকার নেই। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের জীবনচর্যার 'মডেল' বা ছাঁচ করতে হবে। তিনি যা' যা' করেছেন বা অনুগত গৃহী ও সন্ন্যাসীদের যা' যা' করতে বলেছেন—তার অনুষ্ঠান করেই আমাদের জীবনের সমস্যাকে দূর করে স্থায়ী শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তিনি আমাদের দুর্বলতা এবং বিষয়াসক্তির কথা ভালভাবেই বুঝতেন। তিনি নিজে যা' করেছেন তা' 'ষোলআনা', তাঁর হুবহু অনুকরণ আমাদের অসাধ্য,—তা' তিনি জানতেন। তাই তিনি আমাদের অন্ততঃ 'এক টাং'-ও করতে বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী অনুগামী,—উভয়েরই উদ্দেশ্য এক

শ্রীরামকৃষ্ণের মানবদেহে অবস্থানের কাল থেকেই তাঁর জীবন-সান্নিধ্যে আগত ভক্তদের দুটি থাক্ বা শ্রেনী লক্ষিত হয়। এক, যাঁরা গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ত্যাগ-বৈরাগ্যকে জীবনের শান্তির একমাত্র উপায় জেনে—জীবনের প্রথম থেকেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণে সংকল্প করে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশে নিজ নিজ অধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী হন। এই সকল তরুণ যুবা-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের কেন্দ্র করেই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মঠ বা সঙ্ঘ স্থাপন করেন। অপর পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত বহু গৃহস্থভক্তও নিজে এবং সবান্ধব এবং স্ব-পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত ত্যাগের পথে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে ব্রতী হন। গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই উদ্দেশ্য এক,—শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগময় জীবনের অনুসরণে আধ্যাত্মিক সাধনা।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী এবং গৃহী উভয় সন্তানকেই সমভাবে আহ্বান করেছেন—তাঁর ত্যাগ ও সেবার ভাবকে গ্রহণ করে নিজ নিজ জীবন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও সেই কাজের সহায়ক হবার জন্য। সেই হিসাবে গৃহী এবং সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই—এবং শ্রীরামকৃষ্ণভাবকে জীবনে রূপায়িত করার এবং পরের মধ্যে সেইভাবকে সঞ্চারিত করার দায়িত্ব গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয়ের উপরই সমানভাবে আরোপিত হয়েছে।

সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার জন্য স্বামীজী মঠের নিয়মাবলী প্রনয়ণ করে দিয়ে-গেছেন—যার অনুশাসনে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্য সেবাময় ভারতের সনাতন আদর্শকে উজ্জ্বীবিত রেখেছেন। সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সদস্য হয়ে—তার নিয়মশৃংখলায় দৃঢ়বন্ধ ত্যাগী-ভক্তের জীবন নির্বাধেই চরমসত্য এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে,—যেমনটি শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন এবং যেমনটি স্বামীজী বুঝেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রত্যেক সাধুর প্রতিটি কর্মই আধ্যাত্মিক সাধনারই বিশেষ 'কৃত্য'। কর্মে আর পূজায়,—বাহ্যতঃ জগদ্ধিতের চেষ্টায় ও ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। প্রতিক্ষণ সচেতন থেকে, বিরাট বিপুল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক যোগ-সাধনা—জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়। প্রাত্যহিক জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণকে যথাযথ স্মরণ করেই চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ।

সঙ্ঘই গৃহীর আদর্শ—কর্ম ও চিন্তার নিয়ামক

গার্হস্থ্য জীবনের অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে নিয়মবন্ধ করে চলা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী হতে গেলে—জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে সেই পথে চলতেই হবে। লক্ষ্যকে নিজের দুর্বলতা বা অপারগতার জন্য কখনও ছোট করা চলবে না। গৃহীভক্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পর্ক যত গভীর হবে—ততই গৃহীর কল্যাণ। যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশকে—ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণে অপারগ হই তখনই শরণ নিতে হবে সঙ্ঘের। সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশাই গৃহীর পক্ষে একটি পরম আধ্যাত্মিক মহৌষধি। অনেক গৃহী ধর্ম জিজ্ঞাসু শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করতেন, "মশায়, আমাদের উপায় কি?"—উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন—"উপায়,—সাধুসঙ্গ ও নির্জ্জন বাস।" শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে এবং বহু শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত প্রাইভেট্ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির আছে। সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে গৃহীভক্তেরা নিয়ম-

মত গেলে মানসিক শান্তি পাবেন নিঃসন্দেহ। যে সকল গৃহীর সংঘ বা মন্দিরের সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগ রাখা সম্ভব তাঁদের রামকৃষ্ণ-চিন্তা অনায়াসলভ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দীক্ষাপ্রাপ্তদের দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনা

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কিভাবে জীবন যাপন করলে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবন সুস্থ, সুশৃংখল এবং শান্তিপূর্ণ হবে তার সুস্পষ্ট এবং বাস্তবধর্মী নির্দেশ রয়েছে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর নিজেদের জীবন চর্যায় এবং তাঁদের সরল সহজ উপদেশের মাধ্যমে। জীবনে শান্তি লাভের জন্যই অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য পরম্পরার মধ্যে, সংঘের সন্ন্যাসী গুরুর মাধ্যমে একটা উচ্চতর জীবনদায়ী আধ্যাত্মিকতার ভাব এখনও জীবন্ত আছে। বর্তমানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সংঘ গুরু এবং সংঘ নির্বাচিত অন্য দুই বা তিন সহ-সংঘ-গুরু আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে আগ্রহী ও সাহায্য প্রার্থী দীক্ষার্থী ভক্তকে দীক্ষার উদ্দেশ্যাদি বিচার করে আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই দীক্ষা দিয়ে থাকেন। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের পরম্পরার অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিকতার উন্নতি করতে চান তাঁদের প্রতিদিনের চিন্তায় মনে রাখতে হবে--"ঈশ্বর লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।" "ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম, উদ্বোধন)

ঈশ্বর নির্ভর জীবনযাত্রা

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মূল সুরই হল—বিষয়ে অনাসক্তি, ত্যাগ। তিনি যাকে, 'অবস্তু' বলেছেন তা'হল যার স্থায়ী মূল্য নেই—যা' চিরন্তন শান্তির পথে সহায়ক নয়—যা' বাধাস্বরূপ। ত্যাগ একটা নেতিবাচক ক্রিয়া বা ধারণা। ঈশ্বর নির্ভরতা—একটা অস্তি বাচক ক্রিয়া। ঈশ্বরভাবনা যুক্ত কার্য্য এবং চিন্তা যেখানে উপস্থিত সেখানে প্রতিদিনের দুঃখ বেদনা শোকতাপ মানুষকে বিচলিত করতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাস যদি 'আফিং-এর নেশা'-ও হয় তা'হলেও লাভ,—কারণ এই বিশ্বাস আমাকে দৈনন্দিন দুঃখ বেদনা মান অপমানের গ্লানি থেকে রক্ষা করবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন সংসারে দাসীর মত থাকতে,—অনাসক্তভাবে সংসার কার্য করতে। তাঁর উপদেশ—

"সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।" "ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ—এ সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৯৩ বাং পৃঃ ২০-২১)

ঈশ্বর বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা—(আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিলেও)—হল প্রাত্যহিক দুঃখ বেদনায় অবিচল থাকা যায়।

অর্থোপার্জন,—অর্থ প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতা,—সার্থকতা

গার্হস্থ্য জীবনে অর্থের প্রয়োজন। প্রত্যেক গৃহীরই অর্থোপার্জন করা অবশ্য কর্তব্য। সংসার করে, সংসারের জন্য অর্থোপার্জ্জন ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ না করার জন্য তিনি প্রতাপের ভাইকে ভর্ৎসনা করেছেন। বৈরাগ্যের যথার্থ অধিকারী নয় বলে তিনি সংসারী প্রতাপের ভাইকে আবার অর্থোপার্জ্জন করে যথাযথভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে বলেছেন।

"অনেক বকলুম, আর কাজকর্ম খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যায়।"

(তদেব পৃঃ ১৭)

অর্থের প্রয়োজন থাকলেও, মাত্রাতিরিক্ত অর্থোপার্জনের জন্য লালায়িত হওয়া, অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করা—এবং ভোগের উপাদান বৃদ্ধির জন্য অর্থের ব্যবহারকে তিনি নিন্দাই করেছেন।

গরীব দুঃখী ও সাধুজনের সেবায় অর্থদানকেই তিনি অর্থোপার্জনের সার্থকতারূপে গণ্য করেছেন। কাঞ্চন বা অর্থের বিচার প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন,—

"টাকায় কি হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্য্যন্ত।··· তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।—এর নাম বিচার"—(তদেব পৃঃ ২১)

বেণী পালের বাগানে উৎসব উপলক্ষে সাধু ও ভক্তদের সেবায় বেণী পালের অর্থব্যয়কে প্রশংসা করেছেন। বলছেন,—"আজ খুব আনন্দ হলো। দেখ অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার। ধন্য তুমি। এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম কথিত, ১।১২ পৃঃ ১৬৪, ১৩৭৫ বাং)

মণি প্রশ্ন করছেন, "আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশি হয় এ-চেষ্টা কি করতে পারি ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম খণ্ড উদ্বোধন, পৃ ৬৭)

অর্থ-কৌলিন্যের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী ভক্ত হিসাবে আমাদের অর্থোপার্জন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের এই-উক্তিকে প্রতিদিনই স্মরণ করে চলতে হবে।

লোকনিন্দায় উপেক্ষা—দুর্জন থেকে আত্মরক্ষা

অনেকের মনে মনে ঈশ্বরভক্তি বা দেবদেবীর উপর বিশ্বাস থাকলেও প্রকাশ্যে তার আচরণ এবং ভক্তির প্রকাশ করতে লজ্জা এবং সংকোচবোধ করেন—"পাছে লোকে কিছু বলে"—এই মনে করে। বিষয়াসক্ত সংসারী লোকেরা ধর্মবিশ্বাসী লোকদের উপহাস করে। আর সংসারে বহু দুষ্ট লোক আছে যারা অহেতুক শান্তিপ্রিয় নিরীহ ব্যক্তিদের অনিষ্ট করতে উদ্যত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয় এবং দুর্জন সংসর্গ পরিহার করবার শিক্ষা দেয়। এই সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন,—

"ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে ; মন্দলোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়।" এই সম্পর্কে তাঁর হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণের গল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে। (তদেব পৃঃ ২৩)

"লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখানো দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে উলটে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।" (তদেব, পৃঃ ২৮)।

"দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।" (তদেব, পৃঃ ২৫)

অনাসক্তভাবে,—নিষ্কামভাবে সংসার ধর্ম পালন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে মুখ্যতঃ গৃহস্থ ভক্তদের জন্য উপযোগী উপদেশাবলী সংগৃহীত আছে। গৃহস্থ আর সন্ন্যাসীর আদর্শ এবং উদ্দেশ্য অভিন্ন। সংসারীরা যাতে হতাশায় দুর্বল না হয়ে পড়েন, যাতে তাঁরা সংসারে থেকেই ত্যাগের পথে অগ্রসর হতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে পরমহংসদেব গৃহস্থদের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

"সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা' না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ শ্রীম, ১৩৭৭ সং পৃঃ ৪৪)

সংসারে থেকে যদি ঈশ্বরকে ভুলে থাকা যায় তবে—ধর্মার্জন মোটেও সম্ভব নয়। কর্ম করতে করতে কর্মের আসক্তিকে ত্যাগ করে সর্বতোভাবে (দুই-হাতে) ঈশ্বরকে ধরতে হবে। দুই হাতে অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বিষয় বিরত হয়ে ভগবানকে ধরতে পারলেই মুক্তি, অন্যথা নয়। এই সম্পর্কে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য যে বিধান, গৃহীর জন্যও সেই ব্যবস্থা। বিকল্প বা 'সহজপাঠ,'—"মেড্-ইজি"—কিছু নেই। সন্ন্যাসীই হই, গৃহীই হই সেই অনাসক্তির দিকে—মায়ের কথায়—"নির্বাসনার" পথে অগ্রসর না হলে শান্তি হবে না। প্রাত্যহিক জীবনে রামকৃষ্ণ ভক্তকে এই নির্বাসনা হবার—অনাসক্ত হবার সাধনাই করতে হবে।

নির্বাসনা হবার অন্যতম উপায় ভক্তি, বিশ্বাস ও শরণাগতি

জ্ঞানযোগ সাধনায় নির্বাসনা বা অনাসক্ত হওয়া যায়। বিচারের দ্বারা 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এইরূপ বোধ জন্মে। কিন্তু পরমহংসদেব গৃহীদের জন্য—"নারদীয় ভক্তির"—কথা, "অহৈতুকী ভক্তির কথা পুনঃ উচ্চারণ করেছেন। নিজের সাধনার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন,—"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। 'মা আমায়' শুদ্ধা ভক্তি দাও।" (তদেব, পৃঃ ৪৬) কি করে ভক্তি প্রার্থনা করতে হয়—তা'ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিখিয়ে দিয়েছেন—

"কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণগান করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা; "হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।' কর্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম রেখেছো সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে করতে পারি। আর যেন বেশী কর্মে জড়াতে না ইচ্ছা হয়।" (তদেব পৃঃ ১২৭) ভক্তির সঙ্গে অনাসক্তি ও প্রার্থনা করতে হবে। অনাসক্ত এবং ঈশ্বরনির্ভর হতে পারাই ভক্তের লক্ষণ।

"জীব ঈশ্বর চিন্তা করে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়; সংসারে আসক্ত হয়।"

"ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; তাই এতো কর্মভোগ।" (তদেব পৃঃ ১৫৮)

সত্যনিষ্ঠা—"সত্যই কলির তপস্যা"

সত্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান সমাজ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্য স্বরূপত্বকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নাই বললেই চলে। প্রাত্যহিক জীবনে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আমরা সত্যকে অবহেলা করে চলেছি। 'সম্যক বাক্, ও সম্যক আজীব—প্রসঙ্গে শ্রীবুদ্ধ যে সত্যভিত্তিক জীবনকে ধর্মলাভের সোপান বলে বর্ণনা করেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাকেই আর ও গুরুত্ব দিয়ে নিজ জীবনে সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। তিনি সত্যই কলির তপস্যা বলেছেন। সাধন সিদ্ধির পর জগন্মাতার চরণে সব কিছু বিসর্জন দিয়েও সত্যকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। মন মুখ এক হওয়াই সত্য সাধনা। মুখে যা উচ্চারিত হবে কার্যেও তাই হবে। অথবা যা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে ধারণা তা থেকে বিচ্যুতি চলবে না। সত্য ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের স্বরূপ। সত্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ,—

"মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়।"

"এমনকি, যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়।" (তদেব পৃঃ ৮৪)

"সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার শ্রীচরণে জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, ভাল-মন্দ, পুণ্য-পাপ—সব বিসর্জন দিয়ে তাঁর

চরণে একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই প্রার্থনা করেছিলেন। "সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম না।" (তদেব পৃঃ ১০৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে এই সত্যসাধনার কথা প্রাত্যাহিক জীবনে স্মরণ রেখে চলতে হবে। অনেকে মনে করেন এযুগে সত্যনিষ্ঠ হয়ে চলা কঠিন এবং সত্যপরায়ণ হলে বৈষয়িক ক্ষতি হয়। এই প্রচলিত মিথ্যা ধারণার মূর্ত প্রতিবাদ সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ।

নির্জনবাস ও সাধুসঙ্গ—অনাশক্তি লাভের উপায়

গৃহী ভক্তেরা অনেক সময় প্রশ্ন করলে গার্হস্থ্য জীবনে ধর্মলাভের উপায় প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—

"তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।" "হয় নির্জনে বাস, নয় সাধু সঙ্গ।" যেখানে আশ্রম, ঠাকুরমন্দির, এবং সাধু সন্ন্যাসীরা বাস করেন—গৃহীদের পক্ষে সেইসব স্থানে গিযে কিছু সময়ের জন্য হলেও ঈশ্বরচিন্তা এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করলে মনের বৈষয়িক চিন্তা ক্ষণিক হলেও দূর হয়। মনে একটা প্রশান্তি অনুভব হয়। "দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাক।" (তদেব, পৃঃ ১৭১)—মহিমাচরণকে ঠাকুর এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

শুধু রামকৃষ্ণ মঠের দীক্ষিত ভক্তদের দৈনন্দিন জীবন চর্যায় নয়,—যে কোন মানুষের প্রতিটি কার্য্য এবং চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধ ত্যাগ, ভক্তি, জীব-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা—সরলতা, সর্বত্র সমদর্শিতা, সর্বধর্মীয় মত এবং পথের প্রতি শ্রদ্ধা—প্রভৃতিব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুধ্যান ব্যক্তির এবং সমষ্টির কল্যাণেরই হেতু হবে। তাঁর চিত্রপট দর্শনে এবং তাঁর নাম মাত্র স্মরণে মানুষের অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স উভয় লাভই হয়—এইরূপ আশ্বাস ও তাঁরই শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর কৃপা আমাদের জীবনকে কল্যাণশ্রীমণ্ডিত করুক। □

ইতিহাসের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রেমবল্লভ সেন

ইতিহাসের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে মানব সমাজের জীবন ধারা কালক্রমের আবর্ত্তনে নানা রূপ ধারণ করে। মানুষের মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করে আমরা সেই রূপান্তরের অধ্যায়-গুলিকে সৌভাগ্যপূর্ণ অথবা দুর্ভাগ্যপূর্ণ বলে থাকি।

গুহাবাসী মানব বিভিন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ সহোযোগিতায় পারিপার্শ্বিক প্রতিকুলতা ও বলবান পশুকুলের আক্রমণ এবং গ্রাসাচ্ছদনের সমস্যার সমাধান করে ক্রমে ক্রমে পরিবার গঠন, গ্রাম ও নগরের পত্তন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়ে উন্নততর জীবনের পরিবেশ তৈরী করছে এটাই ইতিহাসের মূল ঘটনা। এই সৃষ্টিকার্যে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তেমনি বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ একটি ভূমিকাও আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের জৈবিক প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করবার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বা সমাজের ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু জীবনের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, শোভন-অশোভন কি তা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মূল্যে বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভাব বা আদর্শ একটি ব্যক্তিকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয় এবং ক্রমে তা সমগ্র সমাজে প্রসার লাভ করে। বুদ্ধের আবির্ভাব না ঘটলে বৌদ্ধ যুগের এবং খৃষ্ট না আসলে খৃষ্ট ধর্মের প্রসার সম্ভব হত না। একই ভাবে মার্ক্সকে বাদ দিয়ে মার্কসবাদের প্রভাবের কথা চিন্তা করা যায় কি? অতএব জীবনাদর্শ ও মূল্যায়নের জগতে ব্যক্তির দানই অপরিহার্য উৎস।

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যুগে যুগে মানুষের সকল কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে দুটি মূল সুর বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে। একটি মিলন, ঐক্য বা সৌভ্রাত্রের সুর, আর অপরটি পীড়ন প্রভুত্ব ও ধ্বংস সাধনের সুর। ধর্ম্ম, দর্শনে, সাহিত্য, সম্পদ, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে মানুষে মানুষে মৈত্রী স্থাপনে ব্রতী হয়েছে। আর বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায় প্রধানত রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সংঘাত ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করেছে। অবশ্য রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কোন কোন চিন্তাশীল মনীষী মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সুপরিকল্পনা রাজনীতি বা অর্থনীতির রঙ্গমঞ্চে তেমন সাফল্য মণ্ডিত হতে পারেনি। সে বিষয়ের সঙ্গে মানুষের পার্থিব বিষয় তৃষ্ণা জড়িত তা মানুষের মহত্বের উদ্বোধনে বিশেষ বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু, হৃদায়ানভূতি ও আদর্শবাদিতাই মানুষের মহত্ত্বকে অবারিত ভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিতে পারে।

ধর্ম্ম মানুষকে বৈষয়িকতা হতে দৃষ্টি অপসারিত করবার উপদেশ দিয়ে থাকে। সে কারণে

ধর্ম মানব মিলনের অন্যতম সহায়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির কোটি কোটি মানুষকে নিবিড় ঐক্য বন্ধনে সংযুক্ত করেছে।

কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে সংঘাতের উদ্ভব হয়েছে। অন্য ধর্মের মানুষকে কোন একটি ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াসই এই সংঘাতের মূলে। এইজনাই খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের সংঘর্ষ বেধেছিল। এ ছাড়া রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টান ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট খৃষ্টানের মধ্যে ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে একটি রক্তাক্ত অধ্যায় রচনা করেছিল। খৃষ্টান ধর্মগুরু রোমের পোপ বা কালক্রমে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর ইসলামধর্মের বিস্তার ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারের সহায়তা যোগেই ঘটেছিল।

উপরোক্ত কারণ সমূহ ধর্মের প্রতি মানুষের আস্থাকে শিথিল করে তুলেছিল। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যুক্ত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছিল।

এই কালে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ধর্মের পূর্ণ সত্যকে ও পুণ্য মহিমাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। অর্থাৎ বৈষয়িক উন্নতি অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির মধ্যে মানবজীবনের চরম সার্থকতা নেই। মানুষ যে ঈশ্বর লাভ করতে পারে তা মানব জীবনেরই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার জীবনে তা প্রমাণিত করলেন যে ঈশ্বরই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তিনি সর্বস্তরের ও সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারে দ্বারে উপনীত হয়ে এই ঈশ্বর প্রসঙ্গ করতেন। তাঁর সেই অতুলনীয় জীবন ও বাণীর সংস্পর্শে এসে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ রত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের একটি অভুতপূর্ব আলোড়ন, সমানুভূতির সূচনা হল। এই যুগে হিন্দু ধর্মের প্রতি ব্রাহ্ম ধর্মের বিভিন্ন শাখা এবং খৃষ্টের ধর্ম সম্প্রদায় কঠোর আক্রমণে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং খৃষ্ঠান প্রচারক উইলিয়াম হেষ্টি ও যোসেফ কুক শ্রদ্ধা সমন্বিত স্বীকৃতির দ্বারা একটি অভিনব বর্ণ সহিষ্ণুতার চিত্র রচনা করেন। এই সময়ে একেশ্বরবাদী, নববিধান ও সাধারণ—এই তিন শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রচুর বিরোধিতা লক্ষিত হত। হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করবার মধ্যেই এতাবৎ কাল তাদের ঐক্য দেখা যেত। এখানে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি সংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা এবং তাঁর মহিমার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দান প্রভৃতি কার্যের মাধ্যমে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন হয়ে ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ী প্রতিমার পূজার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা কেশব প্রমুখ ব্রাহ্ম আচার্যকে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার অভিযোগ থেকে নিষ্কৃত করেছিল। আবার যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকদিগকে মুগ্ধ করেছিলেন তা তাঁর খৃষ্টান, ইসলাম ও ব্রাহ্ম ধর্মের অনুশীলন এবং এর ফল স্বরূপ তাঁর সেই ঐতিহাসিক ঘটনা যে এই সকল ধর্ম সাধনার মাধ্যমে তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধি লাভ। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কেউ পারস্পরিক সকল ধর্ম সাধনার অনুশীলন করা বা তাতে সিদ্ধিলাভ করেন নি। তাই ধর্ম জগতে পরম ঐক্যের মন্ত্র সার্থক ভাবে তাঁর দ্বারাই উচ্চারিত হয়েছিল - যত মত তত পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম সমন্বয়ের বাণী বিস্ময়কর ভাবে স্বল্প কালের মধ্যে বিশ্ব ব্যাপী স্বীকৃতি লাভে অগ্রসর হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্ম একটি বিশ্বধর্মে পরিণত হয়েছিল। সেই পরিণতি মহারাজ অশোকের কীর্তি। অশোকের রাজত্বের দুশ বছরের কিছু অধিক কাল পূর্বে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তখন তাঁর ধর্ম সর্ব ভারতীয় বিস্তৃতি লাভ

করে নি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস যে ভারত বিবরণী লিখেছিলেন তাতে বৌদ্ধধর্মের কোন উল্লেখ নেই। তা হতে অনুভূত হয় যে সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্মে তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রথমে সর্বভারতীয় রূপে এবং পরে বিশ্বধর্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এটা অবণ্য বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় দুশ বছর পরে ঘটেছিল। আর শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেখি যে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর তিরোভাবের মাত্র দশ বৎসর পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক ও লণ্ডন নগরে তাঁর সুবিখ্যাত My Master নামক বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশ্বধর্মের আচার্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই কার্য আরও দ্রুতগতি লাভ করল যখন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত অধ্যাপক Max mullar তাঁর Rainakrishna and his sayin is পুস্তকটি প্রকাশ করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশ্ব ব্যাপী প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে মোর্যরাজের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা কোন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অপেক্ষা করেনি। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রচলিত থাকার সময়েই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে বহু অভারতীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। গৌতমবুদ্ধেব পরে শ্রীরাম কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন ভারতীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বিদেশীদের দ্বারা গৃহীত হননি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রসারে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এই ভাবধারা গ্রহণ করতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বা ইষ্ট বলে স্বীকার করা বাধ্যতামূলক নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও মানস পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান—শ্রীহরিদাস বিহারী দাস দেশাইকে লিখে-ছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণকে সকলের নিকট তিনি ঈশ্বরাবতার বলে প্রচার করতে চান নি। যদিও বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেই জ্ঞান করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ জীবন ও বাণীর সহিত পরিচিত হলে সকল মানুষের জীবনেই মহত্ত্বের উদ্বোধন ঘটবে।

নারী জাতীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ যে শ্রদ্ধা নিবেদন বরেছিলেন ধর্ম্ম জগতে তার তুলনা নেই। তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরু রূপে গ্রহণ করে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আপন পত্নীকে তিনি ষোড়শীরূপে পূজা করেছিলেন, এবং তাঁকে আপন জপের মালা উৎসর্গ করেছিলেন। যে সময়ে নারীর উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দ অভিনেত্রী নারীকে ঘৃণা ব্যতীত আর কিছু দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনী প্রমুখ অভিনেত্রীকে গভীর স্নেহ ও পবিত্র আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দ্দেশ দানে দ্বিধাবোধ করেন নি। পথিপার্শ্বের পতিতার মধ্যেও তিনি জননী ভবতারিণীকে দর্শন করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষ, নারী, গৃহী, সন্ন্যাসী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে যে সমদৃষ্টি ও সম্প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতেন তারই বা তুলনা কোথায়? জ্ঞানী, ভক্ত, নিস্কামী ও যোগী সকলেই তাঁর নিকট সমান সমাদর লাভ করত। ঐক্য সংস্থাপক রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনকে মূল্য দিয়েছেন, কোন একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে মানব সমাজকে একাকার করে তোলা তাঁব অভিপ্রেত ছিল না।

আর্ত ও পীড়িত মানুষের সেবাকে শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্ম সাধনার মর্যাদা দিয়া শিবজ্ঞানে জীব সেবার মন্ত্র প্রচার করেছিলেন।

আধুনিক যুগে গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে তাদের সকল উপকারিতা সত্ত্বেও এই দুই পন্থায় ব্যর্থতা বর্তমান যুগে মানব জাতির ভবিষ্যৎকে নিরাপত্তা দান করতে পারছে না। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি একটি দেশ আপন রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও অপর দেশ অধিকার করে সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে উৎসাহের অভাববোধ করে নি। ফলে বিদেশে গণতন্ত্রের আদর্শকে পদদলিত করতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন বাধা অনুভব করে নি।

সাম্যবাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রাশিয়া বা চীন দেশে বাস্তবে পরিণত হলেও দেখা যাচ্ছে যে দুটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র পরস্পরকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায়ই পরস্পরের শত্রু বলে গণ্য করছে। রাশিয়া ও চীন পরস্পরকে শত্রু জ্ঞান করে এবং পরস্পরের নিকট থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য অস্ত্রবলের উপর নির্ভরশীল। সাম্যবাদী চীনের সঙ্গে সাম্যবাদী ভিয়েতনামের সংঘর্ষ সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। সাম্যবাদ যখন দুটি প্রধান সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতার সৃষ্টি করতে পারছে না, তখন সাম্যবাদ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতার সৃষ্টি করবে একথা মনে করবার কোন হেতু নেই।

বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে অনেকে মানুষের সঙ্কটে পরিত্রাণ লাভের কথা চিন্তা করেন। বিজ্ঞানের অভাবনীয় জয়যাত্রা আশ্চর্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। পৃথিবী হতে মানুষ চন্দ্রে যাত্রা করে তথায় পদার্পণ করেছে। মানুষের মহাকাশ যাত্রা অল্পকালের মধ্যে মানুষকে বিভিন্ন গ্রহে পদার্পণ করতেও সক্ষম করবে এ আর অলস কল্পনা নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর উন্নতি কি মানব জাতির ভবিষ্যৎকে নিরাপত্তা দান করতে পেরেছে? যে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আশঙ্কায় মানুষ কালযাপন করছে তা যেদিন ঘটবে সেদিন বিজ্ঞানের কল্যাণে সমগ্র পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাবে একথা আমাদের বৈজ্ঞানিকরাই শুনিয়ে থাকেন। এর অর্থ বিজ্ঞানের সাফল্য মানুষের অকল্যাণেরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নিছক বিজ্ঞান চর্চা মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে না। যতদিন না মানুষের বিবেক জাগ্রত হচ্ছে অথবা যতদিন না মানুষ তার অন্তরস্থ ব্রহ্ম সত্তাকে উপলব্ধি না করছে, ততদিন মানুষে মানুষে প্রকৃত সেই একাত্মবন্ধনের আশা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় যতদিন না মানুষের মান ও হুঁস জেগে উঠছে ততদিন মানব সমাজে সংঘাত, সংগ্রাম ও ধ্বংস যজ্ঞের অবসান ঘটবে না। সেই মান ও হুঁসকে লাভ করে, অন্তবস্তু ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত ও তার জীবনে প্রতিফলিত সাধনাকে আপন জীবনে সার্থক করতে পারলে যথার্থ মানব ঐক্য স্থাপিত হবে এবং মানব জাতি তার ভয়াবহ সঙ্কট হতে প্রকৃত পরিত্রাণ লাভ করবে। ইতিহাসের আলোকে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ঐক্য সংস্থাপক। □

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর তাৎপর্য

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

'আঠারোশো ছিয়াশী-সালে পনেরই আগষ্ট মধ্যরাত্রে এক মহাপ্রাণ তার মরদেহ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্তের মহাকাশে বিলীন হলেন। সেকালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কালীপুর বাগান বাড়ীতে গিয়ে সেই মহাপ্রাণকে দর্শন করে তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী অপূর্ব কাব্যভাষায় প্রকাশ করলেন: 'তাঁর সারা দেহে নির্বাণেয় অনন্ত নীরবতা ও শান্তি। শান্তি চারিদিকে—শান্তি মৌন বৃক্ষে বিদায়ী অপরাহ্নে, উপরে নীল আকাশে এবং তার উপরে সঞ্চারমান নীল খণ্ড মেঘে।' রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জীবনকালে দর্শন করা পরম সৌভাগ্য—একই সৌভাগ্য মৃত্যুর অঙ্কে তাঁর শান্ত মুখচ্ছবির দর্শন লাভ। একত্রিশে আগষ্ট ধর্মতত্বে লেখা হলো'—১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় কাশীপুরস্থ গোপালবাবুর বাগানবাটী হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরানগরের শবদাহ ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হতে একশত দেড়শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। একাদশ বৈষ্ণব মৃদঙ্গ করতাল সহ সংকীর্তন করিয়া অগ্রে গমন করেন।···চারজন বিধান প্রচারক শবের সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যাইয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের ত্রিশূল ও ওঙ্কার, বুদ্ধধর্মের খুঙ্গি, মোহম্মদীয় ধর্মের অর্ধচন্দ্র, খৃষ্টধর্মের ক্রুশচিহ্নিত পতাকা সর্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল।'

তৎকালীন সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচার' (২৭ শে আগষ্ট) বলছে: 'গত সোমবার ২৩ শে আগষ্ট প্রাতে ৯ টার সময়ে সিমুলিয়া ষ্ট্রীটের ১৩নং ভবন থেকে সংকীর্তন সহ অনেকগুলি ভদ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থিপূর্ণ তাম্র কলস লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন। দলে অনুমান পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক ছিলেন।'

আরও একটি সংবাদপত্র, আঠারোশো চুরানব্বই-এর উনিশে মার্চ 'ইণ্ডিয়ান নেশান' খবর প্রকাশ করেছে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল।'

পরের বছরেই আঠারশো পঁচানব্বই সালের নয়ই আগষ্ট স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছেন—'দশ বছর আগে তাঁর জন্মতিথিতে একশো লোক জোটাতে পারেনি; গত বছর সেখানে এসেছিলো পঞ্চাশ হাজার।' ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে লক্ষ-কোটী জনতায় পরিণত হয়েছে। তাই তাঁর মহাপ্রয়াণের শতবর্ষে সুদূর রাশিয়ায় কষ্টুনিষ্ঠ মানুষ ছুটে এসেছে তাঁর স্বরূপ আবিষ্কারে। ভারতের কোন নিগূঢ় সত্যের তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মর্মবাণী?

ভারতবর্ষ সাধকদের পুণ্য ভূমি। বহু বরষের বহু সাধকের ধারায় এই ভারতবর্ষ স্নাত হয়েছে বার বার।

আমরা দেখেছি মধ্যযুগের ভক্তি সাধকেরা তিনটি সমাজ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—

(ক) ঐশী সত্তার সঙ্গে ব্যক্তির আপাতঃ নিরপেক্ষ সম্পর্ক স্থাপন ও মম্ময়তার উপর ঝোঁক সৃষ্টি

(খ) জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বাঁধনকে আলগা করা

(গ) নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা

ফলস্বরূপ ঃ

(ক) শুষ্ক সামাজিক আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল

(খ) জাতি ও বর্ণের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল

(গ) তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছিল

(ঘ) পৌরোহিত্যতন্ত্র নিরুৎসাহিত হয়েছিল,

(ঙ) পুনর্বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ব্যাপারে সমাজ স্বীকৃতিতে একটা সামাজিক বিপ্লব দেখা গিয়েছিল।

সীমাবদ্ধতা ঃ

(ক) সর্বধর্ম সমন্বয়ের ব্যাপকতায় ভক্তি আন্দোলন প্রসারলাভ করেনি।

(খ) উদার মানবতাবাদের বুদ্ধিবোধে তা বিকশিত হয়নি।

(গ) মানুষের অধিকার বোধের প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়নি।

তাই সেদিন কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশ এবং দেশের ধর্ম ও সমাজ রামমোহনের প্রবর্তিত যুক্তিবাদ ও মানব-মুক্তি তত্ত্বে, চিন্তাশীলতা যখন ব্রাহ্ম সমাজে আনুষ্ঠানিকতায় আটকে যাচ্ছিল, যখন জ্ঞান ও আবেগের সম্পর্ক নির্ণয়ে অসুবিধা হচ্ছিল অন্তঃসারশূন্য সমাজে তখন নতুন কিছু একটা আবির্ভাবের প্রয়োজন হচ্ছিল। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তক্তপোষে বসে শ্রোতাদের সঙ্গে এক হয়ে গল্প করলেন, গান করলেন, মস্করা করলেন মজার মজার কথা বললেন—একেবারে পৌঁছে গেলেন ভক্তের মনের মণিকোঠায়। যেখানে বৃন্দে ঝি-ও তাঁকে অনুভব করে বুঝতে পেরে বলেছিলেন—সব ওর মুখে। তিনি লেক্‌চার দিলেন না কারণ লেকচার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল—'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেক্‌চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন।' যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, ধাতু, মানুষ, জীব জন্তু করেছেন, জীব জন্তুদের খাবার উপায় পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। অর্থাৎ কোন প্রভেদ নয়, কোন পার্থক্য নয়, উঁচু নীচু, নয়, সকলের সঙ্গে সমান ভাব সমান আন্তরিকতা, উঁচু মঞ্চে বসে বক্তৃতা দেওয়া নয় একেবারে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে বসে সকলের সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্তা বলা এ হচ্ছে সবই শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব ভঙ্গী। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের উপর ভালবাসা হলেই হলো, নানা বিচারে দরকার নেই। আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। তিনি একথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যে জ্ঞান হচ্ছে পুরুষ মানুষ যার বাড়ী পর্যন্ত যায় আর ভক্তি হচ্ছে মেয়ে মানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়। সুতরাং তাঁর কাছে ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা' আর তিনি এজন্যেই সমস্ত পৃথিবীর কাছে ঘোষনা করেছিলেন 'ঈশ্বরই সৎ নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ: অনিত্য দুই দিনের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন এই বোধ আর ঈশ্বরে অনুরাগ তাঁর উপর টান আর ভালবাসা নিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। এর ফলে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ব্যাপকতায় ভক্তি আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল ঈশ্বর মানুষের একাত্মতায় মানবতাবাদের তথা ঈশ্বর অনুভূতি এক নবতর বৌদ্ধিক ব্যাখ্যায় সমাজ আকৃষ্ট হয়েছিল।

তাই দেখি একজন তথাকথিত অক্ষরজ্ঞানহীন প্রথাগত শিক্ষা অভিজ্ঞতার বাইরে থেকেও তিনি

নিজেকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষায় প্রোজ্জ্বল করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শতবর্ষের সভায় সভাপতি হিসাবে তৎকালীন প্রখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন শীল মহাশয় বলেছিলেন ঃ 'এই সকল কার্য্যাবলীতে কোন ভঙ্গি ছিল না, কিংবা এগুলি কল্পনাশ্রয়ী ব্যাপারও নয়। এখানে এমন একজন আত্মবান পুরুষকে দেখা গেল যিনি ধর্মজীবন ও ইতিহাসের সকল মানবিক অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে নিয়েছিলেন। এই ভাবে তিনি হিন্দু ঐতিহ্যে মূল্যবান উপাদান যুক্ত করেছিলেন। মুসলমান ধর্ম থেকে নিয়েছিলেন সাম্য ও মানব ভ্রাতৃত্ববোধ বৌদ্ধ খৃষ্টান ধর্ম থেকে পাপ ত্রাণের প্রয়োজনীয়তা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মূল অধিবেশনে বলেছিলেন ঃ 'তিনি একের মধ্যে বহু ও বহুর মধ্যে একের উপাসনা করতেন। তার এই উপলব্ধির মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। পূর্ণকেই তিনি সকল দিক থেকে উপলব্ধি করতেন। এই রূপে রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনার ভিতরে নিরাকার ও সাকার উপাসনাকে এক করে নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, যে আকারে, যে দেবতারই পূজা করা হউক না কেন, সকলই সেই এক ভগবানের পূজা। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে তিনি কোন ভেদ দেখতেন না।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'পরমহংসদেবকে আমি ভক্তি করি কারণ তিনি ধর্মীয় নৈরাজ্যের মরু যুগে নিজ উপলব্ধির দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সভ্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর বিশাল সত্তা আপাত সংঘাতশীল সাধনা সমূহকে নিজের মধ্যে মিলিত করতে পেরেছে। তাঁকে ভক্তি করতে পেরেছে। তাকে ভক্তি করি কারণ তাঁর আত্মার লাবণ্য চিরদিনের জন্য হতমান করেছে পতিত ও পুরোহিতদের আড়ম্বর ও বিদ্যাগর্বকে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম চেতনার মূলে আছে মানবতাবাদ—এ কিন্তু ইয়োরোপের Neo humanism নয়। এ হচ্ছে সেই বেদান্তের ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যতকিঞ্চ জগতাং জগৎ—এই জগতের যা কিছু জাগতিক বস্তু আছে সে সমস্তই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। মাতা যেমন গর্ভস্থ শিশুকে আচ্ছাদিত করে রাখেন তেমনি ঈশ্বর সর্ববস্তুকে আবৃত রেখেছেন। এরপর তাঁর সহজ কথায় ঈশ্বর সর্বভুতে আছেন। বিবেকানন্দকে বললেন যত্র জীব তত্র, শিব জীবজ্ঞানে শিবসেবা। তিনি জানালেন প্রতিমায় তাঁকে পাই কিন্তু মানুষে তার বেশী প্রকাশ। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম। অর্থাৎ নিজেকে ভালবাসা হচ্ছে কামনা আর কৃষ্ণে প্রীতি হচ্ছে সত্যিকার ভালবাসা। শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগে দাঁড়িয়ে সহজ, সরল, সত্য ভাষায় সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্য কি তা ঘোষণা করে বললেন—ঈশ্বর লাভই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আসলে ভারতবর্ষের মানুষ কোনদিনই অর্থকে জীবনের সবচেয়ে বড় করে দেখেনি। আত্মসুখও তার কাছে কোনদিনই বড় ছিল না। তপোবনের শান্ত নিভৃত জীবন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা যে কথা বারবার বলে এসেছেন তার মূল বক্তব্যই হলো—বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ। আর পাশ্চাত্যের ইউটিলেটিয়ানইজম বা উপযোগিতাবাদ বলছে অধিকতম জনের জন্য অধিকতম সুখ সমাজের হিত নয় ব্যক্তির সুখ। এই শিক্ষায় ভারত তথা সুখের আকাঙ্ক্ষায় পারিবারিক জীবন নষ্ট হচেছ, মানুষ আত্মসর্বস্ব এক কেন্দ্রিক স্বার্থপর হয়ে সমাজ সংহতি নষ্ট করে দিচ্ছে। এর মাঝেই তিনি বললেন বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই। তিনি বুঝিয়ে দিলেন কেন তেল হাতে মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায় না। তাঁর অভিমত হলো ঈশ্বর ভক্তি রূপ তেল লাভ করে তবেই সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। কারণ তিনি জানতেন অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি মানুষকে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মসুখী করে তোলে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগে যুক্ত হলে মনের প্রসারতা বাড়ে, আত্মচিন্তা দূর হয়।

তিনি চেয়েছিলেন ভোগসাম্য অর্থাৎ 'কনজিউমার্স ইকুয়ালিটি'। মানুষের যত ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়বে ততই অপরের জিনিসকে কেড়ে নেওয়া বা অধিকার করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাবে। আসলে

অর্থ মানুষের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগীকে বাড়ায় এবং মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে। এককালে ভারতের সংসার যাত্রার মূল আদর্শেই ছিল (১) সাধারণ জীবন ও উচ্চ চিন্তা (২) বাঁচা এবং বাঁচানো। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থ কেন্দ্রিক সভ্যতার বুকের উপরে দাঁড়িয়ে অর্থের কৌলিন্যেকে তিনিই প্রথম অস্বীকার করলেন টাকা এবং মাটিকে অভিন্নরূপে ব্যঞ্জিত করে। ব্যক্ত করলেন এই বর্তমান সভ্যতার শেষ মর্মকথা—'ঈশ্বর একমাত্র বস্তু। টাকায় কি না হয়? ভাত হয় ডাল হয় কাপড় হয়। থাকবার জায়গা হয়। এই পর্যন্ত ঃ কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্যে হতে পারে না—এর নাম বিচার বুঝেছ? তাঁর সম্পর্কে সব শেষ কথা মানবিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব সংহতির প্রচেষ্টায় তিনি অনন্য। তিনিই দেখালেন (ক) বিচিত্র আছে এবং বিচিত্রের মধ্যে এক আছে। (খ) নানা বর্ণ আছে আবার তা বর্ণহীন 'এক'। তিনি বোঝাতে চাইলেন (ক) যত মত তত পথ; (খ) সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়; (গ) সব মতই পথ, মত কোন ঈশ্বর নয়'। কারণ তিনি জানতেন—(ক) এক রাম তার হাজার নাম। (খ) ঈশ্বর এক বই দুই নয় (গ) হরি হরের এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ (ঘ) নাম আলাদা কিন্তু একই বস্তু। সুতরাং বলা যেতে পারে ব্রজেন শীলের ভাষায় এতোদিন শুধু হিন্দুদের মধ্যে এইভাব ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমন্বয়ের ব্যাপারটিকে অন্য ধর্মের প্রসঙ্গে নিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা যে উপলব্ধি করতে পারলাম; তাঁর বিশাল সত্তা আপাত সংঘাতশীল সাধনাসমূহকে নিজের মধ্যে মিলিত করতে পেরেছে।

আর শেষ কথা হলো বিশ্ববোধ আর বিশ্বপ্রেম যা মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে, ভালবাসতে শেখায় মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর কথামৃতের রূপসাগরে ডুব দিয়ে যে বাণী উত্থিত হচ্ছে সেখানেই লুকিয়ে আছে বিশ্বজনীন ভালবাসার অতলস্পর্শ। আসুন তাঁর কথা দিয়ে অমৃত রূপময় সাগর ছেঁচা বাণীতে আমরা উদ্বুদ্ধ হই—'আমার জিনিস, আমার জিনিস', বলে—সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোক গুলিকে ভাল বাসা এর নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।' □

‘প্রণাম আনিল টানি’

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

“বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে,
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।”
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় মানবসভ্যতার সামগ্রিক সাধনার ধারা মিলিত হয়েছে এবং রামকৃষ্ণের জীবনচর্যা ও সাধনায় জগতে নতুন তীর্থের বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধ সত্য; রামকৃষ্ণ মনীষার ও রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। রামকৃষ্ণ শুধুমাত্র একজন ধর্মসংস্কারক বা ধর্মপ্রচারক মাত্র নন; যদি তা হতেন তবে তিনি আজ বিশ্বমানবসভ্যতার কাছে গ্রহণীয় হতেন না। রামকৃষ্ণ বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে যে অন্যতম গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব তার প্রমাণ একটি সংগঠন—যার নাম—‘কমিটি ফর কম্প্রিহেনশিভ স্টাডি অব দি রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ মুভমেণ্ট’। এই কমিটির মূল সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক এ. এল্ ব্যাসাম; সহ সভাপতিদ্বয় হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার আকাডেমী অব সায়েন্সের সদস্য ও সুপরিচিত পণ্ডিত অধ্যাপক চেলিশেভ এবং চীন প্রজাতন্ত্রের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা দক্ষিণ এশিয়া বিশারদ হুয়াং—চি—জুয়ান। উক্ত কমিটির প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে, শুধু বর্তমান ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ ভাবধারার ব্যাপক চর্চা ও প্রসারের জরুরী প্রয়োজন আছে। উনিশ শতকের যে রামকৃষ্ণ ছিলেন ভারতীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের অন্যতম বাঙালী প্রতিনিধি তিনিই বিশ শতকের অন্তিমলগ্নে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন।

রামকৃষ্ণ (১৮৩৬—৮৬) জন্মেছিলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি প্রচলিত পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না; হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তাঁর অধিগত ছিল। তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি বা দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নি। তিনি নীতিমূলক কাহিনীর মাধ্যমে জীবনের অনেক গূঢ় তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সমস্ত বক্তব্য সমকালীন মাস্টারমশাই-এর দ্বারা ‘কথামৃত’ সংকলিত ও সংগৃহীত হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনাচরণ থেকে আহৃত চিত্রকল্প, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা অলংকারের মাধ্যমে, সহজ কথ্য লাবণ্যময় গদ্যে, সঙ্গীতের সাহায্যে তিনি মহৎ জীবনের অমৃতপিপাসার কথা শুনিয়েছেন।

'কথামৃতে' কোনো বিশেষ ধর্মমত ও দর্শনতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নি ; অথচ 'কথামৃত' সর্বজনের সর্বকালের হৃদয়গ্রাহী সাহিত্য। 'কথামৃত' 'সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য ও জীবনীসাহিত্য'। 'কথামৃত' সম্পর্কে হাকসলী বলেছেন—Unique in the literature of hagiography'। "সাধারণ সাহিত্য বা ধর্মসাহিত্য—যে কোনো বিচারেই কথামৃতের অনন্যত্ব প্রকটিত হয়। ···চলিত, অনেক সময় গ্রাম্য, ভাষায় কী প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং ভাববহনের ক্ষমতা! ·· ভাষার সম্পদের মতোই উপমার সম্পদ, ···উপমার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের সর্বগ্রাসী প্রতিভা—সেই মহৎ দারুণ বুভুক্ষা ছিল তাঁর, ···তাঁর সজাগ কৌতুহলী দৃষ্টি সর্বত্র সঞ্চরণ করেছে, ইতর এবং ভদ্রকে সমদৃষ্টিতে দেখেছে, তার পরে অন্তর সংজ্ঞার সময় তিনি কৌস্তুভ ও বিভুতিকে সম মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তাঁর উপমায় অভিজাত অনভিজাত একই জগন্নাথক্ষেত্রে সম্মিলিত, উচ্চ সংস্কৃতির সৌকুমার্যের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির জীবনশক্তি মিলেছে এক তানে।"[১]

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত ধর্মই পরিণতিতে একটি মাত্র শিক্ষা দেয় ; আর সে শিক্ষা হল ঈশ্বর এক, অবিভাজ্য এবং বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর কথা বলা হলেও ঈশ্বর মূলতঃ এক। 'আমার ধর্মই একমাত্র সত্য ও অন্য সমস্ত মিথ্যা'—রামকৃষ্ণ এই জাতীয় সংকীর্ণতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির যুগে রামকৃষ্ণের এই শিক্ষা তাঁর প্রগতিশীল ও মুক্তমনা চিন্তার পরিচয় দেয়। ধর্মের যে দুটো দিক আছে তার মধ্যে ইতিবাচক দিকটিই রামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল। তার ফলে বর্তমান বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক জগতের বুদ্ধিজীবী মানুষেরা রামকৃষ্ণকে নিছক ধর্মনেতা বলে মনে করেন না। এই প্রসঙ্গে ডঃ ই. পি. চেলিশেভ একটি সাক্ষাৎকারে উদ্বোধন পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দকে জানিয়েছেন—"তাঁরা যে—সব ধর্ম উপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন পরিণত সমাজসংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথার্থ মানবতাবাদী চিন্তাবিদের মতের কোন অমিল নেই! রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেন : 'খালি পেটে ধর্ম হয় না' 'যার হেথায় নেই, তার হোতায়ও নেই' আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন : 'আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না যে ধর্ম বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না', ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে বলছেন, 'যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ কি একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো,' বলছেন 'জীবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধর্ম''। কোন দেশের কোন ধর্মগুরুর মুখে কোন কালে এরকম কথা কেউ শুনেছে ? আমার মনে হয়, মার্কসীয় ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌ এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের বড় কাছাকাছি।[২] বর্তমান পারমাণবিক যুদ্ধাতঙ্কগ্রস্ত পৃথিবীতে রামকৃষ্ণের জীবনচর্যা ও উপলব্ধি সত্য যে মানুষকে ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী ও চেলিশেভ একমত। টয়েনবী বলেছেন—"এই ধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে আমরা পেয়েছি এমন একটি জীবনদর্শন এবং মনোভাব যার সাহায্যে সমগ্র মানবজাতি একটি পরিবার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং পারমানবিক যুগে আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র এই জীবনাদর্শ।"[৩] ডঃ চেলিশেভও প্রায় একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, "শান্তি মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণীই রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের বাণী। সেই বাণীই আজকের বিপন্ন পৃথিবীতে বাঁচার পথ দেখাতে পারে। আমি মনে করি, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজ যেভাবে বিশ্বকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। সমকালীন ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে তাঁদের বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে তার প্রয়োজন এবং প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশী। ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে ঐ ভাবাদর্শকে বোঝার জন্য আজ সোভিয়েত রাশিয়ায় বহু গবেষক ও চিন্তাশীল মানুষ রামকৃষ্ণ, বিশেষ করে বিবেকানন্দ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন।"[৪] শুধু টয়েনবী বা চেলিশেভ নয়, বক্ষ্যমান শতাব্দীর বহু মনীষা রামকৃষ্ণ

গবেষণায় নিয়ত থেকে সমকালীন ইতিহাসে রামকৃষ্ণের ভূমিকা সম্পর্কে এক নতুন দিগন্ত সন্ধানে রত। সমকালীন পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ গবেষণা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন সোভিয়েতের—ডঃ এ. পি. ন্যাচুক-দানিলচুক, অধ্যাপক ভি. মরগনরথ, বুলগেরিয়ার সোফিয়া সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক এন. জোদোয়ভ, হাঙ্গেরীর বুডাপেস্ট আকডেমীর অধ্যাপক জে. হারমাতা এবং মঙ্গোলিয়ার উলান বতর সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক ডামডিনসুরেন।

রামকৃষ্ণ তার প্রয়াণের মাত্র একশ বছরের মধ্যে বিশ্বের প্রায় সমস্ত মনীষার গবেষণার, বিশ্বাসের ও উপলব্ধির যে বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন তার পটভূমিকায় রয়েছে রামকৃষ্ণের অহংবোধমুক্ত বিপুল জীবনপিপাসা এবং সমন্বয়বাদী মানবপ্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গী। রামকৃষ্ণের আবির্ভাব কাল (১৮৩৬—১৮৮৬) ভারতবর্ষে ঔপনিবেষিক পালনের বিস্তৃতির কাল। নব্য ইওরোপের চিত্ত দূত রূপে তার আবির্ভাব হলেও, সে মূলতঃ ভারতবর্ষের সম্পদ লুণ্ঠনে সচেষ্ট। ধনতন্ত্রের আগমন ঘটছে, ভারতীয় সামন্তবাদ ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধছে ; যদিও ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রে সামগ্রিকভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে না। বিদেশী বণিকের ছত্রছায়ায় ভারতীয় ধনবাদের অসম্পূর্ণ বিকাশ সংলক্ষ্য। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণের একুশ বছর বয়সে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। রামকৃষ্ণের জীবনপর্বে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন বিস্তার। ইতিহাসের এক আবর্তসংক্ষুব্ধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে রামকৃষ্ণের জীবন আবর্তিত। সমকালীন ইতিহাস থেকে রামকৃষ্ণ তাঁর স্বপ্নার সাহায্যে সংগৃহীত অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধিতে পরিণত করলেন। রামকৃষ্ণ সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করলেও, তিনি উক্ত পরিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। পিতা ক্ষুদিরামের তেজস্বিতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, কৃচ্ছ্রসাধন প্রবণতা রামকৃষ্ণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ তথাকথিত শিক্ষাসম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হলেও তিনি বাল্যজীবনে (গদাধর রূপে) পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তৎকালীন গ্রামীণ জীবনে প্রচলিত পুরাণকথা, যাত্রাগান প্রভৃতি মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করতেন। পটব্যসায়ীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পট অংকন করতেন অর্থাৎ বালক গদাধর লৌকিক ঐতিহ্য ও জীবনাচরণের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। প্রচলিত সামাজিক প্রথাবন্ধতার মধ্যে বাস করলেও রামকৃষ্ণ প্রথা ভাঙতে উদ্যত হয়েছিলেন আর এইখানেই রামকৃষ্ণের যুগোত্তীর্ণতা। উপনয়নকালে তিনি প্রচলিত বংশগত প্রথা স্বীকার না করে কামারকন্যা ধনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করেন। এইখানেই রামকৃষ্ণ জাতিভেদ প্রথার দুর্গে আঘাত হানলেন এবং ভারতবর্ষের দুর্গতির মৌল কারণ নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হলেন। জাতিবর্গ ধর্মনির্বিশেষে শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শের অংকুরোদ-গম রামকৃষ্ণের বাল্যকালেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই কারণেই বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন—"He was the hermony of all the diverse sects of India, who was destined to see in every sect the same spirit working, the same God— to see Gob in every" অর্থাৎ, 'তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সকল বিভিন্ন ধর্মের মিলন স্বরূপ, যেহেতু তিনি অনিবার্যভাবেই দেখেছিলেন প্রত্যেক ধর্মেই সেই একই পরমাত্মার আবির্ভাব—সেই একই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব, সকল বস্তুতে সেই একই পরমদেবকে।'

রামকৃষ্ণ ব্যক্তিত্বের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৯২৬ সালে মঠ ও মিশনের সম্মেলনে বলেছিলেন—"The most noticeable feature in the life of Sri Rama-krishna was his unstined love and sympathy for people professing any creed or belife, if only they were sincere and his deep solicitude for imparting blessing to all. * * * His humanitarianism was born of realisation of th. divinity in all."

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ কলকাতায় আসেন ও ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে বাস করতে থাকেন। তিনি কতকগুলি মূল্যবোধ নিয়ে তৎকালীন নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি কলকাতায় আগমন করেন।

রামকৃষ্ণের মূল্যবোধগুলি হল মনুষ্যত্বকে মর্যাদাদান, মানুষকে আত্মীয়জ্ঞান, নির্লোভী মনোভাব অসূয়াহীন মনোভাব ও সত্যে নিষ্ঠা। "ভূমিনির্ভর কৃষিজীবন সম্পৃক্ত মানুষের কালগত অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণা থেকেই এ মূল্যবোধের উদ্ভব এবং রামকৃষ্ণ কলকাতায় এসেছিলেন পল্লীজীবনের ওই শ্রেষ্ঠ সম্পদটুকু নিয়ে।"[৫] রামকৃষ্ণের ওই মূল্যবোধ ছিল বলেই তিনি প্রচলিত শিক্ষাগ্রহণে তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। বিদ্যালয়ের পুঁথিগত শিক্ষাজনিত প্রতিষ্ঠা ও ভোগসুখলাভকে তিনি তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন। অর্থকরীবিদ্যা মানুষকে যে চিরন্তন সত্যের সন্ধান দিতে পারেনা—রামকৃষ্ণ এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। এযুগে বিদ্যার্জনের আর এক অর্থ হল অর্থোপার্জন—এ কথা রামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। যে অর্থকরী বিদ্যা বর্তমান মানবসভ্যতার মৌল লক্ষ্য রামকৃষ্ণ তার বিরোধিতা করে মানবসভ্যতার শাশ্বত চাবিকাঠি খুঁজতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হলেও তিনি তথাকথিত পুরোহিত ছিলেন না। তিনি জমিদারতন্ত্রের কাছে চাকুরী স্বীকার করলেও রাসমণি বা তাঁর মথুরামোহনের সমস্ত কাজ সমর্থন করতেন না। তিনি রাসমণি বা মথুরামোহনের তোষামোদ তো করেনই নি ; পক্ষান্তরে রাসমণির বিচলিতচিত্ততার জন্য গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেছেন এবং প্রজাদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে মথুরামোহনকে সচেতন করিয়ে দিয়েছেন।

"তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত কথা শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। একদা একজন বিখ্যাত ধনী তাঁহার নিকটে আসিয়া কিছুকাল কথোপকথনের পর পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার অন্ন বস্ত্র ক্লেশ হয় দেখিতেছি আমি কয়েক সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ আপনার জন্য রাখিতে চাহি, তাহার সুদে আপনার নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তাহা হইলে আর আপনার কোন কষ্ট হইবে না। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ সেই ধনীর মুখের দিকে কট কট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "দূঃ শালা।" তাহাতে বড় লোকটির মুখ চূণ হইয়া গেল। তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।"

রামকৃষ্ণ তথাকথিত শূদ্রানী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পৌরোহিত্য স্বীকার করে সমকালীন বাংলাদেশে বৈপ্লবিক আবহাওয়ার সূচনা করেছিলেন। কেননা, তখনও পর্যন্ত সমাজে ব্রাহ্মণত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রগতিশীল ব্রাহ্মরাও হিন্দুর বিধি-ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের মন্দিরে পৌরোহিত্য স্বীকার ও গ্রহণের মাধ্যমে শূদ্রের অধিকার স্বীকৃত হল। রামকৃষ্ণ নরকেই তাঁর জীবনের নারায়ণ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন উচ্চারণ করেন—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবেপ্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'— তখন আমাদের সামনে রামকৃষ্ণের সেই সেবারত মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ''সর্বজীবে শিবজ্ঞান দূরে করিবার জন্য কালীবাটিতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন তিনি দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপ পূর্বক স্বহস্তে মার্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা ঐরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।[৬] জাতিভেদ প্রথাবিরোধী রামকৃষ্ণ শাস্ত্রাচারসর্বস্ব, বর্ণভেদ পীড়িত ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন—তাঁর জীবনটি হলো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আলোকবর্তিকা যা ভারতের ধর্মচিন্তার সমস্ত দিককে আলোকিত করেছে। ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন—'রামকৃষ্ণ কে ? স্বামীজী তার উত্তরে বলেছিলেন—'তিনি সেই পথ— সেই আশ্চর্য পথ যা নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন। 'জীবনযাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং নিরন্তর সংগ্রামের শান্তিই' হল বর্তমান কালের মানবসভ্যতায় রামকৃষ্ণের

অবদান। রামকৃষ্ণ প্রদত্ত মহাসম্পদ কথার মালা গেঁথে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর প্রচারিত সত্য দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে বলেই আজ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সংখ্যা, কার্যক্রম অনুরাগী মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধিত। "রামকৃষ্ণ ভাবাশ্রিত অগণিত প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা 'রামকৃষ্ণ আন্দোলন' কথাটা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করতে থাকেন। ১৯১৪ সালে টেংাার্ট রিপোর্টে যেখানে অবিভক্ত ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখার সংখ্যা ১১—সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৮৩-৮৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে শাখার সংখ্যা ৯২, বাংলাদেশে ১০ এবং বহির্ভারতের অন্যান্য স্থানে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন যে কত ব্যাপক তার পরিচয় পাওয়া যায় সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী কুজনেৎসভের, ভারততত্ত্ব ড. রিবাকভ, সাহিত্যিক ইউরি কারিয়াফিন, আলেকজাণ্ডার আদিমোভিচ, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ইণ্ডিয়া ডেস্কের দায়িত্বে আছেন মীরা সালগানিকের বক্তৃতায় ও আলোচনায়।[৮] কুজনেৎসভ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "ভারতীয় পটভূমিতে, রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের ভূমিকাও ঋষি টলস্টয়ের মতো। তাঁদের উন্নত মানবতাবাদী চিন্তাধারা, ধর্ম সম্বন্ধে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুক্ত মন ভারতে আধ্যাত্মিক জাগরণের জন্ম দিয়েছিল।[৯] সাহিত্যিক ইউরি কারিয়াফিন মনে করেন যে রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের মধ্যে যে ধর্ম আবিস্কৃত হয়েছে তা হল ভালবাসার ধর্ম আর এই 'ভালবাসার ধর্ম বিশ্বের সর্বত্র একই ভাষায় কথা বলে।' ভারততত্ত্ববিদ ড. রিবাকভ সাম্পতিক বিশ্বে রামকৃষ্ণের জীবনচর্যার ও সাধনার প্রাসঙ্গিকতার সম্বন্ধে স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন—"দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এই পুঁথি—না—পড়া পুরোহিতের চিন্তা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রভাবশালী। শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসরি রাজনীতির কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর শিক্ষা সকল ধর্ম ও মতের ঐক্যসাধনের উপর জোর দিয়েছে। ফলে আজকের বিশ্বে যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়ছে, তার বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণের শিক্ষা একটি বড় হাতিয়ার।"[১০] আলেকজাণ্ডার আদিমোভিচও মনে করেছেন যে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের ছায়ার মধ্যে রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে ধর্ম সেই অখণ্ড শুভময় বিশ্ব, জাতিবর্ণ ধর্মভেদহীন এক পরমশান্তির নীড়। তাই আধুনিকমনা নারীর কাছে রামকৃষ্ণ গ্রহণীয় অস্তিত্ব। মীরা সালগানিক সেইকারণে অকম্পিত প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন—"আজকের বিশ্ব বড় বেশি খণ্ডিত, দ্বিধাদীর্ণ মানুষ সব সময়ই অখণ্ড এবং বিশ্বজাগতিক নীতি-বোধের সন্ধান করে, কিন্তু আজকের বিশ্বে সে রকম কোনও নীতিবোধের হদিশ মিলছে না। রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থে যে ধরণের মূল্যবোধ গড়ে তোলে, তা সবসময় ব্যক্তির আত্মগত শুভাশুভবোধকে তুষ্ট করনে পারে না। রাষ্ট্রিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সমন্বয়ে এমন কোনও মহত্তর নীতিবোধ চাই যা মানুষকে সকল দিকে পথ দেখাতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের শিক্ষায় সেই অখণ্ড নীতিবোধের সন্ধান পাওয়া যায়।

* * * ধর্মকে তার প্রথাগত স্বরূপে না দেখে আমরা যদি তার নীতিবোধকে গ্রহণ করতে শিখি, তাহলে বোধ হয় আমাদের পথে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে মেনে নিতে আর কোনও অসুবিধা থাকবে না।"[১১] রামকৃষ্ণ বেদান্ত দর্শনের অনুরাগী ও সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বেদান্ত—দর্শন শংকরাচার্য ও রামানুজের বেদান্ত দর্শন থেকে অনেক পৃথক। রামকৃষ্ণ তাঁর দার্শনিক সমাজ দূরতম প্রান্তদেশ পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ বস্তু জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সমাজ জীবনে ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে রামকৃষ্ণের মতামত বস্তু তান্ত্রিক দার্শনিকের ন্যায়। এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীকৃত সেই বিখ্যাত সাপের গল্পটি আমাদের মনে পড়ে। সাপের মত মানুষকে সমাজ জীবনে অন্তত একবার ফোঁস করতে হবে। অর্থাৎ অত্যাচার উৎপীড়ণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। রামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের জনগণের সেবা করার জন্য উপদেশ দিতেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থকেন্দ্রিক চিন্তাধারাকে তুচ্ছ মনে করে

তিনি ইতিহাসের অমোঘ নিষ্ঠুর সত্যবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—'টাকামাটি, মাটি টাকা।' বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যখন বিভিন্ন ধর্মের নামে ব্যবসা চালানো হয়, এক ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মকে উত্তেজিত করা হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা যখন ধর্মীয় অনৈক্য ও বিভেদের সুড়ঙ্গ পথে চিরকালীন শোষণের রাস্তা খুঁজে পায়, তখন রামকৃষ্ণের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক মহতী ঐক্য প্রচেষ্টাকে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে ধর্মমহাসভার সমাবেশে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছিলেন—"এখানে এমন একজন আত্মবান পুরুষকে দেখা গেল যিনি ধর্ম জীবন ও ইতিহাসের সকল মানবিক অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে নিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি হিন্দু ঐতিহ্যে মূল্যবান উপাদান যুক্ত করেছিলেন—মুসলমান ধর্ম থেকে নিয়েছিলেন সাম্য ও মানব ভ্রাতৃত্বের বোধ, খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে পাপ ত্রাণের প্রয়োজনীয়তা"।[১২] উক্ত ধর্মমহাসভায় রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অন্তরের দ্রবীভূত শ্রদ্ধা বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তথাকথিত ধর্মীয় চিন্তায় উৎসাহী নন, তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা' ধর্মীয় অনাচারের অত্যাচারের বিরোধী। তাঁর কাছে, ধর্ম হল 'বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ'। রামকৃষ্ণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সৃষ্টির সেই পরমতম জ্যোতির্ময়ের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই তাঁর কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়—"পরমহংসদেবকে আমি ভক্তি করি—কারণ তিনি ধর্মীয় নৈরাজ্যের মরু যুগে নিজ উপলব্ধির দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর বিশাল সত্তা আপাত সংঘাত শীল সাধনায় সমূহকে নিজের মধ্যে মিলিত করতে পেরেছে। তাঁকে ভক্তি করি—কারণ, তাঁর আত্মার সাফল্য চিরদিনের জন্য হতমান করেছে পণ্ডিত ও পুরোহিতদের আড়ম্বর ও বিদ্যা-গর্বকে।"[১৩] রামকৃষ্ণ সমকালীন যে সব বিদ্বান পণ্ডিতের দল রামকৃষ্ণের ভাষাজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন, তারা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, যুগসন্ধিক্ষণের শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। "তিনি জনতার গভীর থেকে এসেছেন, গ্রামের গভীর থেকে এসেছেন। তিনি এক পরাধীন, নির্যাতিত জাতির আত্মসম্মান ফিরিয়ে দিতে এসেছেন।"[১৪] রাশিয়ায় তলস্তয় বিচারে যে ভুল হয়েছিল, ভারত তথা বাংলাদেশেও রামকৃষ্ণ বিচারে সেই ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি হল। রামকৃষ্ণ ছিলেন গ্রামের মানুষ, তিনি ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন; কৃষকের জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার বেদনা তিনি আপন অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছিলেন। রামকৃষ্ণ সমকালীন বাংলাদেশে গ্রামের মানুষ ইংরেজের সৃষ্টি কলকাতায় যখন বিত্তের সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছে, যখন তারা রুচি, ইতিহাস, সমাজ বিস্মৃত হতে শুরু করেছে, সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া শক্তির লোভের কাছে যখন তারা সমর্পিত প্রাণ তখন রামকৃষ্ণ জীবনচর্চা ও জীবনচর্যায় 'বৃটিশ শোষিত বাণিজ্য শাসিত মুদ্রা শাসিত' কলকাতা শহরের ছিন্নমূল চিন্তানায়কদের কাছে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত আবির্ভূত হলেন। অর্থকেন্দ্রিক সভ্যতার বিরোধিতা রামকৃষ্ণের কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হতে শোনা যায়—"অর্থ যার দাস সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের, কিন্তু পশুর ব্যবহার।"[১৫] রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশদের বিরোধিতা না করলেও ইংরেজের পদলেহী উঠতি বড়লোকদের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে "দেখ, সাধু সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলা উঠে অন্যমুখ না দেখে সাধু সন্ন্যাসীদের মুখ দেখে ওঠা ভাল। ইংরেজি ছবি দেওয়ালে—ধনী রাজা, কুইন এর ছবি—কুইনের ছেলের ছবি, সাহেব মেম বেড়াচ্ছে তার ছবি রাখা—এসবে রজো হয়।"[১৬] নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নে রামকৃষ্ণ সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের থেকে অনেক অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর কাছে 'যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা'। তৎকালীন অভিনয় জগতের অন্যতম অভিনেত্রী নটী বিনোদিনীকে তিনি আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ সমকালীন ভারতবর্ষে সর্বতোভাবে একজন বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব। সমাজ ধর্ম অর্থ সর্বক্ষেত্রে তাঁর মতামত প্রচলিত ধর্ম ধর্মজীবদের মত বাকচাতুর্যে পূর্ণ নয়। রামকৃষ্ণ যুগের ইতিহাসের

সারৎসারকে আপন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে আগামী সভ্যতার একটি প্রোজ্জ্বলদিককে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকীয় ধর্ম আন্দোলন যখন নানা সংস্কারবাদিতায় সমাচ্ছন্ন তখন রামকৃষ্ণ একক ভাবে সর্বধর্ম সমন্বয়েরও মহান মানবপ্রেমের দিকগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। শাস্ত্রাচার ও সংস্কারান্ধতার বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণের ভূমিকা সদর্থক; জাতীয় জীবনে ইংরেজীয়ানা ও ভোগসর্বস্বতা তাঁর আছে পরিত্যাজ্য; বাস্তব-যান্ত্রিক-প্রথাগত শিক্ষা তাঁর কাছে অগ্রহণীয়। বর্ণাধিকার শাসিত, সাম্প্রদায়িকতাময় ভারতবর্ষ তাঁর কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না। "রামকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব রীতিতে, তাঁর অশিক্ষিত গ্রাম্য রীতিতেই' এই পিরামিড আকৃতি যুক্ত সমাজ ও সভ্যতার বিরুদ্ধে, পৃথিবীর সমতলে প্রসারিত শোষণহীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও সভ্যতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। তিনি চাইছিলেন এক মানবিক বিশ্ব, যেখানে মানুষ স্বচ্ছন্দে মানুষের মুখোমুখি দাঁড়াবে, মাঝখানে থাকবে না ভয়ের, সন্ত্রাসের, বিচ্ছেদের দেয়াল।[১৭] রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন, জগত-সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এ ব্যাপারে সংশয় নেই যে, রামকৃষ্ণ উদারনীতিবাদী, সংস্কারহীন, মানবতাবাদী সহজ সরল লোকায়তিক জীবনের মুখ প্রবক্তা। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তার ফলে আজ রামকৃষ্ণ সর্বজন পূজ্য এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন আলোচক, গবেষক ও ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণের মিষ্টিক বৈশিষ্ট, ধর্মীয় ভাবনা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'লোকায়ত রামকৃষ্ণে'র সন্ধানে যাত্রা করেননি। কিন্তু রামকৃষ্ণের সামাজিক—ঐতিহাসিক ভূমিকা বিস্মৃত হলে চলবে না। কেননা—"Ramkrishnas' worldview reflected the passive from of protest of the liberal circles of the Indian public agoiuset the oppressior of the Britsh colonialists."[১৮] □

উৎস নির্দেশ :

১. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড : শংকরীপ্রসাদ বসু। কলকাতা, ১৯৮১। পৃঃ ২৯৭।

২. সোভিয়েত বিবেকানন্দ-অনুরাগী : একটি সাক্ষাৎকার। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৯১।

৩. World Theikers on Ramkrishna—Vivekanenda; Ed. by Swami Lokeswarananda.

৪. ঐ

৫. লোকায়ত রামকৃষ্ণ : পবিত্রকুমার ঘোষ। কলকাতা, ১৯৮৩।

৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (১ম ভাগ) : স্বামী সারদানন্দ। কলকাতা, ১৩৮৬।

৭. শ্রীরামকৃষ্ণ, শতবার্ষিকী থেকে সার্ধ শতবার্ষিকী : শংকরীপ্রসাদ বসু। দেশ, ৮ই মার্চ ১৯৮৬।

৮. কার্লমার্কস ও শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ : আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ, ৭ই মার্চ, ১৯৮৭।

৯. পূর্বোক্ত। ১০. পূর্বোক্ত। ১১. পূর্বোক্ত।

১২. শ্রীরামকৃষ্ণ : শতবার্ষিকী থেকে সার্ধ-শতবার্ষিকী / শংকরীপ্রসাদ বসু। দেশ, ৮ই মার্চ, ১৯৮৬, থেকে পুনরুদ্ধৃত।

১৩. পূর্বোক্ত।

১৪. গিরিশ মানস : উৎপল দত্ত। কলকাতা, ১৯৮৩।

১৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম) : শ্রীম। কলকাতা, ১৩৮৩।

১৬. পূর্বোক্ত (২য়)

১৭. লোকায়ত রামকৃষ্ণ : পবিত্রকুমার ঘোষ। কলকাতা, ১৯৮৩।

১৮. Indian philosophy in Modern times : V. Brodov. progress publishers, Moscow. 1984

শ্রীরামকৃষ্ণ : আন্তর্জাতিক সংকট ও সমাধান

সুদীপ বসু

'সংকট' শব্দটি আমাদের কাছে নতুন নয়। তা পৃথিবীতে বহু প্রচলিত এবং পরিচিত শব্দাবলীরই একটি। বলা চলে মানুষের আত্মসচেতনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই এই 'সংকটের' বোধ জেগেছে তার মনে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সংকটের যে রূপ তা সত্তার অস্তিত্বের সংকট। তখন চেতনার গভীরে বারবার উঁকি দিয়েছে এই প্রশ্ন—কেন এই পৃথিবীতে আসা? কি জন্য বেঁচে থাকা? যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয়ী জানিয়েছিলেন—'যেনাহং নামৃত স্যাং, তেনহং কিমু কুর্যাম্?'—এ জীবন নিয়ে কি করতে হয়, এ জীবন নিয়ে কি করব—এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাকুল মানুষ সেই পরম সত্তাকে জানতে চেয়েছে। এ 'সংকট' আত্মিক সংকট।

কিন্তু আন্তর্জাতিক সংকট? তার রূপ পৃথক হতে বাধ্য। কারণ মানুষ এখন দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের অ-স্বাভাবিক উন্নতির ফলে পৃথিবী সর্ব অর্থে ছোট। জীবন পূর্বের তুলনায় অনেক জটিল। উন্নত দেশগুলি পরস্পর অস্ত্র শানাচ্ছে। মানুষের অস্তিত্ব আজ নানা-ভাবেই বিপন্ন। সুতরাং সংকটের রূপটিও জটিল হতে বাধ্য। তা কেবল ভারতের কিংবা রাশিয়ার নয়, কিংবা জাপান বা আমেরিকার নয়, তা একইসঙ্গে সর্বদেশীয়। সংকট আজ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নৈতিক ক্ষেত্রে। মূলতঃ এই তিনটি ধারার ক্ষেত্রেই 'আন্তর্জাতিক সংকট' শব্দগুলির ব্যবহার আমরা করতে পারি।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন? রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই তাঁর কাছ থেকে আশা করা চলে না। কারণ রাজনীতির মানুষ তিনি নন। 'মাটির' মানুষ তিনি, সমাজের অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গেই তাঁর যোগ, রাজনীতির সঙ্গে তিনি সম্পর্ক-হীন। আর রাজনীতি আজও রাজার নীতি। জনসাধারণ তার থেকে অনেক দূরে; বলা ভাল, তাদের দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে। সুতরাং অর্থনৈতিক এবং নৈতিক সমস্যার কি সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন, তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

প্রথমে আসা যাক অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে। মানুষের প্রথম এবং প্রধান সমস্যা অর্থনীতিকেন্দ্রিক। জীবনচক্রের কীলক এই অর্থ, রজতচক্র। বস্তুতপক্ষে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে এ অর্থ। আর মানুষের অর্থ সংগ্রহের কারণ ক্ষুধানিবারণ। ক্ষুধারূপী দানবকে তুষ্ট রাখবার উপায় অর্থ। ভিক্ষু ঋষি বলেছিলেন—'ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধানিদ্বধং দদুঃ' (ঋক ১০/১১৭/১)। দেবতারা ক্ষুধা দেননি, দিয়েছেন মৃত্যু। কারণ ক্ষুধার অপর নামই মৃত্যু। তৎকালীন পৃথিবীতে এর রূপ এত ভয়াবহ ছিল না। তবুও মাঝে মাঝে বহু সংখ্যক মানুষ মারা যেত পেটের জ্বালায়, কখনো অপ-শাসনের ফলে, দুর্ভিক্ষে, কখনো মন্বন্তরে। আধুনিক যুগে

এই ক্ষুধার প্রশ্নটি প্রধান। আত্মসচেতন মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, কেন অপরিমেয় খাদ্য অল্পসংখ্যক মানুষের ঘরে জমা থাকবে? কেন সমস্ত লোক খাদ্য পাবে না? শ্রীরামকৃষ্ণ এই ক্ষুধার দাবীকে অস্বীকার করেন নি। বলেছিলেন, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।'

সারা ভারত পায়ে হেঁটে ঘুরে অসামান্য অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধবান বিবেকানন্দ আরোও বলেছিলেন 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' যখন পেটে খাবার যাবে, তখন ভগবানকে ডাকি, আর পেট খালি থাকলে মা মা বলে ডাকি। এই উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তারই প্রতিফলন ভিন্ন কিছু নয়।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, যখন দেখেছিলেন মানুষ অর্থসঞ্চয় ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারছে না। এমন কি সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই অর্থ-সঞ্চয়। তারই বিরুদ্ধে তিনি দাদা রামকুমারকে বলেছিলেন—'আমি চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখব না।' এ প্রতিবাদ অর্থকরী সমাজ ব্যবস্থারই বিরুদ্ধে। উনিশ শতকীয় ভারতে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী শিক্ষার আমদানী করেছিল। রামমোহন সহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা স্বাগত জানিয়েছিলেন তাকে, ভেবেছিলেন তা বুঝি ভারতবাসীর কাছে উন্নততর জ্ঞানচর্চার দ্বার খুলে দেবে। আর আজ বিশ শতকে কম্পিউটার শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। দুইয়েরই উদ্দেশ্য মূলে এক—শিক্ষার পাদ-পীঠে সরস্বতীকে সরিয়ে লক্ষ্মীকে বসানো। কিন্তু যে শিক্ষা মানুষের চেতনার উত্তরণ ঘটাবে, মনের প্রসারণে সাহায্য করবে, তা আজও আসেনি। যুদ্ধজনিত ভীতির সম্প্রসারণ ও অস্ত্র কেনা-বেচার ফলাও কারবারের মধ্যেও আছে দুরন্ত অর্থলিপ্সা শ্রীরামকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রতিবাদ ঐ ভয়াবহ অর্থকরী আত্মবিনাশী শিক্ষার বিরুদ্ধে।

অর্থের ভিন্নতর দিকটিও আমাদের দেখে নিতে হবে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি প্রথম বিশ্বের দেশগুলির অর্থ তৃষ্ণা। ঔপনিবেশিকতা এখন নতুন রূপ নিয়েছে। মুখোশের বদল হয়েছে ঔপনিবেশিকদের। এখন আর তারা সরাসরি নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে অর্থশোষণ করে না। কখনো যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে, কখনো কৃত্রিম মিত্রতার হাত বাড়িয়ে তৃতীয় বিশ্বের রক্ত শোষণ করা হচ্ছে। অর্থ সঞ্চয়ের এ এক নতুন ফন্দী। কিন্তু অর্থই যদি সমাজের নিয়ন্ত্রী শক্তি হয়ে ওঠে, তাহলে মানুষ কি রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত 'রক্তকরবী'র রাজা হয়ে দাঁড়াবে না? যদি সে মানুষ হয়, তাহলে তার 'হুঁশের' পরিচয় কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণ এই অর্থলোলুপ মানুষকেই পথ দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন—'টাকায় কি হয়? ডাল হয়, ভাত হয়। কিন্তু মানুষ হয়?' হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। টাকার প্রয়োজন নিশ্চয়ই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তার অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের পাশববৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে মাত্র। কেবলই ভোগ সর্বস্বতা, ঐহিকতা হয়ে দাঁড়ায় ঐ মানুষের পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমান করেছিলেন অর্থের এই অপব্যবহার মানুষের জীবনে কি চরম ক্ষতি ডেকে আনবে। মথুরবাবু যখন ষাট হাজার টাকার জমিদারী তাঁর 'বাবার' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নামে লিখে দিতে চাইলেন, তখন শিউরে উঠেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শিঙি মাছের মতো কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, যখন নরেন্দ্রনাথ বিছানার তলায় একটি টাকা রেখে দিয়েছিলেন। অর্থগৃধ্নু মানুষের চেতনা যে ফিরে আসা দরকার, তা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন এবং বাণীর দ্বারা দেখিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় সংকট নৈতিক ক্ষেত্রে। স্বাভাবিকভাবেই আজ সচেতন মানুষকে পীড়া দিচ্ছে এই প্রশ্নটি—নৈতিকতার কোনো মূল্য আজকের দিনে আছে কিনা? আরো পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে, আমরা বিভিন্ন মূল্যবোধকে মানব কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণের কালে ভারতবর্ষ ইউরোপীয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক শৃঙ্খলের অধীন। শুধু সিংহাসনে প্রভু বদলই ঘটেনি, এক অর্থে সমস্ত ভাবমণ্ডলই বদলে গেছে। ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলরা হিন্দুধর্মকে নস্যাৎ করলেন—Damn Hinduism. যা-ই হিন্দুত্ব, তা-ই খারাপ। অবিলম্বে পোশাকে, আহারে,

বিহারে সাহেব হওয়া দরকার, নইলে সভ্য হতে পারব না—এই হল ইয়ংবেঙ্গলী মত। মোহিতলাল মজুমদার সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন ঃ

"এযুগের যে সমস্যা, সে সমস্যা শুধু কোন এক দেশের এক সমাজের সমস্যা নয়, সারা জগতের সমস্যা।…একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এ যুগে পশ্চিম ভূখণ্ডের মনুষ্য সমাজই সর্বাপেক্ষা জীবিত বা জীবন্ত, প্রাচ্য প্রায় মুমূর্ষ; এই অতি জীবন্ত সমাজই জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা তুলিয়াছে তাহারেই বিষ-বাষ্পে সমগ্র জগৎ মূর্ছিত প্রায়। এবার সেই পাশ্চাত্যের মানুষেরই বেতাল বা ব্রহ্মপিশাচের মত এমন এক দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে—যাহার উত্তর না দিতে পারিলে মানুষের আর রক্ষা নাই। সে প্রশ্ন এই—মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য কি? মানুষ অর্থে দেহধারী জীব—আত্মা নয়। মানুষ হিসাবেই মানুষের জীবনের কোনো সদর্থ আছে কিনা?"[১]

প্রশ্নটি একালে আরো মারাত্মকভাবে উপস্থিত। কারণ মূল্যবোধগুলি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। নিউক্লিক আকারে সংসার রচনায় মানুষ এখন আগ্রহী। কিন্তু শান্তি নেই সেখানেও। কারণ একে অন্যের উপর বিশ্বাসহীন। পুরো সমাজটাই ভরে গেছে ব্যাভিচারে। যে সন্তানের জন্ম নিচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে এই সমাজব্যবস্থায়, তারা প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে আত্মীয়-পরিজনদের দুর্নীতিগ্রস্ত চেহারাটাকে। ফলে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রণার ঘাত-প্রতিঘাতে। মনে করছে কোনো কাল্পনিক পৃথিবীতে আশ্রয় নিতে পারলেই দুঃখ-বেদনার হাত থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং মারজুয়ানা, হেরোয়িন, ব্রাউনসুগার, কোকেন, এল-এস-ডি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের নেশা ধরছে। এহ সমস্যা আজ কেবল পৃথিবীর কোনো একটা নির্দিষ্ট দেশেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। উন্নত দেশগুলির অবস্থা আরো ভয়াবহ। সেখানে মানুষের প্রাথমিক সমস্যার (অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের) সমাধান হয়েছে। কিন্তু তরুণ-তরুণীদের অভাব অন্যত্র—মনে। জীবনের উদ্দেশ্য কি সেটাই বুঝতে পারছে না। দেখা গেছে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত শক্তিশালী দেশ জাপানে এই সমস্যা নিদারুণভাবে প্রকট। সেখানে মানুষ সব থেকে বেশি আত্মহত্যা করে অকিঞ্চিৎকর জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য। অন্তহীন যন্ত্রণাবোধ এবং হতাশা গোটা সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর চতুপার্শ্বে যে মানুষগুলি ছিল, তারা এই একই মনোবৃত্তির। আগামী সমাজের প্রতিফলন পড়েছিল তাদের জীবনচর্যায়। হুতোম পেঁচা (কোলীপ্রসন্ন সিংহ) যখন কলকাতাকে 'পাপপুরী' আখ্যা দেন, তখন বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, অনতিবিলম্বেই সারা বিশ্ব হয়ে দাঁড়াবে এই কলকাতার প্রতিচ্ছবি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দেব-দৃষ্টিতে এই সংকটের আশ্চর্য সমাধান করেছিলেন যখন স্টার থিয়েটারে নাটক দেখার পর সমবেত কুশীলবদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। সারা জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ এই চৈতন্য সত্তার সঙ্গে মানুষের যুক্ত হওয়ার কথাই বলে গেছেন। এমন কি জীবন সায়াহ্নে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যখন কল্পতরু হলেন ভক্তদের কৃপা করবেন বলে, তখনও ঐ একই মহাবাণী উচ্চারিত হল তাঁর কণ্ঠে ঃ 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা এবং সংগ্রাম ছিল এই চেতনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। 'মানুষ কি রকম গা?' —এও তাঁরই কথা। মানুষের সম্ভাবনা অনন্ত, অসীম। তার আনন্দের খনি বাইরে কোথাও নেই। নেই সুস্বাদু আহারে, অথবা মূল্যবান সাজ-পোষাকে। ওগুলি ক্ষণিকের জন্য চোখ ধাঁধায়, কিন্তু মন ভোলায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন আনন্দকে যদি চাও, তাহলে নিজের মধ্যে খুঁজতে হবে—

ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন।

একটু কিছু কর, তাহলেই হবে। এত সহজ করে এই বিরাট সমস্যার সমাধান বোধ হয় আর কেউ করেন নি। নিজে হাতে-কলমে করে দেখিয়ে গেছেন, বলেছেন—আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর। আধুনিক কালের চিন্তাশীল লেখকের শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সাধনার কথাই উঠে এসেছে—

"দক্ষিণেশ্বরে সাধকের আসনে বসে তিনি কি চাইছিলেন ? ঈশ্বরকে ? স্বয়ং ঈশ্বর ঈশ্বর-কলমে লাভের কোন্ সাধনা করবেন—কী প্রয়োজন তাঁর ? বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন মুক্তিই—জীবনের পারে মরণোত্তর মুক্তি বা আত্মার মুক্তিই নয়—সত্তার মুক্তি, চৈতন্যের মুক্তি ও আনন্দের মুক্তি, মুক্তি অর্থে সহজ অবাধতা—ছিল তাঁর সাধ্য—তাই-ই তাঁর লক্ষ্য। ঐ অখণ্ড জীবনের মুক্তি—অদ্বৈতের মুক্তি, দ্বৈতেরও মুক্তি ; আলো ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বিদ্যা ও অবিদ্যা, চেতনা ও অচেতনা, ঈশ্বর ও জড়—সবের ন্যায্য স্বীকৃতি ও সার্থকতা, সকলের সুষম সমন্বয়ও এই সকলের পারে, খণ্ড-অখণ্ডের পারে, দ্বৈতাদ্বৈতের পারে এক পূর্ণতম সমগ্রতায় মানবজাতির উত্তরণ—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যার লক্ষ্য। এমন সাধনা জগতের ইতিহাসে আর কেউ কখনো করেন নি।"[২]

নিখিল মানবতার কান্না যে মানুষটি শুনেছিলেন, তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। সে বেদনা বেজেছিল তাঁর প্রাণে। তাই স্বেচ্ছায় জীবদেহ স্বীকার করেছিলেন। নেমে এসেছিলেন ধুলো-মাটির মধ্যে মানুষকে পথ দেখাবার জন্য। সে পথ চৈতন্যের পথ, প্রেমে, ভালবাসায় আত্মস্থ হওয়ার পথ। বরাহনগরের কুঠীবাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতেন—'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।' যে আহ্বান কেবল রাখাল, নরেন, কিংবা গিরিশের প্রতি নয়, তা সর্বকালের, সর্ব মানুষের প্রতি। ক্ষুদ্র-পিপাসা কামনাতুর জীবকে শিবত্ব দান করবার জন্যই এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের অবির্ভাব। রাজনীতির উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিতরা কেড়ে নিয়েছে জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন, লজার বস্ত্র। একা শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন অসহায় মানবতার পক্ষে। তিনি আমাদের মুখে তুলে দেবেন অমৃত, সাজাবেন দিব্য বস্ত্র, চেতনার আবরণে এবং আভরণে। নানা জীবন জিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আমাদের কণ্ঠ যখন তৃতীয় শুষ্ক, যখন-এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করি তখন ফিরে যেতে হয়। সমাধিমগ্ন দিব্যহাসিতে উদ্ভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, যিনি অমৃতের সমুদ্র নিয়ে বসে আছেন আমাদের জন্য, কেবল আমাদেরই জন্য। □

উৎস নির্দেশ :

১. বীরসন্ন্যাসী, পৃঃ ৭
২. শ্রীরামকৃষ্ণমঙ্গল, পৃঃ ২৩৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ পার্ষদদের দৃষ্টিতে

রামনারায়ণ ঘোষ

শ্রীগীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন—

"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীনাঞ্চ সর্বশঃ ॥" (১০/২)

অর্থাৎ "দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেউই আমার প্রভাব বা উৎপত্তি জানেন না। কারণ, আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারে আদি কারণ।" আবার অর্জুন বলছেন—

"আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥" (১০/১৩)

অর্থাৎ "ভৃগু আদি সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস আপনাকে সনাতন পুরুষ দিব্য অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ আদিদেব, জন্মাদিরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভু বলেছেন। আপনি নিজেও আমাকে তাই বলেছেন।" যেখানে দেবগণ বা মহর্ষিরা শ্রীভগবানের স্বরূপ জানেন না, সেখানে মানুষের পক্ষে অনুধাবন কষ্টসাধ্য। তাই শ্রীভগবান ধরাধামে লোকালয়ে নেমে আসেন অবতার রূপে নরের আকারে। অবতার পুরুষ তাঁর নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছে, তাঁর ঘনিষ্ঠ সাধক ও শিষ্যদের কাছে। শ্রীকৃষ্ণকে জেনেছিলেন ভীষ্ম, বিদুর, কুন্তী, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, উদ্ধব প্রভৃতিরা তাঁদের মত করে। আবার, কাউকে কাউকে তিনি বলেছেন নিজের দিব্য স্বরূপের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে দেখি একই নাটকের পুনরাভিনয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গদের—শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, শ্রীম, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, গোপালের মা, যোগীনমা, গোলাপমা প্রভৃতিদের। এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দিনে-রাতে দেখেছেন একেবারে কাছ থেকে। এছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণকে জেনেছিলেন ক্ষুদিরাম, তোতাপুরী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, গৌরী পণ্ডিত, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ, নারায়ণ শাস্ত্রী, ভগবানদাস বাবাজী, মথুরবাবু, রাণী রাসমণি প্রভৃতিরা। আবার, তিনি নিজের স্বরূপ নিজেই বলেছেন অন্তরঙ্গদের কাছে—'অচেনা গাছ', 'দিগন্তব্যাপী মাঠের দেওয়ালের 'ফুটো,' যার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়।' তবে পার্ষদদের তপস্যাপূত দৃষ্টিতে অনেকখানি ধরা পড়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে আমরা মাত্র কয়েকজন পার্ষদদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব, যাঁদের দৃষ্টি-আয়নাতে স্বচ্ছরূপে প্রতিফলিত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে সবচেয়ে বেশী বুঝেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধিবান পুরুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিতে শক্তিমান, সহস্রদল পদ্মের মত সৌরভ বিস্তারকারী, খাপখোলা তলোয়ার,

আঠারো শক্তিতে ভরপুর, ইতিহাসবেত্তা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত, কর্মবীর ও যুগনায়ক। তিনিই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান পার্ষদ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলতেন, "আমি বলতে গেলে বলবো ঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য একমাত্র স্বামীজীই। আর কেউ নয়। এই কথারই প্রতিধ্বনিত করেন স্বামী শিবানন্দজী,—"তাই তো তাই তো। তাঁর কি Capicty (শক্তি)! আমরা ঠাকুরকে বুঝতে পারতাম না। কিন্তু তাঁর capicty (শক্তি) ছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্রের ভাষ্যকার স্বামীজী। তবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন—শিব গড়তে গিয়ে বানর তৈরী করে বসবেন ভেবে। তাহলেও তিনি রেখে গেছেন গুটিকয়েক সংস্কৃত স্তোত্র, আরাত্রিক ভজন, বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণ কথা, লিখে গেছেন পত্রাবলীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা। এগুলি গ্রথিত করলে হয়ে উঠবে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বরূপমালা। স্বামীজী বলতেন, "আপনার ভেতর থেকে সব বের হয়েছে, সারা বিশ্ব।" শ্রীরামকৃষ্ণের 'সমগ্র জীবনই একটি ধর্মমহাসভা-স্বরূপ ছিল। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন নিরঞ্জন-নররূপধর, নিগুর্ণ আবার গুণময়, চিদঘনকায়, ভাস্বর, ভাবসাগর, প্রেমপাথর, যুগ ঈশ্বর, করুণাঘন, ত্যাগীশ্বর, বাক্যমনাতীত। তিনি সন্দেহ-রূপ রাক্ষসের বিনাশী মহাস্ত্ররূপ, সংসার রোগের চিকিৎসক, সর্বদা অদ্বৈতে সমাহিত মন, ভক্তি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত তাঁর চরিত্র, তাঁর জীবন লোক-কল্যাণে মুক্ত। নরদেব তিনি। তিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। ধর্মস্থাপনকর্তা, সর্বধর্মের স্বরূপ, অবতার বরিষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভগবানের 'বাবা'। স্বামীজীর সিদ্ধান্ত ছিল-"রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহৈতুকী দয়া, সে intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধজীবনের জন্য-এ জগতে আর নাই।" শাস্ত্রে উল্লিখিত জ্ঞান ও মতবাদের মূর্ত দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি ছিলেন শাস্ত্র সমূহের মতবাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। তিনি মাত্র একান্ন বছরের জীবনে জীবন-যাপন করেছেন পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন। তিনি সকল সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। তাঁর আবির্ভাবের পর হতে Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব। রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবনে দয়া।" শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্বামীজী দেখেছিলেন এক জীবন্ত সগুণ আদর্শ, এক ধর্মবীর আদর্শ।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ একেবারে নিরক্ষর, মেষপালকের গৃহে জন্ম; স্বামীজীর কর্মযোগে কখনও ধরা দেননি তিনি। সারাটা জীবন কাটিয়েছেন ধ্যান-ধারণায়, সংঘজীবনে আবদ্ধ হননি। ভক্ত প্রবর রামচন্দ্রের গৃহভক্ত ছিলেন লাটু মহারাজ। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন লাটুকে বর্ণ পরিচয় করাতে। তবে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব, অধ্যাত্ম সম্পদে ধনী, পরম শরণাগত, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক। দিনে-রাতে থেকেছেন দেবমানবের সঙ্গে। তবুও বুঝতে উঠতে পারেন নি সম্পূর্ণভাবে। বুঝেছিলেন 'নোরেনের' মাধ্যমে। তবুও গুরুভাইরা বলতেন, 'তবে ঠাকুরকে ঠিক ঠিক ধরেছে লেটো'। একবার নরেন্দ্র মস্করা করে ঠাকুরকে পাগলা বললে স্থিতধী-নম্র সরল লেটো বলেছিলেন, "হামি রাতদিন ওনার সাথে আছি, বাকী হামনে ত কখনো তাঁর কোন বেচাল দেখে না, আউর কাউকেই ত তিনি কখনো ভেল্কি দেখান না।" শ্রীঠাকুরের ভালবাসার স্বীকারোক্তি জানিয়েছেন—"হামার উপর ভালবাসা ডেলে (অর্থাৎ ঢেলে) দিতেন। হামায় তিনিই তো দেখালেন।" ব্রহ্মনেশায় ভরপুর লাটু মহারাজ বলতেন—"জানো। ঠাকুর হামাকে টেনে নিলেন। হামি একটা অনাথ কুথাকার কে-হামায় তিনি ভালবাসা ডেলে (ঢেলে) দিলেন। হামায় তিনি কৃপা না করলে হামাকে নকরী করতে করতে বকরী বনে যেতে হোতো; হামার সারাজীবন বিলকুল লষ্টো (নষ্ট) হোয়ে যেতো। হামাকে তিনিই ত এসব শিখাতেন, হামি মুখ্যু, হামি এসব কী জানবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের দৌলতে সাধন-ভজন সব কিছু পেয়েছিলেন লাটু মহারাজ। ভক্তদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলতেন, "আরে! তাঁরই ত কথা—শিবই জীব হয়ে ঘটে ঘটে

বিরাজ করেন। তোমাদের এ কেমন ভাব জানি না। তিনি কি ছিলেন তা কি হামনেই বুঝেছি? নোরেন ভাই কুছ্ বুঝেছে—সেই ত হামাদের বুঝালে।...হামি জানে তিনি ছাড়া হামার গতি নেই।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দাস্যভক্তির প্রতিমূর্তি, গোঁড়া ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে সুপণ্ডিত, পুজো-অর্চনায় পরম পারঙ্গম, সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা সর্বাবস্থায় সর্বতোভাবে জীবন্ত ছিলেন শশী মহারাজের কাছে। সশরীরে শ্রীরামকৃষ্ণকে যে ভাবে সেবা করতেন তিনি, ঠিক সে-ভাবে তিনি সেবা করতেন শ্রীঠাকুরের ফটোকে। দুই তাঁর কাছে অভিন্ন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মাষ্টমীতে শ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থির কলসকে যখন মাটি দিয়ে চাপা দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি কেঁদে উঠেছিলেন ঠাকুরের গায়ে লাগছে বলে—'ঠাকুর যে সদা-বিদ্যমান, সদা-সচেতন।' বরাহনগরে সকালবেলায় ঠাকুরের দাঁতন থেঁতো করে দেননি বলে বকেছিলেন একজন সাধুকে। গরমের দিনে ঠাকুরের কষ্ট হবে বলে সারারাত হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করেছেন ফটোকে। ঠাকুর ঘরের ছাদ থেকে জল পড়বে বলে ফটোর উপর ছাতা ধরে বসেছিলেন শশী মহারাজ। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ছিল—"তাঁহার নিজের আমিত্ব তাঁহার ভিতর ছিল না বলিয়া জগৎ-প্রসূতি কালীর আমিত্বই তাহার ভিতর দিয়া সর্বতোভাবে প্রকাশ পাইত। অর্থাৎ বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার অসংখ্য পুত্র কন্যাগণকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।" শশী মহারাজের কাছে "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সকলই অলৌকিক। তাঁহার হৃদয় অনন্ত আকাশের ন্যায় বিশাল ছিল। এইহেতু তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ আবাল্য তপস্বী, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগী মহাপুরুষ, যোগরত ত্যাগব্রত তুরীয়, আখ্যাত বেদান্তসিংহ। বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ, বেদান্ত প্রচারক তিনি। বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়িতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনের তাঁর অনুভূতি—"...কি অপূর্ব জ্যোতি মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে! মনে হইল, শাস্ত্রে যে শুকদেবের কথা শুনিয়াছি, ইনি কি সেই শুকদেব।" একবার নরেন্দ্রনাথ তুরীয়ানন্দের কাছে শুনতে চেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথা। উত্তরে শিবমহিম্নঃ স্তোত্র হতে এক ছত্র আবৃত্তি করে তিনি শোনালেন শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বরূপ ঃ

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

অর্থাৎ "নীল পর্বত যদি কালি হয়, সাগর যদি মসিপাত্র হয়, পারিজাত বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি লিখিবার পত্র হয়, আর এই সমস্ত বস্তু লইয়া সরস্বতী যদি চিরকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন,—তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার গুণ সমূহের ইয়ত্তা হইতে পারে না।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্মবীর সেবাব্রতী, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৃতীয় অধ্যক্ষ, মঠ-মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষ সেবাকাজের প্রবর্তক, মিশনের প্রথম শাখা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, পরিব্রাজক, কঠোর তপস্বী, নিবেদিতার 'Famine Swami'। তিনি আধ্যাত্মিকভাবের অমৃত পান করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-সমুদ্র মন্থন করে। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অনাদি-অনন্ত সাক্ষাৎ ভগবান। দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীঠাকুর প্রস্তরময় শিবকে চৈতন্যময় দেখালেন গঙ্গাধর মহারাজকে। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণই জ্ঞানভক্তিরূপ গঙ্গার উৎস। শ্রীঠাকুরের 'এক একটা কথায় বেদ-বেদান্ত বোঝা কত সহজ হয়ে যেত'। সারগাছিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন ব্যষ্টিরূপে—অন্নপূর্ণা রূপে। তাঁর দৃষ্টিতে—"শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও তাহাকে তাহার ধর্মমতের জন্য নিন্দা করিতেন না। যে যেখানে আছে, সেখান হইতে তিনি তাহাকে তাহারই পথে আগাইয়া দিতেন। তিনি সকল

ধর্মমতের কথাই শুনিতেন, এবং সরল সত্যবাদী ও যথার্থ বিশ্বাসীর উপর তাঁহার কৃপা বর্ষিত হইত। যদি কোন কিছুর তিনি নিন্দা করিতেন, তাহা কপটতা বা ভণ্ডামির।" "প্রভুর সর্বধর্মসমন্বয় ও কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি ও রাজযোগের অপূর্ব সমীকরণের প্রভাবে মানবজাতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছে। পরে এমন শুভদিন আসিতেছে, যখন জগতে এক সার্বভৌম শান্তি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভুর 'আহবানে' সকল প্রকার বিবাদ বিসংবাদ—বর্জিত, উদ্বুদ্ধ ও সত্যবদ্ধ আপামর জনসাধারণ সমস্বরে প্রভুর 'যত মত তত পথ' বাণীর জয় ঘোষণায় রত এবং নবযুগের পতকামূলে সমবেত হইবে। তখনই প্রভুর আগমনের মাধ্যন্দিন প্রভায় সমগ্র জগৎ আলোচিত হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সুলেখক কলির ব্যাস অমর শ্রীমর প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ শুকদেব। শ্রীমর দৃষ্টিতে 'ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন' ঠাকুরকে। 'যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক'। কথামৃতকার সর্বদা দেখেছেন সদানন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি। সমাধি ও নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের বহু চিত্র এঁকেছেন তিনি। শ্রীঠাকুর দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু গভীর তত্ত্ব সহজ করে বুঝাতে অদ্বিতীয়। শ্রীমর চোখে পড়েনি এ-হেন দ্বিতীয় মহাপুরুষকে। শ্রীঠাকুর নিরাকার-বাদী, আবার সাকারে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস। ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন তিনি, আবার দেব-দেবী, প্রতিমাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করেন। খাট-বিছানায় ঘুমোন, লাল পেড়ে কাপড় পরেন, কিন্তু 'এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদারভাব কখনও কোথাও' দেখেননি। তিনি সংসার-বিরাগী নররূপধারী পরম সন্ন্যাসী, পরমহংস। ব্রহ্মগতপ্রাণ তাঁর, জীবের দুঃখে কাতর তিনি, ভক্তবৎসল। সৃষ্টি হতে এ পর্যন্ত মত বিষয়ে মানুষের অন্তরে যত রকম সমস্যা আছে, সব সমস্যা পূরণ করেছেন তিনি। নেই কোন বিদ্বেষভাব, আদর করেন সকল ধর্মাবলম্বীদের।

মহাকবি নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে ভৈরব, শূরভক্ত পাঁচসিকা পাঁচ আনার বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেরা, তবুও তিনি গ্রহণ করেছিলেন পাপী গিরিশকে। কোন কিছু নিষেধ করেননি তিনি। তাঁর কৃপায় সব কিছু আপনা-আপনি ছুটে গিয়েছিল গিরিশের। অন্তরঙ্গতায় বুঝতে পারলেন গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ। তিনি বলেছিলেন, "জানি না তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি।…তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া খাওয়াইতেন—আবার পিতার ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের আদর্শ।…আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না; কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মতো ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই; কিন্তু তিনি আমার পরমবন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় অধিক ভালবাসিতেন।" শ্রীঠাকুর তাঁর বকলমা' নিয়েছিলেন। গিরিশের বিশ্বাস-"ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি?" তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন—

"সকল মঙ্গলময়, পূর্ণ বিরাজিত, / প্রেমের আধার!
নির্বিকার, হর্ষ,-শোক-বাসনা বর্জিত, / জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার!
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার, / নির্মল-অনিল স্পর্শে যাঁর,
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিতজনের শান্তি / চরণে হরণ ধরা ভার,
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার।"

অক্ষয় কুমার সেন গ্রামের মানুষ, মাস্টার, গ্রামবাসিদের জন্য লিখেছেন সহজ সরল কবিতার ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকথা—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'। এতে শ্রীরামকৃষ্ণকে পোঁছে দিয়েছেন সকল স্তরের সাধারণ মানুষের কাছে। জনগণের কবি অক্ষয়কুমার জনগণের শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলে ধরেছেন জনগণের সামনে—

"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসে নামধারী ॥ / তুমি শিব তুমি শক্তি নারায়ণ তুমি।
তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ অখিলের স্বামী ॥ / তুমিই সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্মহরি।
জয় জয় রামকৃষ্ণ নররূপধারী ॥ / জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ / জয় হে অনাথ-নাথ পতিত পাবন।
জয় জয় দীনবন্ধু অধম-তারণ ॥ / কৃপাসিন্ধু দীনের ঠাকুর তুমি হরি।"

গোপালের মা বালবিধবা, তপস্বিনী, লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিতা। থাকেন কামারহাটিতে গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুর বাড়িতে। নিত্য গঙ্গা স্নান করেন, দিন কাটে জপ-ধ্যানে ও রাধা-কৃষ্ণের সেবায়। তিরিশটি বছর এমন করেই কাটিয়েছেন গোপালের মা। এরপরে মিলল শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন। হয়ে গেল সব ওলট-পালট। জপ করে সমর্পণ করছেন গোপাল ইষ্টকে, বামপাশে দর্শন করছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। যেমনিই হাত ধরা, অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে গেলেন গোপাল। তাঁর কাছে তাঁর ইষ্ট গোপালই শ্রীরামকৃষ্ণ। একেবারে জীবন্ত—কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে বসে, ঘুরে বেড়ায় ঘরের চারদিকে। দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছেন গোপালের মা ; দেখেন গোপালের লালটুকটুকে পা দুখানি ঝুলছে বুকের উপর। যোগীন মা প্রভৃতিরা যখন শ্রীঠাকুরের কাছে যেতেন, তাঁদের শ্রীঠাকুরকে পুরুষ বলে মনে হত না। তিনি তাঁদেরই একজন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা যোগীন মা ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখেছিলেন গোপালকে। একবার গোলাপ মার বাড়ীতে গেছেন শ্রীঠাকুর। গোলাপ মা 'আহ্লাদে' ভরপুর। এমন সুখ জীবনে তিনি কোনদিন পাননি। তিনি দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সর্পাকারা কুণ্ডলিনীরা খাবার খাচ্ছে। সুপণ্ডিত গৌরী মা শ্রীঠাকুরকে দেখেছিলেন তাঁর ইষ্ট দামোদররূপে। তাঁর দৃষ্টিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য-এ দুরে অভেদ'। তিনি সদর্পে সোচ্চারে ঘোষণা করতেন 'যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল সন্ন্যাসী, গৃহী ও মহিলা পার্ষদ। তাঁদের প্রত্যেককে তিনি তৈরী করেছিলেন তাঁদের প্রকৃতি অনুযায়ী। তাঁরাও শ্রীঠাকুরকে বুঝেছিলেন তাঁদের মত করে। সকলের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ আকর হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার সূত্রে প্রত্যক্ষ করা গেল শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা, যাতে অনেকখানি ফুটে উঠেছে তাঁর দিব্য স্বরূপ। □

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. শ্রীশ্রীগীতা-স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত
২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড
৩. শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ
৪. প্রার্থনা ও সঙ্গীত—স্বামী তেজসানন্দ কর্তৃক সংকলিত
৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম, ১ম-৫ম ভাগ
৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ও ২য় ভাগ
৭. শ্রীম দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ৯ম, ১৩শ, ১৫শ খণ্ড
৮. শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
৯. উদ্বোধন, ৮৯তম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৯৩
১০. স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত
১১. স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাবলী
১২. স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ
১৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন
১৪. গিরিশ রচনাবলী—ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ৫ম খণ্ড

নিবেদিতা মানসে শ্রীরামকৃষ্ণ

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

নিবেদিতা রামকৃষ্ণকে চাক্ষুষ দেখেন নি, তাঁকে তিনি দেখেছেন অন্যের দেখার আলোকে। কিন্তু নিবেদিতার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল, সেটি হল ভাষার মাধ্যমে বহু বর্ণময়, রূপময় চিত্রকল্প সৃষ্টির। সাধারণতঃ শক্তিমান কবিদেরই এই ক্ষমতা থাকে, কিন্তু নিবেদিতার ক্ষমতা আরও বেশি, কারণ তিনি গদ্যের মাধ্যমেই অসাধারণ চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে পারতেন। সেজন্য তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে রামকৃষ্ণ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছেন, তাঁর অলোকসামান্য গুণগ্রাম একের পর এক রূপ পরিগ্রহ করেছে, এবং পরিশেষে রামকৃষ্ণের বিশ্বম্ভর মূর্তিটি যেন জ্যোতির্লেখায় জ্বল জ্বল করে উঠেছে। সেজন্যই রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনার অসামান্য মূল্য আছে। তা ছাড়া এই রচনারাজির মধ্যে নিবেদিতাকেও আমরা দেখতে পাই মূর্তিমতী শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞারূপে। তার মূল্যও কম নয়।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার আলোচনার পরিমাণ বেশি নয়। কিন্তু এই স্বল্পপরিসরে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা আবিষ্কার করেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর নিজস্ব প্রকাশগুণে সে আবিষ্কারগুলি অনন্য সম্পদ হয়ে উঠেছে।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু। এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সরলাবালা সরকার তাঁর 'নিবেদিতা' নামক গ্রন্থে। সেখানে তিনি লিখেছেন—'মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র টাঙানো ছিল। তাহার অপরদিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন ঐ মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলেই থাকা উচিত।"

এই বিবৃতি ছাড়া অন্য কোথায়ও নিবেদিতা রামকৃষ্ণকে 'অবতারপুরুষ' বা 'জগদ্‌গুরু' বলে সরাসরি ঘোষণা করেন নি। কিন্তু এটি তাঁর একটি রচনাকৌশল, সোজাসুজি বলেন নি, কিন্তু আলোচনাক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর পরমপুরুষ রূপটি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন।

অবশ্য তাঁর 'কালি দি মাদার' গ্রন্থের আলোচনাটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। গ্রন্থের শুরুতে তিনি রামকৃষ্ণকে 'মানবসন্তানের জন্য বিশ্বমাতার ভালোবাসার অবতার' বলে অভিহিত করেছেন, একান্ত শ্রদ্ধায় প্রণতি নিবেদন করেছেন। এই আলোচনার প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি অনুচ্ছেদে রামকৃষ্ণের এই মূর্তিটিকে ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের চরিত্রের ও শিক্ষার অসামান্য দিকগুলি একে একে ফুটে উঠেছে আশ্চর্যভাবে। এ কাজে একদিকে যেমন তিনি চিত্রকল্প-সৃষ্টির সহায়তা নিয়েছেন, তেমনি অপরদিকে সাক্ষ্য প্রমাণ ও

যুক্তিবিচারের—এ দুয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। রামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে—তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এত বেশি স্বপ্রকাশ হয়েছিলেন যে, যাঁরা তাঁকে জানতেন ও ভালোবাসতেন তাঁদেরই অনেকে আজও তাঁর কথা বলতে গিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলেন—'প্রভু আমাদের' এ কথা মনে রাখতে হবে। নিবেদিতা যা-ই বলেছেন তা কল্পনাবিলাস নয়, তা প্রমাণসিদ্ধ করে উপস্থাপিত করেছেন।

এখানে রামকৃষ্ণের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—দেহ ও মনের—তিনি অল্প-কথায় সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন যাতে তাঁর অসাধারণত্ব সহজেই ফুটে ওঠে। যেমন বলছেন—'তাঁর মধ্যে অহং-এর লেশমাত্র ছিল না।' আবার বলেছেন—'প্রথম জীবনে তার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ ভালো ছিল, কারণ যে-আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড় তার মধ্যে প্রবলবেগে বয়ে গিয়েছে পঞ্চাশ বৎসর ধরে, তার ধাক্কা তাঁকে সামলাতে হয়েছে।' তবে নিবেদিতার মতে সবচেয়ে আশ্চর্য তার মনের বৈশিষ্ট্য। তার অনন্যসাধারণত্ব উদ্ঘাটন করে নিবেদিতা মন্তব্য করেছেন—'কিন্তু এর চেয়েও (দৈহিক শক্তির চেয়েও) আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর চরিত্রের জটিলতা, বহুমুখিতা ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি, যার ফলে তিনি প্রতি মানুষের সমস্যার কথা বুঝতে পারতেন, যেন সেগুলি তাঁর নিজেরই সমস্যা। আধুনিককালে তিনিই যথার্থ বিশ্বমানব—সর্বাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারী।' 'এই বিশ্বমানবের পরমচেতনায় সবকিছু এক মহান ঐক্যে পরিণত হয়েছিল।' নিবেদিতা তাও এখানে লক্ষ্য করেছেন।

অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা সম্পন্ন নিবেদিতার এ কথা জানা ছিল—একটি মানুষের পরিচয় সবচেয়ে পরিস্ফুট তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, সেজন্য তার পরিচয় দিতে গেলে তার পরিবেশটি ফুটিয়ে তোলা দরকার। রামকৃষ্ণের পরিবেশটি অপূর্ব চিত্রকল্প সৃষ্টির সাহায্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার বর্ণনায় তিনি বলেছেন যে, বিশ্বমানব রামকৃষ্ণ বাস করেছেন যে কক্ষে সেখানে উপকরণবাহুল্য আদৌ ছিল না, নিঃস্বতার সাক্ষ্য তার সর্বত্র, 'কিন্তু অকিঞ্চনের এত সৌন্দর্য আর দেখি নি।' শেষ কথা কয়টি স্বল্প, কিন্তু তা প্রকাশ করেছে অনেক কিছু। যে মহান ঐক্য রামকৃষ্ণের চেতনায় পরিস্ফুট হয়েছিল 'তার প্রশান্তি আজও সেই ছোট্ট ঘরটিকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, যে ঘরটিতে একদা তিনি বাস করতেন, এবং সেই বিরাট ধ্যানতরুর নীচে আজও তা বিরাজ করছে এক পরাক্রান্ত উপস্থিতির মতো।' এ কথা কয়টি নিবেদিতা বলেছেন এমন করে যে সেই 'প্রশান্তি' সেই 'পরাক্রান্ত উপস্থিতি' পাঠকের মনেও ক্ষণেকের জন্য ছায়াপাত করে।

অনুরূপ স্বল্পকথায় নিবেদিতা রামকৃষ্ণের লোকোত্তর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অলোকসামান্য মনীষা ফুটিয়ে তুলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতেও ভোলেন নি। কথা কয়টি হল—'বড় বড় পণ্ডিত ও প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এখানে এসে গৌরবান্বিত বোধ করতেন, এবং 'প্রভুর কাছে তাদের মনে হোত যেন শিশু'—সেখানে উপস্থিত থাকতেন এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন—'রামকৃষ্ণের প্রভাব আমোঘ ছিল, যাকে স্পর্শ করতো তার মধ্যে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যেতো। প্রমাণ স্বরূপ নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন কেশবচন্দ্রের রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে ঈশ্বরের মাতৃভাবের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হবার কথা। শুধু কেশবচন্দ্র কেনো উত্তরকালের ভারতের সমগ্র মনীষাই অনেকখানি রামকৃষ্ণের স্পর্শে উন্মোচিত, এই মনীষাই নূতন যুগে ভারতের অগ্রগতির পথ নির্মাণ করেছে। ছোট্ট একটি মন্তব্যে নিবেদিতা এই বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে—'বর্তমান ভারতের অনেক শক্তিমান ব্যক্তিই তাঁর পদপ্রান্তে বসেছেন।'

রামকৃষ্ণের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আরও অনেক হয়তো বলেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের এমন একটি সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত দিকে নিবেদিতা আলোকপাত করেছেন যা আমাদের বর্তমানকালে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের বিস্ময় জাগে নিবেদিতা কেমন ক'রে রামকৃষ্ণকে 'কৃষিজীবি ব্রাহ্মণ কুলে আগত' বলে বর্ণনা করলেন, যখন তাঁর সমসাময়িক কালে সকলেই রামকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ কুলে আবির্ভাবের উপরেই কেবল জোর দিয়েছেন। কৃষিজীবীরাই ভারতের জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সুতরাং রামকৃষ্ণের আবির্ভাব তাদের মধ্য হতে, তিনি জনগণের জীবনে নূতন অভ্যুদয়ের প্রতিভূ। বিবেকানন্দকে আধুনিক-কালের এক কবি অভিহিত করেছেন—'অগণিত নগণ্যের হৃৎপদ্মে উত্থিত সম্রাট' এই নামে; সে অভিধা রামকৃষ্ণের জন্মসূত্রেই প্রাপ্য, তাঁর মানবপ্রেমের জন্য তো বটেই। নিবেদিতাই প্রথম এদিকে আমাদের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন।

রামকৃষ্ণ প্রায়-নিরক্ষর ছিলেন—এই কথাটি আজ বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে যার ফলে একজন আধুনিক পণ্ডিত তো মন্তব্যই করে বসলেন, 'প্রায় নিরক্ষর এই ব্যক্তিটির পক্ষে বেদান্তের তত্ত্ব বোঝা সম্ভবই ছিল না।' অথচ বেদের একনাম শ্রুতি এজন্যই যে তা শ্রবণ করেই আয়ত্ত করা হত। নিবেদিতা এদিকেও প্রভূত আলোকপাত করেছেন। যেন আধুনিক পণ্ডিতম্মন্যদের ভ্রান্তি-নিরসনের জন্যই তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করে বলছেন—'প্রায়-নিরক্ষর এই মানুষটি কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিরাট পণ্ডিত। কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণ শ্রুতিধর, যার ফলে অনুবাদসহ সংস্কৃত শব্দগুলিকে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারতেন এবং নানা সময়ে বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অসাধারণ বিরাট হয়েছিল।' শ্রীরামকৃষ্ণ অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার-সহ অনন্যসাধারণ মনীষী না হলে সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ তাঁর পদতলে শিশুর মতো উপবেশন করবেন কেন? এদিকটি উদ্ঘাটনের প্রয়োজনীয়তা নিবেদিতা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন।

কিন্তু রামকৃষ্ণের এই মনীষা দিব্যত্বে অসাধারণ, ঐশী বা অনুরূপ কোনো শক্তিসম্পন্ন। এই দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন নিবেদিতা পরবর্তী মন্তব্যে—'তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকেরা অনুভব করত এমন একটি শক্তি, যার কূলকিনারা তারা করতে পারতো না; এমন জ্ঞানরাশি তাঁর মধ্য হতে উৎসারিত হোত, যার গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না তাদের।' রামকৃষ্ণের ঐশী শক্তি আরও ভাস্বর অপরূপ আর একটি মন্তব্যে—'তিনি যেন একটি মহান সঙ্গীত, ঐ সঙ্গীত যাঁর স্পর্শ বয়ে আনছে তাঁর সান্নিধ্য থেকেই তারই যেন আভাস পেত সমাগত মানুষেরা, তারপর যখন আপন আপন দৈনন্দিন কাজে তারা ফিরে যেতো, তখন তারা আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও বলীয়ান হয়ে উঠেছে।'

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, রামকৃষ্ণ তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্বের একদিকে ছিলেন সদানন্দ পুরুষ, বালক ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গ-তামাসায় নিযুক্ত। কিন্তু রঙ্গ তামাসা, হাসি আনন্দ খেলা সব এক লক্ষ্যে ধাবমান ছিল, অনায়াসে নদীস্রোতের মতো সকলকে চেতনার ঊর্ধলোকে নিয়ে যেতো, অবগাহন করাতো সত্যসমুদ্রে। মনোরম একটি চিত্রকল্পের সাহায্যে নিবেদিতা রামকৃষ্ণের এদিকটি উদ্ভাসিত করে তুলেছেন—'জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে সেখানে বিরাজ করতো হাসি ও রঙ্গ। তাঁদের গুরু কখনও নিরানন্দ হয়ে থাকতেন না। তাঁর নিঃশ্বাস-বায়ুতে যেন বিরাজ করতো একটি প্রসন্ন প্রফুল্লতা। সেই পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতো মুহুর্মুহুঃ আনন্দ-উদ্বেল সমাধিতে এবং সমাধিভঙ্গের পর ভাবের এক অপূর্ব উদ্দীপনে। 'সকল প্রাণীর কাছে যা রাত্রি, আত্মসংযমীর কাছে তা দিন; আর যখন সকল প্রাণী জাগ্রত, জ্ঞানী সেখানে সুপ্ত'—এই বক্তব্যের সংস্কৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি সকলকে গভীর রাত্রে জাগিয়ে দিতেন, তার পর বাইরে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে ধ্যানে বসতেন; তেমনি আবার কতদিন কেটে গেছে তাঁর স্বহস্তে লাগানো সুন্দর লতাগাছে দোলা খেয়ে, হাসি-তামাসার মধ্যে এবং বাগানে চড়ুইভাতি করে। সময়ের স্রোত বয়ে গেছে, যেন কোনো পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যই তার নেই—অথচ সকলের অলক্ষিতে কয়েকটি যুগান্তকারী ভাবধারা সঞ্চারিত হচ্ছিল।…সর্বোপরি তারা সেই পরম সত্যের মহাসমুদ্রে অবগাহন করতে পেত।' সমস্ত বর্ণনাটি পড়লে আমাদের চোখের সামনে ছবিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—নানাবর্ণের পুষ্প-তরুলতা-শোভিত, পুষ্প-সুরভিত দক্ষিণেশ্বর, মুহুর্মুহুঃ সমাধিমান্ পরম আনন্দময় পরম পুরুষের সান্নিধ্যে কয়েকটি আনন্দমগ্ন তরুণ। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার শেষ ব্যঞ্জনাটি অপূর্ব, দক্ষিণেশ্বরের ঐ

জীবনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন একজনের অল্প কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে নিবেদিতা সুকৌশলে সেই ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। কথা ক'টি—'আসল কথা তাঁর সঙ্গে আমরা যে জীবনযাপন করেছিলাম সে জিনিষ কখনই বর্ণনা করা যাবে না।' কিন্তু অনেক বর্ণনার চেয়ে এই না-বলা বর্ণনা অনেক কিছু বুঝিয়েছে। নিবেদিতা যে অনন্য রচনাশিল্পী তা এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়।

'সর্বোপরি তারা সেই পরমসত্যের মহাসমুদ্রে অবগাহন করছিল, তাঁর মধ্য দিয়ে তারা সেখানে নিত্য প্রবেশাধিকার পেত'—এই উক্তিটির সঙ্গে নিবেদিতা রামকৃষ্ণের অতুলনীয় শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে বলছেন—'এইভাবে শিক্ষার্থীর মনে মূল সত্য জাগিয়ে বাকি কাজের ভারটুকু তার উপর ছেড়ে দেওয়াই কি সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নয়—যেভাবে বীজ থেকে চারাগাছ বড় হয়ে ওঠে?' নিবেদিতা নিজে শিক্ষাবিদ্ ছিলেন, সেজন্য এই ছোট্ট মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রামকৃষ্ণ আর তাঁর অতুলনীয় শিক্ষাপদ্ধতিকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পেরেছেন।

রামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের বাণীরও এক অতুলনীয় ভাষ্যরচনা করেছেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত—'ধর্ম-সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে কল্পনা করা সম্ভব, তিনি ছিলেন তাঁরই পূর্ণ সিদ্ধি।' ধর্মসমন্বয়ের কথা ভারতে এই নতুন নয়, স্মরণাতীত কালেই এখানে ঋষি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সেজন্য রামকৃষ্ণের ধর্ম-সমন্বয়ে নতুন কি আছে—এ প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই জাগে। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন নিবেদিতা, বলেছেন—'তাঁর সেই দৃঢ় ধারণা—নিজের ধর্ম অনুসরণ করা প্রত্যেকের প্রকৃত কর্তব্য, কারণ বহু ভাবকেন্দ্র থাকলে পৃথিবীর মঙ্গল; তাঁর সুগভীর প্রত্যয় 'ঈশ্বরকে যে নামে বা যে ভাবে জানতে চাও না কেন, সেই নামে বা আকারেই তুমি তাঁর দর্শন পাবে; তাঁর সেই আশ্বাস ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়;… সর্বোপরি একান্ত প্রেমের সঙ্গে সর্বধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ঘোষণা—'অন্যেরা যেখানে নতজানু হয়ে ভক্তি নিবেদন করে, সেখানে তুমিও নত হও, নমস্কার কর, কারণ যেখানে অনেকের উপাসনা মিলিত হয় সেখানে ঈশ্বর প্রকাশিত করেন নিজেকে—' পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। 'এতদিন অন্য ধর্মগুলি সম্বন্ধে বলা হোত সহন করাই বড় নীতি। কিন্তু রামকৃষ্ণ যা বললেন তার তাৎপর্য 'সহন' নয়, 'গ্রহণ'। এ কথা রামকৃষ্ণ শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত হন নি, নিজে অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। সে বিষয়টি উদ্ঘাটিত করে নিবেদিতা বললেন—'এমন কোনো পূজা ছিল না, তা যে প্রকারই হোক, যার প্রয়োজনীয়তা তিনি নিজ জীবনে অনুভব করেন নি। সব পূজাকেই তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন উপলব্ধির সিদ্ধিতে। জ্ঞানলাভের পথে প্রত্যেকটির প্রয়োজন আছে এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন।'

রামকৃষ্ণের সমন্বয় কেবলমাত্র বৌদ্ধিক স্তরে সম্পাদিত হয় নি, হয়েছে উপলব্ধির ভূমিতে, সেজন্য তিনি শৈবের কাছে পরম শৈব, বৈষ্ণবের কাছে পরম বৈষ্ণব, অদ্বৈতবাদীর কাছে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক হয়ে বিরাজ করে সকলকেই নিজ নিজ পথে সত্যলাভের প্রেরণায় উদ্দীপিত করতে পারতেন। তাঁর ধর্মসমন্বয়ে এদিকটাই সত্যই অতুলনীয়, নিবেদিতার প্রাঞ্জল আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—'ধর্মীয় অনুভূতি সম্বন্ধে যার সামান্য জ্ঞানও হয়েছে, বুদ্ধিযোগে তার পক্ষে এটা বোঝা কঠিন নয় যে সমকালীন বিভিন্ন ভাষা যেমন একই বক্তব্যকে বিভিন্নরূপে ব্যক্ত করে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সেই এক চৈতন্যময় পুরুষকেই নানাভাবে প্রকাশ করছে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের শ্রীরামকৃষ্ণ আরও কিছু দিলেন। তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার নিজের ভাষায় শিক্ষা দেবার এবং সিদ্ধিতে পৌঁছুবার পথ দেখাবার মহতী প্রেরণার পরম মূর্তি ছিলেন।' নিবেদিতা 'দি মাস্টার অ্যাজ্ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন—বিবেকানন্দের মধ্যে অন্য জাতি, অন্য ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে

অতি-উদার মনোভাব দেখে একদিন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিবেকানন্দ তখন মুসলমান খালাসীদের সঙ্গে এরূপ উদার ব্যবহার করছিলেন। নিবেদিতার বিস্ময় দেখে তিনি বলেন—'আমি মুসলমানদের ভালবাসি।' নিবেদিতা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করেন এই উদার আচরণ তিনি কার কাছ থেকে শিক্ষা করেছেন। উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষাকালে নিশ্চয়ই…যে জাতির মানুষদের তিনি বুঝতে চাইতেন, তাদের মতো করে খেতেন, পরতেন, তাদের ভাষার কথা বলতেন; তিনি বলতেন—'অন্য মানুষদের একেবারে আত্মায় প্রবেশ করতে শিখতে হবে।' এটা তাঁরই নিজস্ব! তাঁর আগে ভারতে কেউ ক্রমান্বয়ে খৃষ্টান, মুসলমান ও বৈষ্ণব হয় নি।' এ কাহিনীটির মধ্যে রামকৃষ্ণের মহাসমন্বয়ের সকল তাৎপর্য অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। সকল ধর্ম যেন রামকৃষ্ণের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে—তিনি একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান; বিশ্বধর্মের তিনি মিলনক্ষেত্র। রামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ধর্মে আছে প্রত্যেকে অসীম স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রের অবকাশ; প্রতিটি মানুষকে এতে দেওয়া হয়েছে অপরিসীম মর্যাদা যার জন্য রোমা রোঁলা রামকৃষ্ণের ধর্মকে আখ্যা দিয়েছেন 'মুক্ত ধর্ম'। নিবেদিতার ব্যাখ্যা ও বলা কাহিনীর মধ্য দিয়ে এ সকল সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

সকল ধর্মকে গ্রহণ করে সকল মানুষকে রামকৃষ্ণ কাছে টেনে নিয়েছিলেন পরমপ্রেমে। তাঁর এই মানবপ্রেমের অসাধারণত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন নিবেদিতা—'এই মানুষটির ভালোবাসার কোথায়ও কোনো সীমারেখা ছিল না।…সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। যে বিশ্ব থেকে একটি প্রাণীও বাদ যাবে, যতই অকিঞ্চন সে হোক না কেন, সেই বিশ্ব তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ বলে বোধ হোত।' রামকৃষ্ণের সকল সাধনার পূর্ণসিদ্ধি এই মানবতায়। তারই জন্য যেন তাঁর দেহধারণ, তাঁর সকল সাধনা। নিবেদিতার লেখনী এ বিষয়ে সেজন্য কিছুটা উচ্ছ্বাসময় মনে হয়—'এই মহান ভালোবাসার আবেগে তিনি ছিলেন আত্মহারা। অন্য কিছু ভাববার মতো অবসর তাঁর ছিল না। আত্মসংযমের সাধনায় অতিবাহিত সেই সুদীর্ঘ দিনগুলিতে তিনি কতবার দীনের কাছে নতজানু হয়ে পূজার্পণ করেছেন, জীবনের শেষদিনগুলিতে যখন ক্যান্সারে তিনি মহাপ্রয়াণের পথে চলেছেন, তখনও তিনি সমাগত উপদেশ প্রার্থীদের শিক্ষা দিতে ব্যস্ত।' শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সাধনায় বিশ্বচেতনা ও বিশ্বমানবপ্রেম কি অপরূপ রূপে স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত হয়েছে তার কয়েকটি বহুবর্ণময় চিত্র এঁকেছেন নিবেদিতা। অপরূপ এই চিত্রকল্পগুলি রামকৃষ্ণকে যেভাবে উদ্ঘাটিত করেছে তার তুলনা নেই। তার একটি—'নিকটবর্তী মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি যখন ক্রমে অনুরণিত হতে হতে নির্বিশেষ স্পন্দনে মিলিয়ে যেত, তখন তাঁর মনে জাগতো ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুই-ই এবং দুয়েরই ঊর্ধে। অপর একটি চিত্রকল্প—'শাশ্বত মিলনের আনন্দলোক থেকে ধীরে ধীরে তিনি নেমে এলেন, দেখলেন বিশ্বের অণুপরমাণু পরমেরই অঙ্গ;—তখনই তাঁর অনুভূতিতে মানবজীবনের বহু জিনিস ধরা পড়ল, যার পথ তিনি পরিক্রমণ করেন নি।' বাহুল্যভয়ে এ বিষয়ে আর উদ্ধৃতি দিচ্ছি না।

এখানে নিবেদিতা বর্ণনা করতে ভোলেন নি রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনপথ-পরিক্রমায় নারীজীবনের মুক্তির দ্বার কিভাবে উন্মোচিত করেন। নারীর মতো জীবন যাপন করে তিনি পরম সিদ্ধির দ্বারে পৌঁছে সিদ্ধান্ত দিলেন—'নারীত্বের সরল পথেও বিজয়-রহস্যে পৌঁছানো যায়।' নিবেদিতা নারী হয়ে এর তাৎপর্য উপেক্ষা করতে পারেন নি এ সম্পর্কে মন্তব্য রাখলেন—'এর ফলে তাঁর জীবন ভারতীয় নারীর প্রকৃত মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।' নারী-জীবনে কোনো অসম্পূর্ণতা আছে, এ কথা রামকৃষ্ণ স্বীকার করেন নি।

এইভাবে বিচিত্র সাধনা ও উপলব্ধির অন্তে রামকৃষ্ণের পরমতম মূর্তিটি প্রকাশ পেল, যাকে নিবেদিতা বললেন—'তার জীবনের সার'; নিবেদিতার মনীষার দীপ্তিতে তা আমাদের সামনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষায়—'মায়ের ভালোবাসা যেমন সকল সন্তানের প্রতি ব্যাপ্ত, অন্যরা তাদের

প্রতি যত নির্দয় হোন বা অবিচার করুন না কেন, তেমনি বিশ্বমাতৃত্বের মূর্ত বিগ্রহ এই মানুষীটি সমগ্র জীবলোককে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিপূর্ণ ঐকতানের মধ্যে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন।' নিবেদিতাই আমাদের রামকৃষ্ণের মধ্যে এই বিশ্বমাতৃত্বের বিশ্ব-বিমোহন মূর্তিটি উদ্ঘাটন করে দেখালেন। এ মূর্তিতে না দেখলে আমাদের রামকৃষ্ণকে দেখা অসম্পূর্ণ থাকতো।

রামকৃষ্ণের মহাজীবনের মহাবাণীটিও নিবেদিতার লেখনীগুণে ভাস্বর। নিবেদিতার এ বিষয়ে উক্তিটি স্মরণীয়—'এটি কি একটি সুমহান মতবাদ নয় যে, প্রতিটি মানুষের ক্ষুদ্র গৃহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে আছে অনন্তের রাজপথের দিকে? এই আহ্বান কি অপরিসীম সান্ত্বনার কারণ হয় না যখন শোনা যায়—যে যেখানে আছো, সেখান থেকেই, যা তোমার আছে তাই নিয়েই, তোমার প্রভু, তোমার ঈশ্বরে, হৃদয় নিবিষ্ট করো, আর উন্মুক্ত রাখো দৃষ্টি সত্যের দিকে। সকল পিছিয়ে পড়া মানুষ এর থেকে পাবে এগিয়ে যাওয়ার সাহস, নিবেদিতা এখানে এ কথাই বলতে চেয়েছেন।

রামকৃষ্ণের কাছে এসে সত্যই সাধারণ মানুষ, তুচ্ছ মানুষ পেতো অমিত সাহস ও বল। তাঁর ধর্ম শক্তির ধর্ম। এ বিষয়ে আলোকপাত করে নিবেদিতা বলেছেন—'তাঁর কাছে যিনিই এসেছেন, ফিরে যাবার সময় অনুভব করেছেন এক গভীর সাহস, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের শক্তির উৎসকে জাগিয়ে দিতেন, যার ফলে স্পর্শপ্রাপ্ত মানুষটি সীমাবদ্ধতাকে ছিন্ন করে পাখা মেলে দিত ঊর্ধাকাশে।' রামকৃষ্ণের স্পর্শ মানুষকে জন্ম-কর্ম-জাতি-কুলের সকল খর্বতা, হীনতা, অসম্পূর্ণতার ঊর্ধে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করতো। অথচ রামকৃষ্ণ ভাঙতে আসেন নি গড়তে এসেছিলেন, তিনি প্রচলিত ঐতিহ্যকে আঘাত করেন নি। এ বিষয়ে আলোকপাত করে নিবেদিতা বলছেন—'সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ প্রচলিত ঐতিহ্যকে আঘাত করেন নি, মানুষ যাতে বলীয়ান্ হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তিনি সবকিছু বলেছেন।' 'গঠনের পথে অগ্রগতি' তাঁর বাণী। তাঁর বাণী গতির, শক্তির, নতুন জীবনের; সকল মানুষের মনুষ্যত্বের অধিকারের ভিত্তিতে নতুন সমাজ-গঠনের এক মহতী প্রেরণা রামকৃষ্ণের জীবনে ও বাণীতে পাওয়া যায়। এ সকল নিবেদিতার রচনায় উদ্ঘাটিত।

সেজন্য নিবেদিতা রামকৃষ্ণকে বলেছেন—'মানবতার প্রতিনিধি।' রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'কালী দি মাদার' গ্রন্থের অনুপম আলোচনার পরিসমাপ্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন—'প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা যে বৃথা বস্তু নয়, জগতের কাছে সেই সত্যের তিনি সাক্ষ্যস্বরূপ। এ কথা অবশ্য সত্য, আর কোনো দেশেই তাঁর জন্মগ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ কথাও ঠিক নয় যে, তিনি প্রধানতঃ বা একমাত্র ভারতের আত্মাকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির অনুভূতি ও চিন্তা এসে মিলিত হয়েছিল এবং সেই কালীগতপ্রাণ রামকৃষ্ণ মানবতার প্রতিনিধি।' রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে তাই শুধু ভারতের নয়, জগতের সকল মানুষের অধিকার আছে, নিবেদিতা এই উক্তির মাধ্যমে সেই দাবি জানালেন। □

শ্রীমা ঃ জননী সত্তার পূর্ণ প্রকাশ

ড. বন্দিতা ভট্টাচার্য

আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে এক প্রায় অশিক্ষিত গ্রাম্য পূজারী ব্রাহ্মণ অতি সংগোপনে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তরে এমন এক আলোড়ন এনেছিলেন, যা সেইকালের বৃহত্তম ঐতিহাসিক আন্দোলন "রেনেসাঁস"-কেও ম্লান করে স্বল্পকালের মধ্যেই সারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করেছিল। তাঁর মূল বাণীটি ছিল "যার মান হুঁশ আছে সেই মানুষ"; (মান —মনুষ্যত্ববোধ,হুঁশ—আত্মসচেতনতা)। অর্থাৎ, মানুষই একমাত্র জীব, যে সেই অখণ্ড চৈতন্যের অংশ এবং পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলে পরিণামে নিজেই সে ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাধনার মহামন্ত্রটিও তিনি দিয়ে গেলেন—সেটি একাক্ষরা "মা"। এই "মা"—এর নিজস্ব পরিচয় নেই। অথচ, কে না জানে যে তিনিই আমাদের সবচেয়ে আপন। তাঁর স্নেহ-ভালবাসা আমাদের জীবনকে শেষদিন পর্যন্ত অটুট অম্লান হয়ে ঘিরে থাকে, শত দুঃখ-বেদনা জর্জরিত জীবন-মরুভূমিতে মা-ই যে একমাত্র শান্তির মরূদ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিক সাধনার দ্বারা দেখিয়ে গেলেন—অসীম, অনন্ত সচ্চিদানন্দকে একটি মাত্র উপায়ে প্রিয়তম করা যায় সেটি হল তাঁর মধ্যে মাতৃভাব আরোপ করে সন্তানভাবে তাঁর আরাধনা করা, কারণ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য আমাদের ভীত বিহ্বল করে, আমরা চাই তাঁর মাধুর্যটুকু আস্বাদন করতে। আর সেই মাধুর্যের চাবিকাঠি রয়েছে তাঁর মাতৃত্বে। গোটা সৃষ্টিটাই যে তাঁর স্নেহ দিয়ে ঘেরা। এইটুকু বুঝতে চাইবো না বলেই তো শ্রীরামকৃষ্ণ এই পরম মন্ত্রের চরম সিদ্ধিদাত্রীরূপে আমাদের সামনে রেখে গেলেন জীবন্ত প্রতিমা-শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীকে—বিশ্বের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বদেশের অদ্বিতীয়া মাতৃমূর্তি, যিনি একজীবনে সর্ব-স্তরের জননীদের শ্রেষ্ঠতমা, পরমা পরিণতি।

মহাপ্রয়াণের পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—"আমি আর কি করে গেলাম? তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে।' এই কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য তখনই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন এই ঘটনার বহুদিন পরে 'মা' স্বমুখে কোন সন্তানকে বলেন: বাবা, জান তো, ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখতেন। সেই মাতৃভাব সকলকে শেখাবার জন্য এবার আমাকে রেখে গেছেন। বর্তমান শতাব্দীর পরম সৌভাগ্য যে, স্বয়ং মহামায়া মাতৃমূর্তিতে প্রকটিতা হয়ে জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের আপামর মানুষকে সন্তানবোধে তাঁর অভয়ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়ে এবং ইহ—পরকালের সমস্ত ভার গ্রহণ করে তাদের কৃতার্থ করেছেন আর সেই সঙ্গে গর্ভধারিণী না হলেও হাজার হাজার মানুষের "মা"—ডাক এর অধিকারিণী হয়ে নবতম ইতিহাস রচনা করে গেছেন।

শ্রীশ্রীমা-এর সমগ্র জীবন-সাধনার সার নির্যাস নিহিত আছে তাঁর মাতৃত্বের অনুপম লীলা-বিলাসে। স্বীয় মহাশক্তিকে তিনি সংবৃত করে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন বাৎসল্যরস আস্বাদনের আর্তিতে। ইচ্ছামাত্রেই যিনি রাজরাজেশ্বরী হতে পারতেন, সন্তানদের পরম আদরে কাছে টেনে নেবার জন্য তিনি অবগুণ্ঠিতা হয়ে জীবনের বেশীরভাগ সময় জয়রামবাটীতে গ্রাম্য নারী জীবন অতিবাহিত করলেন। তাই, স্বামী প্রেমানন্দ একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন: "রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমন কি ভক্ত ছেলেদের

এ'টো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন।…অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমান-রহিতা।" এ না হলে আমাদের মত দীনহীন সন্তানরা কি করে নিঃসঙ্কোচে তাঁর কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভরসা পাবে? তিনি পরমেশ্বরী—তাতে আমাদের কি? কিন্তু তিনি আমাদের "মা"—"সত্যিকারের মা"—এটাই নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল।

কেমন "সত্যিকারের মা!" দু-একটি উদাহরণ দিলে আমাদের অনুভূতি আরও জীবন্ত হয়ে উঠবে।—

(১) শ্রীরামকৃষ্ণের "ভক্ত-ভৈরব" মহাকবি গিরিশচন্দ্র জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেছেন—"তুমি কি রকম মা?" মা উত্তর দিলেন "আমি সত্যি মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।" সেইদিন দুপুরে গিরিশচন্দ্র মা-কে সাবান, বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে যেতে দেখেন। রাত্রে শোবার সময় গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করেন তাঁর বিছানা সাদা ধপ্‌ধপ্ করছে। "এ কার্য মায়েরই বুঝিয়া প্রাণে কষ্ট হইল, আবার মার অপার স্নেহের কথা ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল।"

(২) স্বামী অরূপানন্দ মা-কে একবার প্রশ্ন করেন—"মা তুমি কি ইতর জীবেরও?" মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—"হ্যাঁ, আমি ওদেরও।" বলাবাহুল্য স্বামী বিবেকানন্দে পরিচালনায় বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় মা পশুবলি নিষেধ করে যে চিঠি দেন, তার মূলকথা উপরেই উদ্ধৃত হ'ল।

(৩) উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে "মা"-এর উপস্থিতিতে তাঁর ঘর ঝাঁট দিতে দিতে জনৈক সেবকের মনে এই চিন্তার উদয় হয় "এ আমি কি করছি? কার সেবা করছি? ইনি তো শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী ছাড়া আর কিছুই নন্।" অন্তর্যামিনী সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে বলে উঠলেন—"আমি তোমাদের মা, সত্যিকারের মা। বুঝবে, বুঝবে, কালে বুঝবে।"

(৪) স্বামী অব্যয়ানন্দ একবার শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন—"আপনি মঠের সন্ন্যাসীদের তাঁদের সন্ন্যাস নাম ধরে ডাকেন না কেন?" মা উত্তর দেন ঃ—"আমি মা কিনা, সন্ন্যাস নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে।"

(৫) একবার কোন দেশপ্রেমিককে মা বলেছিলেন ঃ—"দেখ, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে (ইংরাজদের সঙ্গে) যে যা ইচ্ছা করে থাক, কিন্তু তারাও তো আমার ছেলে বটে।" বিশ্বজননী না হলে কি একথা বলা যায়?

(৬) জয়রামবাটীর নিকটবর্তী শিরোমণিপুর গ্রামের দুর্ধর্ষ ডাকাত আমজাদের মায়ের বাড়ীতে অবারিত দ্বার। একবার আমজাদকে খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে মায়ের ভাইঝি নলিনী তাচ্ছিল্য দেখালে, মা তাঁকে ভর্ৎসনা করে স্বয়ং আমজাদকে যত্ন সহকারে খাওয়ান এবং তার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করেন। পরে বলেন ঃ "শরৎ আমার যেমন ছেলে, আমজাদও তেমনি ছেলে।" "সত্যিকারের মা" না হলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একসময়ের কর্ণধার শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এবং মুসলমান ডাকাত আমজাদ কি করে সমান স্নেহ ভালবাসার অংশীদার হতে পারেন?

(৭) পরবর্তীকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এক চিকিৎসকের স্ত্রী মাকে প্রণাম করে বলেছেন—"মা আশীর্বাদ করুন, আপনার ছেলের যেন উপায় হয়।" মা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"বৌমা এমন আশীর্বাদ করব আমি,—সকলের অসুখ হোক, কষ্ট পাক্? আমি তো তা করব না মা। সকলে ভাল থাক্, জগতের মঙ্গল হোক মা।"

(৮) জনৈক ভক্ত জয়রামবাটিতে মাকে বলছেন ঃ "মা, তুমি যে আমাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার কর এটা আমাদের ভাল লাগে না!" মা বললেন—"বাবা, তোমরা যে আমার ছেলে। মা ছেলে-মেয়ের কত গু-মুত পরিষ্কার করে, তোমরা তো সব বড় হয়ে আমার কাছে এসেছ আমি কি অপরাধ করেছি যে, তোমাদের এই সামান্য সেবাটুকুও আমরা আদৌ বিস্মিত হই না, যখন জানতে পারি যে, কোন অপরিচিতা বিদেশিনী সুদূর সাগরপার থেকে মাকে চিঠি দেন—"কে তুমি, প্রত্যহ

আমার প্রার্থনার সময় মাতা মেরীর বদলে আবির্ভূতা হও।" কিংবা মায়ের বড় আদরের "খুকী" নিবেদিতা ম্যাডোনার ছবির মধ্যে মা-কেই আবিষ্কার করেন। অথবা বিষ্ণুপুর স্টেশনের প্ল্যাটফরমে হিন্দুস্থানী কুলী মা-কে দেখেই বলে ওঠে—"তু মেরী জানকী মায়ী।"

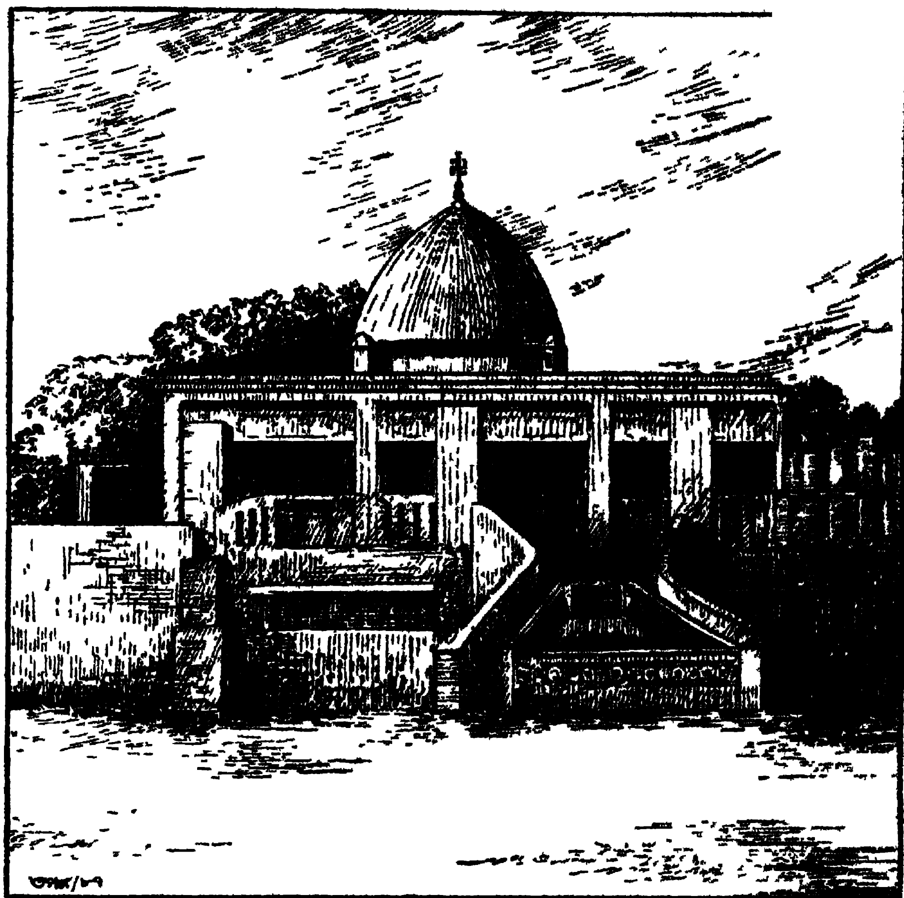
পৃথিবীর সমস্ত বাৎসল্যরসের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীশ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের "ধ্যানগঠিতা মানসী-প্রতিমা।" যিনি একাধারে সংঘজননী এবং ইহ—পরকালের ত্রাণকর্ত্রী হয়েও মাতৃত্বের মাধুর্য-মণ্ডিত আবরণে স্বীয় মহাশক্তিকে প্রচ্ছন্ন রেখে জগতকে শিখিয়ে গেলেন অনুপম সাধনা—যার যুগান্তব্যাপী অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে। পূর্ব পূর্ব অবতারের ঐশী লীলা নায়িকারা তাঁদের মাতৃভাব সংকুচিত, সীমায়িত রেখেছিলেন। এবারে গূঢ় ঐশী উদ্দেশ্য সাধনে শ্রীশ্রীসারদাদেবী সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করলেন এমন এক 'বস্তু' যার কাছে ব্রহ্মপদও তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়।

স্বামীজী একবার বলেছিলেন ঃ—"আমার জীবনে বাপের চেয়ে মায়ের কৃপা লক্ষগুণ বেশী।" শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৃহী ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় মা-এর সঙ্গে একপাতে খেয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে বলে উঠেছিলেন—"বাপের চেয়ে মা দয়াল।" জনৈক বিদেশিনী ভক্ত উদ্বোধনে মা-কে প্রশ্ন করেন; মা, আপনার মেয়ে?—মা বললেন ঃ—হ্যাঁ, তুমি আমার মেয়ে।" একজন পাশ্চাত্য দেশীয় পুরুষ ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন ঃ—"আপনি যে জগন্মাতা তা কি করে বুঝবো?" মা উত্তর দিলেন—"এখানে যখন এসেছ তখন বুঝতে পারবে।" কিন্তু আমরা কতটুকু তাঁর দিকে এগোতে পেরেছি তাঁর কাছে না গেলে তাকে বুঝাবো কি করে? তবে ভরসা এইটুকুই আমরা তাঁর কাছে না যেতে পারলেও তিনি অহরহঃ আমাদের তাহলে। সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করে কার সাধ্য সূর্যই জলকে উপরে টেনে নেয়ে; জলকে ডেকে বলতে হয়না—"ওগো আমাকে ওপরে টেনে তোমার করতে পারব না?" গর্ভধারিনী জননীর মহিমাও যে এখানে ম্লান হয়ে যায়।

(৯) মা-এর জনৈক ত্যাগী সন্তান কোন কারণে মঠ ত্যাগ করে চলে যাবার আগে মা-এর কাছে বিদায় নিতে এলে মা কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—"আমায় ভুলো না—ভুলবেনা তা জানি তবুও বলছি।" সন্তান ও কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—"মা আপনি?" মা বললেন ঃ—"মাকি কখনও ভুলতে পারে ছেলেকে?" আঁচলে নিজের চোখ মুছে মা আবার বললেন—"কলঘরে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে এসো। কেউ না টের পায়।" সংসারে এই অনুপম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সামান্য সম্ভাবনা আছে কি?

(১০) শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রকট হবার দীর্ঘদিন পরে জনৈক ভক্ত সন্তান শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন—"মা আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন?" সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট উত্তর দেন ঃ—"সন্তানভাবে দেখি।" জগতের ইতিহাসে কোন পত্নী কি তাঁর পতির সম্পর্কে এমন কথা বলতে পেরেছেন?—শাশ্বত মাতৃত্বের এ যে চরম নিদর্শন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে লিখছেন—"দাদা, মা-ঠাকরুণ যে কি বস্তু তা কেহই বুঝতে পারনি। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে।…রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। কিন্তু মা ঠাকরুণ গেলেই সর্বনাশ।" ভুবনবিজয়ী স্বামীজী প্রথম-বার কলকাতা ফিরে এসেই ছুটে যান মাকে তাঁর প্রণাম জানাতে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানিয়ে কথা প্রসঙ্গে মা-কে বলেন—"মা আজকাল দেখছি আমার সব উড়ে যাচ্ছে…।" মা হেসে বলেন ঃ—"দেখো নরেন, আমাকে যেন উড়িয়ে দিও না।" স্বামীজী ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন ঃ… "মা, যে জ্ঞান গুরু পাদপদ্মে উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান।…শেষে দেখে শুধু মা, মা, জগৎময় মা হয়ে গেছে।" স্বামীজী মহাসমাধির অব্যবহিত পূর্বে তিনবার মধুর 'মা' নাম উচ্চারণ করে চিরশান্তির জগতে বিলীন হন! সব সাধনার পরম পরিণতি এতেই দ্যোতিত হ'ল এভাবেই 'মা' হয়ে উঠেছেন বিশ্বজননী। □



□ প্রসঙ্গ : শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

স্পষ্টতঃ বিষয়টি অভিনব এবং অনেক সমালোচকের মতে হয়ত অভিনবত্ব তথা চমক সৃষ্টির প্রয়াস বলে চিহ্নিত হবার আশঙ্কা আছে। ঐতিহাসিক কালে বাঙালী জীবনে যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাবে বাঙালী তার স্বকীয় মহিমা অর্জনে সমর্থ হয়েছে তাঁদের মধ্যে এই দুই আধ্যাত্মিক মহামানব কেন্দ্রীয় ও নিয়ামক শক্তিরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আবির্ভাবের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবধান এবং যুগের ভাব ও ভাবনার মধ্যেও দুস্তর ফারাক। সুতরাং এঁদের মধ্যে তথা এঁদের সাধনার মধ্যে মিল খুঁজতে যাওয়া কষ্টকল্পনা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। যদিও কোন কোন লেখক এই দুই মহামানবের ভাব-সাধনায় ও লৌকিক আচরণেরও মিল খুঁজে পেয়েছেন (দ্রঃ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য), তবু এঁদের ইহলীলা দার্শনিক প্রত্যয় ও কর্মকাণ্ড পৃথক বলেই সাধারণভাবে স্বীকৃত। একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলে এই দুই মানবের আবির্ভাব-মগ্ন। কার্যকলাপ ও প্রভাবে যথেষ্ট অন্তঃমিল দেখা যায়। ঐতিহাসিককালে বাংলাদেশে দুবার রেনেশাঁস বা নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল—প্রথম পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এবং দ্বিতীয় উনবিংশ শতাব্দীতে। এই দুই নবজাগরণ যতই খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হোক না কেন। বাঙালী জীবনের গঠনে ও প্রকাশে। তাও সংস্কৃতির ('সংস্কৃতি' কথাটি এখানে নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে গৃহীত) বিকাশে বিশাল তাৎপর্যময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রথম নবজাগরণের হোতা ও ফলশ্রুতি ছিলেন শ্রীচৈতন্য এবং দ্বিতীয় নবজাগরণের অন্যতম দিক্-নির্দেশক ফলশ্রুতি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এই সূত্রেই এঁদের জীবন ও কার্যকলাপ এবং তার ফলশ্রুতিকে সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করার প্রশ্ন আসে। অবশ্য সমাজ-বিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে নতুন। উনবিংশ শতাব্দীতে এর চর্চা শুরু হলেও বিংশ শতকের ষাটের দশক থেকেই এর জয়যাত্রা। অবশ্য সমাজ-বিদ্যার অন্যান্য শাখা গুলি, যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-ব্যবস্থা, ইতিহাস বহুকাল থেকে প্রচলিত এবং সেইসব বিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি-প্রকরণ এবং সীমা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত সঠিক ও সুস্পষ্ট রূপরেখা টানা এখনও সম্ভব না হলেও এত দ্রুত এই বিদ্যা বর্তমানকালে আহৃত হয়েছে যে এই বিদ্যার ভিত্তি ও প্রকরণ মোটামুটিভাবে গৃহীত। এই বিজ্ঞানেও আমরা 'সংস্কৃতিকে' শুধু শিল্প-কলাকে বুঝি না—মানুষের জৈবিক সত্তার উর্ধে যে কোন কার্য বা উৎপাদনকে আমরা সংস্কৃতি বলি। Peter worsley-র ভাষায় "...for socieological purposes he will regard 'culture' everything acquired by human beings that is not physically inherited. From this point of view, sewers are as much

'culture' as symphonies." অর্থাৎ জৈবিক-সত্তার ঊর্ধায়িত যে জীবন-চর্যা তাই সংস্কৃতি। সুতরাং একটা যুগকে বিশ্লেষণ করতে শুধু তার মানস-সম্পদকে বুঝব না—সেই যুগের সামগ্রিক জীবন চর্যাকে বুঝতে হবে এবং যে অভ্যন্তর শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত সংস্থিতিতে এই জীবন-চর্যা বিধৃত ও বিকশিত হচ্ছে তাকে তুলে ধরাই সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ। এটি নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ-কাজ। কারণ সমাজ স্থিতিশীল হয়েও গতিশীল। একজন নৃত্যরতা রমণীর মত কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তার স্থিতিশীল রূপটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা গেলেও সেই মুহূর্তেও তার গতিশীল সত্তা রয়েছে যাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই নৃত্যশীল গতিছন্দ স্বভাবতঃই একটি নিগূঢ় নিয়মে ক্রিয়াশীল এবং মানব-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই নিত্য বহমান। তবে ইতিহাসের কোন কোন দুর্লভ অবসরে এই নৃত্যছন্দ দ্রুতলয়ে চলে এবং ঐ সমস্ত ঐতিহাসিক কারণসমূহ কোন মহামানবের জীবন বেদে ধৃত। অভিব্যক্তও বিকশিত হতে দেখা যায়। ঐ মহামানবের জীবন-কথাকে সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়মবন্ধ ভাষায় পাঠ করলে আমরা ঐ বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর ঐ তাৎকালিক সময়ের জীবন-সমস্যা, জীবন-সংগ্রাম এ উত্তরণের মহান কাহিনীটিকে ও বুঝতে পারি। উপমাত্মক ভাষায় বললে বলতে হয় যেন একটি মডেলের সাহায্যে একটি বিশাল বিষয়কে বুঝতে পারা। এই সমস্ত মহামানবকে আমরা যুগাবতার বা যুগন্ধর মহাপুরুষ বলে থাকি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বা শ্রীরামকৃষ্ণ আমরা এই অর্থেই যুগাবতার বলে থাকি। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে বা হচ্ছে এবং বিশাল চৈতন্য-সাহিত্য ও রামকৃষ্ণ-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধেই মূলতঃ লেখা হয়ে থাকে। হয়ত সাহিত্য ও উচ্চতর সংস্কৃতিতে তাঁদের প্রভাবও আলোচিত হয়। কোথাও কোথাও তাঁদের আবির্ভাবের যুগের কিছু যন্ত্রণার বিবরণ থাকে, আর থাকে তাঁরা কিভাবে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজকে তথা বৃহত্তর সমাজকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে পেরেছিলেন সেইকথাও।

অতি সম্প্রতি আমার সুযোগ হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অতিরিক্ত সচিব শ্রী আই. এস. মেননের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অবদানের সম্বন্ধে আলোচনা করার। শ্রী মেনন যথেষ্ট বিশ্বাসের সঙ্গে বলছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তিবাদী মহাগুরুদের আবির্ভাব না ঘটলে ভারতবর্ষ মধ্যযুগে মূলতঃ ইসলামধর্মী হয়ে যেত। এই সমস্ত বিচার সত্য হলেও পূর্ণ নয়। আর খণ্ডিত বলেই সত্য নয়। আমাদের উচিত হবে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের যুগের চালিকা শক্তিসমূহের বিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখানো কিভাবে তাঁদের জীবনে ও কার্যে ঐ সমস্ত শক্তির লীলাময় রূপ সংহত হয়েছিল এবং কিভাবে তাঁরা ইতিহাসের লীলাচক্রকে আত্মস্থ করে স্বীয় জীবনের প্রভাব ঐ সমস্ত চালিকা শক্তিগুলির ও তাদের ভারসাম্যের নবরূপায়ণ করেছিলেন। একাজ এখনও হয় নি এবং একাজ-করার প্রখর সময় এসে গেছে।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এককালে মধ্যযুগের নিবিড়-তিমির বিদারণ করে মহাজাগরণ দেখা দেয়। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তুর্কীদের হাতে কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর গ্রীক অধ্যাপকরা ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীতে তাঁদের অমূল্য গ্রীক সংস্কৃতির জ্ঞান নিয়ে হাজির হন এবং সেই থেকে ক্রমশঃ মহাজাগরণ দেখা দেয়। আমাদের মত অল্প জ্ঞানের অধিকারীদের কাছে এমত অশ্রদ্ধেয়। কারণ কনস্তান্তিনোপলে হাজার হাজার বছরের মধ্যযুগীয় অমানিশা যে গ্রীক-জ্ঞান কাটাতে পারে নি—তাই ফ্লোরেন্সে এসেই নবপুষ্পভারে সমৃদ্ধ কেমন করে হয়ে উঠতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আসলে আর্থ-সামাজিক পীঠভূমিতে যুগান্তরের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল এবং গ্রীক-জ্ঞান এই উন্নততর আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় প্রবেশ কালে উন্নততর মানস-সম্পদ চর্চার ক্যাটালিটিক এজেন্টের কাজ করেছিল। এবং এই সামগ্রিক জীবন-চর্যার বিবর্তন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক চালিকা শক্তিগুলির নবরূপায়ণকেই আমরা মহাজাগরণ আখ্যা

দিতে পারি। স্মরণ রাখতে হবে যে, আপাত-দৃষ্টিতে এই ধর্ম-নিরপেক্ষ মহাজাগরণের শক্তিগুলির পাশেপাশেই মহান ধর্মসংস্কারকগণও এই উত্তরণে মহান ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইরাসমাস মোর, লুথার, জিউইনগ্লি, কেলাভিন প্রমুখরা যে প্রাণজয়ী ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন তা এই বৃহত্তর মহাজাগরণেরই একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সুতরাং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা মূলতঃ ধর্মভিত্তিক হলেও এঁদের শুধু আধ্যাত্মিক সাধক বা ধর্মসংস্থাপক বললে ভুল হবে—যদি না 'ধর্ম' বলতে আমরা জাতির সমগ্র জীবন-চর্যাকে তথা সংস্কৃতিকের বোঝাই।

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব কালে হোসেন শাহ রাজত্ব করছিলেন (১৪৯৯—১৫১৯ খৃঃ)। এই সময়ে বঙ্গদেশে মোটামুটি স্থিতি ফিরে আসে এবং সমাজের প্রধান উৎপাদক শক্তিক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়। রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া সত্ত্বেও মোটামুটি এই সময় থেকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে একটা নতুন পট-পরিবর্তনের সূচনা হয়।[১] যদিও উত্তরণ ঘটে সমাজতন্ত্র থেকে নতুনতর সামন্ততন্ত্রে—তবু পুঁজিবাদের বিকাশের একটি ক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। এই সময় নতুন সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি নতুন বেদী প্রস্তুতের-প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল এবং নতুন মূল্যবোধ—মধ্যযুগে যার প্রকাশ অবশ্যই ধর্মভিত্তিক হবে। অতএব পুরনো ক্রিয়া ও আচারভিত্তিক ধর্মকর্মের পরিবর্তে একটি সর্বজনীন ভাবভিত্তিক ও ভক্তিবাদী ধর্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন সমান অনুভব করেছিল। এই সময়েই আবির্ভূত হন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—এই সমস্ত ভক্তিবাদী মহামানবেরা যাঁরা নতুনের জয়গান করলেন এবং আপন জীবনাচরণে সেগুলিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষগোচর আদর্শ স্থাপন করলেন। তামিল দেশে আলোকের নতুন দীপশিখা নিয়ে আবির্ভূত হলেন 'আলোয়ার' দল—রামানুজ; এলেন সুফী-মরমিয়ারা (যেমন, বাবা সাহেব সেখ ফরিদ); আসামে এলেন শঙ্করদেব; মীরাবাঈ; ব্যসরায়; কবীর; দাদু; তুকারাম, গুরু নানক; রামানন্দ; শ্রীচৈতন্য। এঁদের মধ্যে দার্শনিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে সামাজিক শক্তিসমূহের নতুন সংস্থিতি রচনার ক্ষমতায় ও ব্যাপকতম প্রভাব সৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য শ্রেষ্ঠ। এঁরা নিজ নিজ ধর্মমত সৃষ্টি করলেও প্রাচীন শাস্ত্রের ভিত্তিতেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সুতরাং শ্রেণী ও দলের ঊর্ধ্বে গণভিত্তিক যে ধর্ম সাধনার ঐতিহ্য শ্রীচৈতন্য সৃষ্টি করলেন তার প্রাবল্যে ও উম্মাদনায় সমগ্র বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাঁর ভাববাদী হরিনাম সঙ্কীর্তন, কাজীদলন, আচণ্ডাল নীচ ও শোষিত মানুষকে সমাজ-বিন্যাসে মর্যাদাসহ স্থানদান প্রভৃতি কার্যকলাপকে এই সামাজিক ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে। মূলত শ্রীচৈতন্য প্রেরণাশক্তি হলেও তাঁর এই কাজে প্রত্যক্ষ প্রচারক-সংগঠকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং মহাপ্রভুর এই সমাজ-পুনর্বিন্যাসের কর্মকাণ্ডে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে একটি একক জটিল সত্তা হিসাবে ধরতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে বঙ্গদেশের অবস্থা ভিন্নতর হলেও এই দুই যুগের মধ্যে একটি আভ্যন্তরীণ মিল দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষাপট পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের প্রেক্ষাপট থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদী রসসিঞ্চনে প্রাণদান করার চেষ্টা হলেও পুঁজিবাদ বিকশিত হতে চেষ্টা হলেও পুঁজিবাদ বিকশিত হতে চেষ্টা করছে। মুৎসুদ্দি পুঁজি ক্রমশঃ জমিতে নিবিষ্ট হলেও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার দৌলতে কিছু পরিমাণে শিল্প-পুঁজিতে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবেই 'ইতিহাসের অচেতন যন্ত্রে' পরিণত হয়ে সমাজ-বিবর্তনের কাজ করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। বিদেশী শক্তির এই মাত্রা একদিকে যেমন পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রখর করে দিচ্ছিল। তেমনি নবতর আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বৈদেশিক ভাবাদর্শের ভিত্তিতে নতুন উপরি কাঠামো (super-structure) গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। স্বভাবতঃই উপরি কাঠামোর একটি নতুন অথচ সর্বাবয়বযুক্ত ভাবাদর্শের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ফলে বৈচিত্র্যে ও বিশৃংখলা ছিল চরম।

রামমোহনের বৌদ্ধিক বেদান্তভিত্তিক ভাবনা থেকে বঙ্কিমের নব্য-হিন্দুবোধ এবং এদের পাশাপাশি ডিরোজিও শিষ্যদের বেন্থাম-মিল প্রদর্শিত যুক্তিভিত্তিক ঐহিক জীবনবাদ একটা ভারসাম্যহীন পরিবেশ রচনা করেছিল। এ যেন অচেনা অজানা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় ভীত, বিপর্যস্ত নৌকার মত অবস্থা। প্রয়োজন ছিল এই জটিল নতুন জীবনবোধের উপযুক্ত জীবনবাদ। এবং এটি নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর যা দেখালেন তা সংসার-বিমুক্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির নিগূঢ় সাধনা নয়। লোকায়ত জীবনকে লোকাত্তর জীবনে নিয়ে যাওয়ার সামগ্রিক দ্যোতনাসম্পন্ন জীবনবাদ যার মর্মকেন্দ্রে রয়েছে নিরভিমান, নিরলঙ্কার ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যা তাকে পূত, নির্মল করবে। এখানেও প্রয়োজন ছিল একজন সাধকের যিনি এই বিমূর্ত ভাবাদর্শের ভিত্তিটি সংগঠিত করে তুলতে পারেন। তিনি হলেন বিবেকানন্দ। শ্রীচৈতন্যকে যেমন শ্রীনিত্যানন্দ থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না, কার্ল মার্কসকে যেমন ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেলসের থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণকেও শ্রীবিবেকানন্দ থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না। অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ বসুর ভাষায়, "Vivekananda and his master Ramkrishna together make one compl.te personality."[২] সুতরাং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের যুগ-সন্ধিক্ষণে যেমন শ্রীচৈতন্য জাতি ও সমাজকে 'আমূল' পরিবর্তন করে তাকে নবরূপ দান করেছিলেন—সেই সময়কার যুগান্তরের তিনিই ছিলেন হোতা ও নতুনের নির্মাতা, শ্রীচৈতন্যই যেমন বঙ্গদেশের প্রথম নবজাগৃতির প্রাণপুরুষ—তেমনি উনিশ শতকের দ্বিতীয় নবজাগরণের চালিকাশক্তির নতুন রূপদানের মূলপুরুষ তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। এঁদের সাধনা সমগ্র-জীবন-ভিত্তিক "from sewero to symphonies"—শুধু symphony-র নয়। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সমাজ-বিজ্ঞানের আলোকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের এই সামগ্রিক জীবন-বেদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও একটা রূপনির্মিতি—যাতে আমরা তাঁদের বুঝতে পারি ও আমাদের বর্তমান সমস্যা-জর্জর, ক্লিষ্ট সমাজকে তাঁদের এই মৌল ও সামগ্রিক সাধনার ভিত্তিকে পুনর্গঠিত করতে পারি। এ বিষয়ে যোগ্যতর গবেষকরা অগ্রসর হলে আমাদের অপরিসীম লাভ হবে। □

---

১. দ্রঃ Cambridge Economic of India: Irfan Habib and Tapan Roychowdhury. ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশঃ পাণ্ডলভ, রাস্ত্যান্নিকোভ ও শিরোকভ।

২. দ্রঃ Studies in the Bengal Renaissance: Atul Chandra Gupta.

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সদ্য অবসিত ইংরেজি ১৯৮৬ সাল ছিল সমগ্র ভারতবাসীর কাছে গৌরবোজ্জ্বল ও অত্যন্ত তাৎপর্যব্যঞ্জক একটি পবিত্র বৎসর। এই বৎসরেই শ্রীচৈতন্যদেবের শুভ আবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের দেড়শত বছর পূর্ণ হয়েছে। বাংলার মৃত্তিকায় এই দুই মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটলেও এঁদের পূত জীবন ও বাণী এবং জাতীয় জীবনের ঘোরতর সংকটকালে এঁদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা—দেশকালের সীমাতিশায়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এঁদের প্রদর্শিত পন্থাই ভেদাভেদ-বিড়ম্বিত, স্বার্থসর্বস্ব, হতাশাপীড়িত নাস্তিক মানুষকে যথার্থ শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দেয়—এঁদের জীবনাচরণই সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও নীচতার ঊর্ধ্বে প্রেমের মন্ত্রে ঐক্যবন্ধ হতে মানুষকে আহ্বান করে—এমন কি বহু সম্প্রদায় ও ধর্মে বিভক্ত ভারতবাসীর জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার পন্থাও তাঁদের জীবনাদর্শে নিহিত আছে। তাই এমন দুই দুর্লভ মহামানবের জন্মতিথি পালনের প্রয়োজনীয়তা সব সময়েই অনুভূত হয়—বিশেষ করে পাঁচশত বৎসর ও দেড়শত-বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এঁদের কথা স্মরণ, ধ্যান ও জীবনে অনুসরণের শপথ গ্রহণ একান্তই আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কিন্তু এই দুই লোকোত্তর পুরুষকে একই সঙ্গে স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ বড় একটা আসে না। ১৯৮৬ সাল সেই দিক থেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আরো একটি কথাও মনে না এসে পারে না। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের মানব-কল্যাণমুখী বিচিত্র মানবীয় কর্মকাণ্ড এবং অ-লৌকিক জীবনবৃত্তান্ত ভিন্ন যুগ-পরিবেশে আপাতদৃষ্টিতে যতই স্বতন্ত্র মনে হোক না কেন, নিগূঢ় একটি ঐক্যের দিকেই অঙ্গুলি-সংকেত করে। প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের ব্যবধানে এই বঙ্গদেশে দুজনের আগমন ঘটলেও মনে হয় যেন কোন এক অজ্ঞাত মঙ্গল-শক্তির প্ররোচনায় এঁরা লোক-কল্যাণের জন্যে পথভ্রষ্ট মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকের রাজ্যে নিয়ে যাবার প্রয়াস করেছিলেন—দুজনের মানবীয় ও অ-লৌকিক জীবনের মধ্যে এতো বেশি সাদৃশ্য বিশেষত মানব-প্রেমের এসব প্রগাঢ়তা দুজনকে এতো বেশি নিকটে আনে যে মানবরূপে দুই হলেও স্বরূপত যে এঁরা এক-এই ধারণাই মনে প্রবল হতে থাকে। তাই এঁদের কথা তুলনামূলক ভাবে স্মরণ করবার একটি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যের সাড়ে তিনশত বৎসর পরে আবির্ভূত হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ নানা প্রসঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করেছেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ, তাঁর কীর্তনানন্দে বিভোর নৃত্যচপল ভঙ্গী, প্রেম-রতন-ধন বিতরণে মঙ্গল-মূর্তি অস্পৃশ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করে সকল জাতিকে তাঁর ভালোবাসার সুরে আহ্বান, প্রেমময় ঈশ্বরকে সাধনার জন্যে নাম সংকীর্তন ও জীবসেবার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার স্মরণ করেছেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে তিনি যে

কতোবার ভাবাবিষ্ট হয়েছেন তার হিসেব করাও কঠিন। ভক্তদের পীড়াপীড়িতে তিনি বলে উঠেছেন—'পূর্বপূর্ব জন্মে যিনি ছিলেন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। এ জন্মে (নিজের দেহের দিকে দেখিয়ে) তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ।' প্রধান প্রধান সকল ধর্মের সুকঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন যে কোনো প্রধান ধর্মমতই অসত্য নয়। সকল ধর্মের সারকথাটি একই। তাই নিজেকে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বলে অভিহিত করার অধিকার ও যোগ্যতা তাঁর ছিল। তাঁর ঐ উক্তিটির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দেশে আবির্ভূত অন্যান্য অবতারদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের দিকটি ইঙ্গিত করেছেন। আর আমরা জানি গৌড়ের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলেন আবার কেউ কেউ বলেন তিনি বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। সে যাই হোক—এদিক থেকে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ উক্তি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগেরই সংকেত করে। তাছাড়া দক্ষিণেশ্বরে একদা আগতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমায় অভিভূতা এক সাধিকা ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ভাগবতোক্ত অবতার পুরুষদের লক্ষণগুলি লক্ষ্য করে এবং একটি বিশেষ সময়ে তাঁর মধুর-ভাবসাধন লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।' স্বামীজীও শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধু অবতার-পুরুষরূপেই বিশ্বাস করতেন না, তিনি তাঁর মধ্যে শংকরাচার্যের জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যের প্রশস্ত হৃদয়ের সম্মিলন লক্ষ্য করেছিলেন। এমনকি অন্যান্য অবতারের সম্পূর্ণতাকে তিনি তাঁর মধ্যে পূর্ণতা-প্রাপ্ত হতে দেখেছিলেন। এই সমস্ত কারণে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী তুলনা করে দেখতে যত্নবান হয়েছি।

২

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ-চন্দ্ররূপে ইংরেজি ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ এক ফাল্গুনী-পূর্ণিমা রাত্রিতে আবির্ভূত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ফাল্গুনমাসেই শ্রীরামকৃষ্ণেরও আবির্ভাব। দরিদ্র অথচ ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণবংশে উভয়েরই জন্ম। দুজনেরই মাতা ও পিতার চরিত্রের ঔদার্য লক্ষণীয়। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ দুজনেরই কোষ্ঠী-বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁরা অসাধারণ পুরুষ হবেন। শ্রীচৈতন্যকে বলা হয়েছিল 'শ্রীমদ্বৃন্দাবন পুরন্দর।' তাঁর জন্মের বিশদিন পর আগত এক দৈবজ্ঞ বলেন 'এ শিশু রাজগৌরবলাভ করবে, বৃহস্পতিতুল্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হবে, সর্বগুণান্বিত হবে, এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ'।[২] আর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে উচ্চলগ্নে জাত এই সন্তান ধর্মবিৎ ও মাননীয় হবেন এবং সর্বদা পুণ্যকর্মে নিযুক্ত থাকবেন—"বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেব-মন্দিরে বাস করিবেন এবং নবীন ধর্ম-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধিলাভ পূর্বক সকল পূজ্য হইবেন। দেখা যাচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই কোষ্ঠী বিচারকগণ নবজাতককে হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ অথবা নারায়ণের অংশসম্ভূত বলেছেন। শ্রীমন মহাপ্রভু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানরূপে মাতৃগর্ভে আগমনের কিছু পূর্বে তাঁদের মাতা ও পিতার কিছু অলৌকিক ঘটনা-দর্শন ঘটেছিল। মহাপ্রভুর যখন মাতৃগর্ভে ছয়মাস বাস তখন শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত-আচার্য এসে তাঁর মাতা শচীদেবীকে দ্বাদশ বার প্রদক্ষিণ, প্রণাম ও গর্ভ-লক্ষ্যে পুষ্পাঞ্জলি দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় যে স্বপ্ন দেখেন তার কথা তিনি নিজেই বলেছেন, আমার বাবা গয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপ্ন দিলেন, 'আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপ্ন দেখে বল্লেন, 'ঠাকুর আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা করব?' রঘুবীর বল্লেন, 'তা হয়ে যাবে,।"[৪] শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন বৈষ্ণব—বাল গোপালের উপাসক, আর ক্ষুদিরাম ছিলেন রঘুবীরের উপাসক—গয়ায় পিণ্ডদানকালে তিনি স্বপ্নে 'গদাধর'কে দেখেন। জন্মের পর নিতান্তই যখন এঁরা শিশু তখনো অনেক অলৌকিক ঘটনা এঁদের কেন্দ্র করে ঘটেছে। মাত্র নয়মাস বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গের এক সাপের ওপর শুয়ে পড়া ও ধীরে ধীরে তার পলায়ন অন্নপ্রাশনের সময় অলংকার

পারিহিত গৌরাঙ্গকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এক তস্করের ব্যর্থ হওয়া, তিন বছর বয়সে তীর্থযাত্রী এক অতিথি-ব্রাহ্মণকে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টভুজ গোপাল-মূর্তিতে দর্শনদান—প্রভৃতি ঘটনার কথা জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তাঁর মাতা চন্দ্রাদেবী স্বপ্ন দেখেন যে এক জ্যোতির্ময় দেবতা তার শয্যায় শয়ন করে আছেন। আর একদিন কামারপুকুরে যুগীদের মন্দিরে ধনী কামারনীর সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি দেখেন একটি দিব্যজ্যোতি মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে নির্গত হয়ে তাঁর মধ্যে প্রবল বেগে প্রবেশ করছে। নবজাত শিশু গদাধরের যখন ৭।৮ মাস মাত্র বয়স তখন মাতা চন্দ্রাদেবী তাঁকে মশারীর মধ্যে শায়িত গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরে এসে দেখেন মশারীর মধ্যে শিশুপুত্র নেই—পরিবর্তে এক দীর্ঘকায় পুরুষ শায়িত।

বাল্যকালে দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত এবং তাঁদের অত্যাচারে প্রতিবেশীরা বিশেষ করে স্নানার্থিনীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। অথচ তাঁদের সকলেরই ঐ শিশুদের দুটির ওপর একটা অন্তরের টান ছিল। বালক বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং গদাধর দুজনেরই মেধা-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। আবার দুজনেই অল্পবয়সে তাদের পিতৃদেবকে হারান। দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত মাতৃ-ভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গের মাতৃভক্তির কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বলেছেন, "মা-বাপ কি রকম জিনিস গা? তারা প্রসন্ন না হলে ধর্মাধর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কতোদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, 'মা' আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।"[৫] শ্রীরামকৃষ্ণেরও মাতৃভক্তি ছিল অত্যন্ত গভীর। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত তাঁর কথাতেই বলি। তিনি যখন বৃন্দাবনে যান, তখন সেখান থেকে আসতে তাঁর ইচ্ছে হয় নি। কিন্তু শেষে মায়ের কথা মনে পড়ায় 'অমনি সব বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন, ভাবলুম মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর ফীশ্বর সব ঘুরে যাবে।" শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন নিজের পছন্দ মতো বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি নিজের নির্বাচিতা পাত্রীর প্রসঙ্গে ভ্রাতা রামেশ্বরকে বলেন, "অন্যত্র অনুসন্ধান বৃথা। জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া রক্ষিত আছে।" প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু হল মায়ের চেষ্টায় শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দ্বিতীয়বার যে বিবাহ করেন তাতে তাঁর খুব একটা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না—এই রকম ধারণাই সমর্থিত হয়। হিন্দুর শাস্ত্র দর্শন সম্পর্কে দুজনের জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। শ্রীগৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করে নিজ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন ও পাণ্ডিত্যের তর্ক-যুদ্ধে সেকালের বড় বড় জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের পরাভূত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিক থেকে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রবিৎ হয়ে ওঠেন নি—কিন্তু শাস্ত্রকথা শুনে শুনে অথবা সংগীত শক্তিতে তিনি শুধু হিন্দুর ধর্ম-দর্শন নয়, বিশ্বের সকল প্রধান ধর্ম ও দর্শনে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিরই তাঁকে তর্কে পরাভূত করতে পারেন নি। এই ধর্মশাস্ত্র-জ্ঞান কিভাবে তিনি অর্জন করেছিলেন তা আমাদের ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা কঠিন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেমন শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি তাঁর মাকে গোপন করে শিখা, সূত্র ও যজ্ঞপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়ে কৌপীন ভাষায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ভূষিত হয়ে শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাসীবেশে উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। পার্থক্য শুধু এইখানে যে একজন সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন—ও অন্যজন মাতা ও স্ত্রীকে নিকটে রেখেও সন্ন্যাসের আর এক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় অগ্রসর হতে গিয়ে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে কেন সংসারত্যাগী হলেন স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে। সংসারে থেকেও কি মধুর-ভাবের সাধনা করা সম্ভব ছিল না? অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ আচার্য—এঁরা তো সংসার-বিরাগী ছিলেন না? মহাপ্রভুর সমকালে অনেকে স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে থেকে বৈষ্ণবীয় পথেই সাধনা করলেন। এর উত্তরে বলা যায় যে অদ্বৈত-

নিত্যানন্দ প্রমুখ আচার্যগণ শ্রীচৈতন্যের পরিকর এবং তাঁরাও ভক্তদের চোখে অবতার হলেও সেদিন কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন একমাত্র শ্রীচৈতন্যই। তাঁর দায়-দায়িত্ব ছিল অনেক বেশী। সেকালের ব্যাভিচার প্রবল সমাজে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বর-উপাসনার একটি আদর্শ স্থাপন করার প্রয়োজন ছিল। স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মাতা শচীদেবীর নিকটে থেকে যদি তিনি সাধনা করতেন তাহলে সন্ন্যাসের কঠোর আদর্শ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা হত না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহধর্মিণী সারদাদেবীর সঙ্গে একই কক্ষে শয়ন করেও লৌকিক সংসারে পরিচিত স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপন করেন নি,—বরং তাঁর মধ্যে জগদম্বার শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে দেবীজ্ঞানে তাঁকে পুজো করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য সাধারণের জন্যে ঐ আদর্শ অনুসরণের কথা বলেননি—কিন্তু যাঁরা যথার্থই সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তাঁদের কি দুশ্চর পন্থা অবলম্বন করতে হবে তা দেখানোর জন্যে অদ্বৈত বা নিত্যানন্দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে তিনি বললেন না (যদিও তাঁদের মতো কৃষ্ণগত-প্রাণ ব্যক্তিরাও সংসারে থেকেও সংসার-বিবিক্ত ছিলেন) নিজ জীবনকে শ্রীকৃষ্ণে উৎসর্গ করে সর্বপ্রকার সুখ আরাম ও ভোগতৃষ্ণা থেকে দূরে রইলেন যাতে সাধারণ মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা না হয়। যুগ-প্রয়োজনে মহাপ্রভু যা করেছিলেন ভিন্ন যুগ-পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের তা প্রয়োজন হয়নি—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ সেদিন তেমন ছিল না—তাই তাঁকে স্ত্রীর সংসর্গে থেকেও সন্ন্যাসের নতুন এক আদর্শ স্থাপন করতে হয়েছিল। যাঁদের পক্ষে এ-পথ গ্রহণে পদস্খলনের সম্ভাবনা তাঁরা শ্রীচৈতন্যের পথই গ্রহণ করবেন।[৭]

আর একটি বিষয়েও শ্রীমন মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণের সাদৃশ্য আছে। আমরা জানি নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ ও তাঁর সঙ্গে আলাপের মধ্য দিয়ে প্রথম তাঁর চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন তিনি শান্ত-গম্ভীর। কখনো হাসেন—কখনো কাঁদেন কখনো বা মাটিতে গড়াগড়ি দেন— মূর্চ্ছা যান, সমস্ত অঙ্গ তাঁর স্তম্ভাকৃতি কঠিন আকার ধারণ করে। লোকে বলে দেহে বায়ুমান্দ্য ঘটেছে—এর নাম বায়ুবিকার। কবিরাজ ডেকে বিষ্ণু তেল ও নারায়ণ তেল তাঁর মাথায় দেবার কথা ওঠে। এরপর তাঁর গয়ায় পিণ্ডদান উপলক্ষে গমন ও সেখানে বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন করে ভাবাবিষ্ট হওয়া ও দেহে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয়ের কথা আমরা জেনেছি। শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান ও ধ্যান করতে করতে মাঝে মাঝেই এখন থেকে তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন—নীলাচলে থাকার সময় ক্রমশ সেই ভাব-তন্ময়তা বৃদ্ধি পায় এবং 'দিব্যোন্মাদ' অবস্থার মধ্য দিয়ে শেষের কয়েকটি বছর তাঁর কাটে। নীলাচলে থাকার সময় ক্রমশ সেই ভাব-তন্ময়তা বৃদ্ধি পায় এবং 'দিব্যোন্মাদ' অবস্থার মধ্য দিয়ে শেষের কয়েকটি বছর কাটে। নীলাচলের দ্বাদশ বর্ষ ২৮ বৎসর জীবনে এই দিব্যোন্মাদ অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। সমুদ্রের দিকে যেতে চটক পর্বত দেখে শ্রীমন মহাপ্রভুর গোবর্ধন-শৈল বলে মনে হয় এবং তিনি আবিষ্ট হয়ে পড়েন। গোবিন্দ, স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর প্রভৃতি সমুদ্রতীরে অনেকেই আসেন এবং দেখেন যে বায়ুবেগে সেখানে আসার সময় শচীনন্দনের প্রথমে 'স্তম্ভভাব' হয় ও চলার শক্তি হারান। এই অবস্থাও কিছু পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন কৃষ্ণদাস এইভাবে—

"প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদগম কদম্ব একার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে, রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার।।
দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিয়া যেন গঙ্গা-যমুনা ধার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প ওঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥

প্রভু ভূমিতে পতিত হলেন। পরে উচ্চ সংকীর্তন করে, শীতল জলে তাঁর অঙ্গ সংমার্জন করে ও বহুবার হরিনাম শুনিয়ে তাঁর চৈতন্য-সঞ্চার হয় এবং 'হরিবোল' বলে তিনি আতঙ্কিত ওঠেন। বাহ্য জ্ঞান শূন্যতা থেকে প্রভু এখন অর্ধবাহ্যদশায় ফিরে আসেন এবং আরো কিছুক্ষণ সময় লাগত তাঁর স্বাভাবিক বাহ্যদশায় আসতো অন্তর্দশা থেকে অর্ধ বাহ্যদশার মধ্য দিয়ে বাহ্যদশায় ফিরে আসার এই স্তর গুলি কৃষ্ণদাস চমৎকার বর্ণনা করেছেন।[৮] আমরা দেখলাম অন্তর্দশায় তাঁর অঙ্গ-গ্রন্থিসকল শিথিল হয়ে পড়ত এবং প্রতি রোমকূপ শণের মতো মাংস ফুলে উঠত এবং সেখান থেকে বিন্দু বিন্দু আকারে রক্ত নির্গমন হত। এই সমস্ত শারীরিক বিকার অত্যন্ত ক্লেশকর হলেও ভক্তির প্রাবল্যে তা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক অনুরূপ ব্যাপার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও দেখি। তাঁর জীবনে প্রথম ভাবাবেশ ঘটেছিল নিতান্তই বালক-বয়সে ঘনপুঞ্জ মেঘের কোলে বলাকা-শ্রেণীকে উড্ডীয়মান দেখে গ্রামের মাঠে পরে আরো একবার বিশালাক্ষীর মন্দিরে। কলকাতায় এসে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে মনের মধ্যে দেখাবার অনুক্ষণ চিন্তায় তিনি অত্যন্ত গাত্রজ্বালা অনুভব করতেন।—কখনো কখনো তাঁর বক্ষ আরক্তিম হয়ে উঠত—ঘুম একেবারেই হত না। প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা ও গাত্রদাহ ইত্যাদি রোগের উপশম—জন্য নানা প্রকার ওষুধ ও তেলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঐ কবিরাজের গৃহে আরো একজন পূর্ববঙ্গীয় বৈদ্য বলেছিলেন যে তাঁর ব্যাধি যোগজ এবং তা ওষুধে সারবার নয়। বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর জীবনের একটি পর্বে মধুর ভাবের সাধনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্যে তাঁর যে আকুলতা এবং তার জন্যে তাঁর দেহে যে বিকার দেখা দিত তা রাধাভাবে-ভাবিত শ্রীচৈতন্যদেবের কথাই স্মরণে আনে। তিনি স্বয়ং সারদানন্দজী প্রমুখ ভক্তদের বলেছিলেন যে এই সময় তাঁর দেহের গ্রন্থিগুলি ভগ্নপ্রায় ও শিথিল হয়ে যেত। শরীরের লোমকূপ দিয়ে সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ত এবং ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেহ কখনো কখনো মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে থাকত।[৯] পার্থক্য শুধু এই যে তাঁর প্রতি রোমকূপে ব্রণের মতো মাংসপিণ্ড অবশ্য দেখা যেত না।

শ্রীচৈতন্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ ছয় বছর ধরে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত ভ্রমণ ও তীর্থদর্শন না করলেও তিনি ভক্ত মথুরামোহনের সহযোগিতায় বৈদ্যনাথ ধর্ম, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী এবং আমাদের নবদ্বীপ প্রভৃতি দর্শন করেছিলেন। বিভিন্ন তীর্থস্থানে অবশিষ্ট হতে দুজনকেই দেখা যায়। দীনদুঃখীর জন্যে সীমাহীন ভালোবাসা ছিল দুজনেরই। শ্রীচৈতন্যের কাছে জাতিভেদ ছিলনা—তাঁর ধর্ম গ্রহণের অধিকার সকলেরই। 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণভজ'। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সীমা ছিল না। পুণ্যবান, পাপী, হিন্দু, মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র বেশ্যা পতিত—সকলেই তাঁহার ভালোবাসার ভাগ পাইত; সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন;" গলিত-কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের স্পর্শে যেমন রোগমুক্ত হয়েছে, তেমনি জগাই-মাধাই এর মতো পাষন্ড মাতালও তাঁর সান্নিধ্যে এসে প্রেমিক ভক্তে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর আন্তরিক আবেদন কুলীন গ্রামনিবাসী শূকরচারণকারী ডোম এবং নবদ্বীপের যবন দর্জী পর্যন্ত সাড়া না দিয়ে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা চিন্তা করলে দেখি যে তিনি যখন বৈদ্যনাথধামে যান, তখন সেখানে এক দরিদ্র পল্লীতে স্ত্রী-পুরুষদের দুর্দশা দেখে অত্যন্ত কাতর হন এবং ভক্ত মথুরবাবুকে অনুরোধ করে তিনি তাদের একদিন ভোজন ও প্রত্যেককে একখানি করে বস্ত্রদানের ব্যবস্থা করেন। আবার এই মথুরবাবুর জমিদারী মহল রাণাঘাট দেখতে গিয়েও সেখানকার একস্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠান এবং তাদের প্রত্যেককে এক মাথা করে তেল, এক একটি নতুন কাপড় ও পেটভরে একদিনের ভোজন করান। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ নিধুবন, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজঃ এনে পঞ্চবটীর চারদিকে ছড়িয়ে দেন ও কতক নিজ সাধন কুটীরে প্রোথিত করে বলেন, "আজ হইতে এই স্থল বৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হইল।" শুধু তাই নয়, এ ঘটনার কিছুদিন পরে নানা স্থান থেকে বৈষ্ণব গোস্বামীগণকে

নিমন্ত্রণ করে এনে তিনি পঞ্চবটীতে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। তাছাড়া তিনিও বহু মানুষের রোগ ও দুঃখ কষ্টকে দূর করে নিজ শরীরে কষ্ট ভোগ করেছেন একথা নিজেই জানিয়েছেন। অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি ছিল তাঁর। কুটতার্কিকও তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্ক করতে থাকলে তিনি যখন একবার তার দেহ স্পর্শ করতেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটত। এবিষয়ে তিনি বলতেন "কথা বলতে বলতে অমন ছুঁয়ে দিই কেন জানিস? যে-শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।"[১০] আবার দক্ষিণেশ্বরে প্রসাদ খেতে আগত কাঙালীদের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করতেও তিনি ছিলেন নিঃসংকোচ। সকল মানুষের প্রতি জাতিধর্ম বর্ণনির্বিশেষে এই গভীর ভালোবাসা দুজনেরই মধ্যেই লক্ষনীয় হয়ে আছে।

দুজনের বিশেষ-বিশেষ যুগ-পরিবেশে যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে যে মহান আবির্ভাব এবং সেই প্রয়োজন যে যুগাতিত দেশাতীত হয়ে বিশ্বের সমস্ত মানুষের কল্যাণসাধন করেছে তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-পূর্ব বাংলায় চলছিল হাবসীদের অপশাসন। দেশে যথার্থ ধর্মচর্চা বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। মদ্য মাংস উপচারে যক্ষপুজা পুতুলপুজো ও সারা রাত্রি ধরে মঙ্গলচণ্ডীর গান চলত। ব্যবহার-রসে সকলে হয়ে উঠেছিল মত্ত। হৃদয়ের পুষ্প নিবেদন করে দেবতার প্রতি ভক্তি-নিবেদন ছিল না। বাহ্য আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের হৈ-চৈ ভোগা-সক্তিকেই বড় করে তুলেছিল— অন্ধ তামাসকতায় দেশ হয়েছিল আচ্ছন্ন। আবার তন্ত্র-সাধনার নামে ব্যভিচার, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনের নামে কামাচার দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিল। উচ্চকোটির হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা সমাজের নিম্নশ্রেণীর বিশাল অংশকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। মানুষ হিসেবে তাদের অমর্যাদায়, অস্পৃশ্যতার কথা তুলে তাদের নানা ব্যাপারে বঞ্চিত করায় এবং অপরদিকে মুসলমান রাজানুগ্রহ লাভের আশায় তারা অনেকেই ধর্মান্তর-গ্রহণ করছিলেন। রাষ্ট্রে কিছু পরে হোসেনশাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশে পরিপূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না। কাজী মৌলবী ও মুলুকপতিদের অত্যাচার বন্ধ হয় নি। কারাবাস-ভয়, জাতিনাশ-ভয় এবং প্রাণভয় হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করে রাখত। উচ্চকোটির সমাজে নীরস ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়চর্চা আতিশয্যে হৃদয়-দেশ শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। ঠিক এইরূপ পরিস্থিতিতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। প্রতাপান্বিত গৌড়ের সুলতানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলেও তাঁর সংকীর্তনে বাধা দিতে এসে কাজীর যে দুর্দশা ঘটেছিল—সেকথা আমাদের জানা। তাঁর উদার হৃদয়-নির্ভর সহজ প্রেমধর্মের ছায়াতলে হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যোগদান করায় হোসেন শাহের মতো সুলতানও চিন্তিত না হয়ে পারেন নি। এমন মানুষকে অকারণ পীড়ন করতে গেলে বড় ধরনের গোলযোগ ঘটার সম্ভাবনা তাঁর মনে নিশ্চয়ই উদিত হয়ে থাকবে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর বিরাট সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে যে সংহত-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে গৌড়ের মুসলমান সুলতান এদেশে হিন্দুদের সম্পর্কে তাঁর গৃহীত নীতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন একথা বলা নিশ্চয়ই চলে। আবার সেই বিপর্যস্ত মানসিকতায় বাংলার মানুষ শ্রীচৈতন্যের নিকট যে প্রেম-ধর্মকে লাভ করলেন তা তাঁদের গভীরভাবে আশ্বস্ত করল। জীবসেবা, নামকীর্তন ও ঈশ্বরভক্তি— সাধারণ মানুষ এই সহজ পথেই ঈশ্বরের ভজনা করুক। সাধনার আরো উচ্চস্তরে উঠতে চান, তাঁদের জন্য তিনি রেখে গেলেন নিজ জীবনাদর্শ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন। বর্ণ-ভেদের হৃদয়হীনতা দূর হল হিন্দু-মুসলমান কারো পক্ষেই চৈতন্যধর্ম-গ্রহণে বাধা রইল না। মানুষে মানুষে প্রেম এবং নাম-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে উজাড় করে দিয়ে প্রেমময় ঠাকুরের আরাধনা সমাজকে সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে সাহায্য করল। জগৎ সুন্দর ও প্রেমময় বলে প্রতিভাত হওয়ায় এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে রাধা ও কৃষ্ণরূপে দেখতে পেয়ে পদকর্তার কণ্ঠে গান জাগল—বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থ, দেশ ছেয়ে গেল। এইভাবে রাষ্ট্র, সমাজ ধর্ম ও সাহিত্য সেদিন শ্রীচৈতন্য নিয়ে এলেন নতুন এক ভাবের জোয়ার। দেশের গুরুতর সেই সংকটকালে ধর্মের

গ্লানি দূর করে যথার্থ ধর্মের সংস্থাপন, সংরক্ষণ ও সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে ধর্মের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে বলার জন্যেই তিনি এসেছিলেন। জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি করে জীবনে পরমশান্তি ও বাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করা যায়, এ কথা আপনি আচরি ধর্ম অপরে তিনি শিখিয়ে গেছেন। বাংলার ইতিহাসে তিনি আনলেন যুগান্তর।

শ্রীচৈতন্যের প্রায় সাড়ে তিনশত পরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর আবির্ভাবের-পূর্বে-বাংলার সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে দেশে ছিল মুসলমানী শাসন—বিধর্মী হলেও প্রাচ্য-ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিলেন মুসলমানেরা। এবারে এলেন ইংরেজ বণিকগণ। প্রথমদিকে ব্যবসায়ের সূত্রে এলেও পরে তাঁরাই এ দেশের শাসক ও শোষক হয়ে ওঠেন। সমাজের ধর্ম ও আদর্শের গোড়ার দিকে ছিলেন দেশের অত্যাচারী জমিদারগণ। ইংরেজ বণিকদের সংস্পর্শে অনেকেই হয়ে উঠলেন বিত্তবান 'হঠাৎবাবু'। স্থূল জৈব-জীবনকে ভোগ করার প্রচণ্ড নেশা ধরিয়ে ছিলেন কালক্রমে ঐ ইংরেজ। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে এদেশের যুবসমাজকে মোহাভিভূত করল। তারা "রাস্তায় ঢলাঢলি করিতে লাগিল, বাপ-জ্যাঠাকে old fool বলিয়া গালি দিতে শিখিল, গুরু-পুরোহিতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল, সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিল, আর নিজেরাও অকালে শ্মশানে দেহরক্ষা করিতে লাগিল।"[১১] কলকাতায় ডিরোজিও এবং রিচার্ডসন প্রমুখ অধ্যাপকদের প্রভাবে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ভোগসর্বস্ব জীবন, সর্ব বিষয়ে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি ও ইহসর্বস্বতাকে বরণ করে নিল। হিন্দুর সুপ্রাচীন প্রতিমা-পূজায় তারা অবিশ্বাসী হল। খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে অনেক যুবক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করল—হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা তখনও প্রবল; তা আক্রমণের বিষয় হল। খৃষ্টান পাদরীগণ নিজেদের ধর্ম-প্রচারের অতি উৎসাহে হিন্দুধর্মকে নস্যাৎ করতে চাইল। দেশের এই দুর্দিনে রামমোহন প্রাচীন শাস্ত্র থেকে ভারতের সনাতন ধর্মকে বের করলেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার ওপর তিনি জোর দিলেন। ব্রাহ্মধর্মের পত্তন করে তিনি জানালেন মূর্তিপূজা, নৈবেদ্যাদি উপকরণ নিবেদন, বলিদান—প্রভৃতি হিন্দুদের প্রচলিত রীতিগুলি ভ্রমাত্মক। দয়া, সুনীতি সৌভ্রাত্র, সৎ উপদেশ, প্রার্থনা ও সঙ্গীতের ওপর তিনি গুরুত্ব দিলেন। উপনিষেদিক ধর্মের ওপর ভিত্তি করে তাঁর মতবাদ গড়ে উঠলেও হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিলই। তারপর দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেনের আমলে বিশেষ করে কেশবচন্দ্রের সময়ে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে আরো গুরুতর বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল। উপবীতধারী ব্রাহ্ম উপবীত ত্যাগ করবে, নতুন মতে ব্রাহ্মদের বিবাহ হবে, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে, বিধবা-বিবাহ চলবে এবং অসবর্ণ বিবাহ থাকবে—এই সব ব্যবস্থা পত্তন করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধ দেখা দিল। দল ভেঙে দুটো হল—আবার—কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ নিয়ে তাঁর দল ভাঙন ধরল। এইভাবে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেও যেমন তেমনি হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মেরও বিরোধ চলতে থাকল। গোঁড়া হিন্দুরাও বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। সমগ্র সমাজ তখন আন্দোলিত হয়ে উঠল। ধর্মান্তরণ তো চলছেই—উপরন্তু পাশ্চাত্যের ভাবধারার অনুকরণে দেশ মত্ত হয়ে উঠেছে। দেশের সনাতন ধর্ম একরূপ লুপ্ত হতে বসেছে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন যুগ-প্রয়োজনে সেদিন ভক্তিধর্মকেও উপেক্ষা করেন নি—তাঁদের সাধনায় নিষ্ঠার অভাব ছিল না—কিন্তু নবযুগের উত্থিত সমস্যাগুলির পূর্ণ সমাধান তাঁরা করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থ তখনো লিখিত হয় নি। কিন্তু তিনিও দেশে ধর্মের দুর্দিন লক্ষ্য করে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই ভাঙন-ধরা সমাজ-মানসের সর্বনাশা আলোড়ন বন্ধ হচ্ছিল না। জাতিহিসেবে বাঙালী ও ভারতীয়দের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সেই দুঃসময়ে সনাতন হিন্দুধর্ম লুপ্ত হয়ে যাবার সেই সংকটকালে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ইংরেজ তার অতি উন্নত সভ্যতাও সংস্কৃতি নিয়ে জাতির চিত্ততটে আছড়ে পড়েছে।

দিশেহারা জাতি এই সময় জীবনের উদ্দেশ্য, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা যুগ-যুগবাহিত হিন্দুধর্মের মধ্যে নানা আবর্জনা দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। একটুখানি শান্তি ও স্বস্তির আশায় সে উদ্‌ভ্রান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণই সেদিন ধর্মকে রক্ষা করলেন মানুষকে তার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়ে। সে-কালের নবীন-প্রবীণ বৃদ্ধ-যুবক শিক্ষিত-অশিক্ষিত—যে কোনো মানুষ ধর্মসংক্রান্ত যে-কোনো প্রশ্ন ও তার সমাধানের জন্যে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সদুত্তরটি পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন—তার মনের সব সংশয় সব দ্বিধা কেটে গেছে। ঈশ্বর আছেন কিনা, তাঁকে দর্শন করা সম্ভব কিনা, থাকলে তিনি সাকার না নিরাকার? অথবা তিনি কি দুইই? জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি? গৃহীর পক্ষে ধর্মাচরণ কিভাবে সম্ভব? সকল ধর্মই কি সত্য? কোন্ পথে ঈশ্বর-লাভ সম্ভব? জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মের পথে কি পরস্পর সম্পর্কহীন? ভোগ জীবনে আদৌ কাম্য কিনা, পুঁথিগত বিদ্যা, তর্ক ও লেকচারের মূল্য কি? লোকহিত বা জীবসেবা সংসারে থেকে কিভাবে করা যায়? আমাদের দেশের সনাতন ধর্ম কি বর্তমান যুগে অচল—ইত্যাদি অজস্র প্রশ্নের সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচিত ঘটনার সাহায্যে দৃষ্টান্ত দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।[১২] এ জীবনেই 'মাঝে মাঝে নির্জনে বাস, ঈশ্বরের গুণগান ও বস্তুবিচারের দ্বারা ঈশ্বরলাভ সম্ভব'। 'আন্তরিক হলে সংসারেও ঈশ্বরলাভ করা যায়'। 'ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বাকী সব অনিত্য'। 'বিবেক-বৈরাগ্যলাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় আর থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ। সদাসৎ বিচারের নাম বিবেক।" ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। সেকালের অনেক শিক্ষিত যুবক আত্মহত্যা করেছিল—সে প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে।' অর্থের পশ্চাতে মানুষের পশ্চাদ্ধাবন-কে তিনি পছন্দ করতেন না। তাই জানালেন, 'টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না।' টাকা ছুঁতে গেলেই তাঁর নিজের হাত বেঁকে যেত। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথাও তিনি বলেছেন। সংসারী মানুষ সংসারে থেকেও কামিনীতে আসক্ত হবে না। ব্রহ্ম ও শক্তিকে তিনি অভেদ বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন—যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। তাঁর মতে "মায়া আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা আর দয়া সর্বভূতে সমান ভালোবাসা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "ঈশ্বরলাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়। আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক, পথ আর সকলের মিথ্যা এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।" অন্তরের ভক্তি নিয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনখানিকে রেখে সংসারী মানুষ সংসার ধর্ম করুক, সংসারও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালন করুক, মাতৃঋণ পরিশোধ করুক। নিজের আত্মরক্ষার জন্যে কিছু তমোগুণও রাখা দরকার। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলে জীবসেবার মতো বড় জিনিস আর কিছু নেই। সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রায় যতখানি সংযম-সতর্কতা দরকার, গৃহীর ততখানি প্রয়োজন নেই। এইভাবে শ্রীচৈতন্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণও যুগ-প্রয়োজন সাধন করে সমগ্র বিশ্ববাসীর মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন।

৪

এবারে আমরা দুজনের গভীর সাদৃশ্যের দিকটি শ্রীরামকৃষ্ণের দিক থেকেই তাঁর আচরিত কর্ম ও অনুভবের মধ্য দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করব। একথা ঠিক যে শ্রীরামকৃষ্ণ সব সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করে উপলব্ধি করেছিলেন সব পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এবং কোনো ধর্মই মিথ্যা নয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে মনে হয় সব সাধনাই অত্যন্ত দুরূহ এবং কঠোর শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধন পথে সিদ্ধি অর্জন করতে হয়েছিল। নারীর মতো বেশভুষা ধারণ করে নিজ পুরুষীয় ভাবকে বিস্মৃত হয়ে তিনি প্রায় ছয়মাস এ-সাধনা করেছিলেন। রাধা

ভাবে ভাবিত হতে না পারলে তাঁর কৃপা না পেলে এ-সাধনা সফল হবে না। তাই ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে এই সময়ে পুষ্পচয়ন করতে দেখে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী মনে করেছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন ও তাঁর অঙ্গে ঐ মূর্তিকে সম্মিলিত হতে দেখেন। নাগকেশর-পুষ্পের কেশরের মতো তিনি গৌরবর্ণ দেখেন শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিকে। এই সময় ঠাকুরের মধ্যে মহাভাবের সকল লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছিল বলে ঐ ব্রাহ্মণী এবং বৈষ্ণবচরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকের তিনি পূজ্য হয়ে ওঠেন। এই কালে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণরূপেই ভাবতেন এবং সব কিছুকেই কৃষ্ণময় দেখতেন। এক এক সময় তার এমনও মনে হত যে স্ত্রী-শরীর নিয়ে জন্ম নিলে গোপিকাদের মতো শ্রীকৃষ্ণকে ভজনাও লাভ করে কৃতার্থ হতেন। আবার কখনো এ কল্পনাও জাগ্রত হত যে যদি কোথাও জন্মগ্রহণ করতে তাহলে ব্রাহ্মণের ঘরে পরমাসুন্দরী দীর্ঘকেশী বালবিধবা হয়েই জন্মাবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাউকে পতিরূপে তিনি মানবেন না। এই মধুর ভাবসাধন কালে আরো একটি তাঁর দিব্যদর্শন ঘটে—যাতে তিনি দেখান ভগবান, ভক্ত ও ভাগবতে কোনো পার্থক্য নেই—"তিন এক, এক তিন।" দীর্ঘ ছয়মাস নারীভাবে থাকার সময় তিনি মথুরা-মোহনের অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করতেন এবং তাঁদের সখী হয়েছিলেন তিনি। হাবে ভাবে চলনে বলনে তখন তাঁকে নারী বলেই ভ্রম হত। তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী জীবনীকারগণ আমাদের জানিয়েছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এমনই একটা নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য ছিল যে অনেক ভক্ত পর্যন্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, তিনি পুরুষ না নারী? তাঁর মধ্যে এই নারী মধুর-ভাব সাধনের সময়েই নয়, অন্য সময়ও লক্ষিত হত। এ বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসাধনার সকল পথকে সত্য বললেও মনে হয় ভক্তিপথের প্রতি তাঁর যেন একটা দুর্বলতা ছিল। তিনি ভক্তদের বলতেন, "ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভালো—এ সহজ পথ।" আবার "জ্ঞান পথ বড় কঠিন পথ।…এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।" শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উঠলেই ঠাকুর কেমন উন্মনা হয়ে পড়তেন। ১৮৮৩ সালের ১৫ই এপ্রিল সুরেন্দ্রভবনে উৎসব-মন্দিরে তিনি কীর্তনগান শুনছিলেন। গোষ্ঠ খোল বাজাচ্ছিল আর ঠাকুরের উদ্দীপন হচ্ছিল। খুলির দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে তিনি বলছিলেন, "একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও।" সেই গান শুনতে শুনতে তিনি হলেন সমাধিস্থ। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন সুরেন্দ্রের বাগানে ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনগান শুনে ঠাকুরের মধ্যে শ্রীরাধার ভাব হয়—তখন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য—দেহ স্পন্দনহীন ও নয়ন তাঁর অর্ধনিমীলিত। চৈতন্যদেবের প্রেমোন্মত্ততার প্রসঙ্গে একবার তিনি বললেন, 'প্রেমোন্মাদ হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নাই। মাটিতে বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছেন—ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই; শরীর বলে বোধই নাই।" আবার তিনি যখন ভক্তদের সঙ্গে স্টারে 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখতে চলেছেন, তখন একজন ভক্ত বেশ্যাদের দ্বারা চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অভিনয় হবে বলায় তিনি জানালেন, "তারা চৈতন্যদেব সেজেছে তাহলেই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়। …চৈতন্যদেব মেড়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। যেই শোনা অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন।" তিনিও চৈতন্যলীলা দেখে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। অভিনয় শেষে সমাধিভঙ্গে গাড়ীতে উঠে চলে যাবার সময় তিনি আপন মনে বললেন—'হে কৃষ্ণ, জ্ঞাণকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, মনকৃষ্ণ, আত্মাকৃষ্ণ, দেহকৃষ্ণ।' বিজয়াদি ভক্তদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস কথার কীর্তন-গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ হলে ভক্তেরা ভেবেছিলেন, 'সাক্ষাত গৌরাঙ্গ কি আসিয়া মহোৎসব করিতেছেন?"[১৩]

বলরাম মন্দিরে পুনর্যাত্রা দিবসে সন্ধ্যাকালে ঠাকুর যখন রাম নাম, কৃষ্ণ নাম হরি নাম করছেন তখন ভক্তদের মনে হয়েছিল যে বলরামের বাড়ী যেন নবদ্বীপ—'বাহিরে নবদ্বীপ ভিতরে বৃন্দাবন।"[১৪] অধরের বৈঠকখানাতেও শ্রীগৌরাঙ্গ-কথার গান শুনে ঠাকুর নৃত্য করতে করতে

সমাধিস্থ হয়েছেন। অর্ধবাহ্যদশায় চৈতন্যের মতো কখনো ঠাকুরের সিংহবিক্রমে নৃত্য, যখন একটু প্রকৃতিস্থ তখন গানে আখর দিচ্ছেন আবার কখনো অন্তর্দশা—সমাধিস্থ অধরের বৈঠকখানা তখন যেন শ্রীবাসের অঙিনা।' এইরূপ প্রচুর ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। শিহড় গ্রামের নিকটে শ্যামবাজারে সাতদিন ধরে ঠাকুরের কীর্তন গান শোনা ও সমাধিস্থ হওয়া, কৃষ্ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ খোলবাদক রাইচরণের খোলবাদন শুনে তাঁর ভাবাবেশ, উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনরায় অবতীর্ণ বলে মনে করা, কলকাতার কলুটোলা পল্লীতে শ্রীকাশীনাথ দত্তের বাড়ীতে হরিসভার অধিবেশনে তাঁর গৌরাঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট আসন ভাবাবেশে গ্রহণ, নবদ্বীপধাম গমন কালে গঙ্গাগর্ভের যে-স্থানে শ্রীচৈতন্যের ভিটা ছিল সেই চড়ার ওপর দিয়ে নৌকায় যাত্রার সময় ঠাকুরের গভীর ভাবাবেশ, ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীর যশোদার ভাবে তন্ময় হয়ে ঠাকুরকে বালগোপালজ্ঞানে ভোজন করানো—প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম। ঠাকুর বারবার যে ভক্তদের কাছে ভক্তির কথা বলেছেন তাও বিস্মৃত হলে চলবেনা। তিনি বলতেন, 'ভক্তি থেকে তাঁর কৃপায় সব হয়—জ্ঞান বিজ্ঞান সব হয়।" দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে জন্মোৎসব দিবসে ঠাকুর ভক্তদের বলেছেন—'ভক্তিই সার। সকাম ভক্তিও আছে; আবার নিষ্কাম ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তিও আছে।…আবার আছে উর্জিতা ভক্তি। ভক্তি যেন উছলে পড়ছে। ভাবে—হাসে নাচে গায়, যেমন চৈতন্যদেবের।" এই কথার পরেই শ্রীম মন্তব্য করেছেন—"ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন নিজের অবস্থা? ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার? জীবকে ভক্তি শিখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন?"

শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে ঠাকুরের এমনই একটা আত্মিক যোগ যে একবার তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গের নগরকীর্তন দেখাবার সাধ হয়। জগদম্বা তখন তার ইচ্ছা কিভাবে হরণ করেন সে কথা সারদানন্দজী মুখে শুনুন, "নিজ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটীর দিক হইতে অদ্ভুত সংকীর্তনতরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে। দেখিলেন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর প্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুর্পার্শ্বস্থ সকলে তাহার প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশ ভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তান্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে।" এই সংকীর্তন দলের কয়েকটি মুখ তাঁর স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ছিল এবং এ-দর্শনের কিছুদিন পর তাদেরকে নিজ ভক্ত রূপে আগমন করতে দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেন পূর্বজীবনে তারা শ্রীচৈতন্যেদেবের পরিকর দিলেন। এঘটনাটিও বিশেষ তাৎপর্য বোধক।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়ে সাদৃশ্য থেকে এবং ঠাকুরের নিজ বারবার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসঙ্গ উত্থাপনে, তাঁর মধুর ভাবসাধনে নানাজনের সাক্ষ্যসহায়ে একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে শ্রীচৈতন্যই সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ। একই দেবতা দুই অবতার পুরুষরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন যুগ—প্রয়োজন সাধন করলেন এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীবহ করে আনলেন। আর সেই জন্যই তাঁকে এতো বেশী করে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনার কথা বলতে হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ এই যোগটি স্বামীজীও[১৫] উপলব্ধি করেছিলেন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শংকরাচার্যের "brilliant intellect" এবং "Wonderfully expansive infinite heart of chaitanya' লক্ষ্য করেছিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির একটা চমৎকার সমন্বয় হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও আমরা বলি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ভক্তির প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। আর এই কারণেই তাঁর নিজের কথায় তিনি শ্রীরাম রূপ। শ্রীকৃষ্ণ দুইই। একই দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ। □

উৎস নির্দেশ ঃ

১. শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের বৎসর নিয়ে একটু গোলযোগ আছে। ইংরেজি ১৮৩৫ বা ১৮৩৬ দুইই-সে তারিখ বলে দাবী করা হয়েছে। এই হিসেবে কেউ কেউ ১৯৮৭ সম্পর্কে তাঁর জন্মের ১৫২-তম বর্ষ বলতে চান।

২. শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী—ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ

৪. শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, পৃঃ ৬৪৭

৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে—স্বামী সারদানন্দ

৬. ঠাকুর ভক্ত বিজয়কে বলেছিলেন, 'চৈতন্যদেব লোক শিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, পৃঃ ৬৮৫

৭. ঠাকুর ভক্ত বিজয়কে বলছিলেন, 'চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, পৃঃ ৬৮৫

৮. শ্রীচৈতন্যের এই অবস্থাটির পরিচয় দিতে ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী গ্রন্থটির সাহায্য নিয়েছি।

৯. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৬৯

১০. তদেব, পৃঃ ২০১

১১. অক্ষয় দত্ত গুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৬

১২. শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত উক্তিগুলি শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

১৩. তদেব, পৃঃ ৬৮৩

১৪. তদেব পৃঃ ৬৯৭

১৫. ঠাকুর সম্পর্কে স্বামীজীর উক্তিটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে উদ্ধৃত।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ড. অসিত সরকার

শ্রী ও শ্রীরামকৃষ্ণ। বাংলার দুই ঠাকুর। সীমাবদ্ধ মানব জীবনে অসীমের আহ্বান জানাতে যেন একই সত্তার পরপর আবির্ভাব। সংসারের তাপক্লিষ্ট আমরা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক তাপে সর্বদা জারিত হচ্ছি! তাপ-প্রবাহ সর্বদাই জীবনকে ক্লিষ্ট করে চলেছে। কখনও সে তাপ আসছে মানুষ বা অন্য-প্রাণীর কাছ থেকে যা আধিভৌতিক তাপ কখন ও দৈবদুর্বি-পাক ঝড়, ঝঞ্ঝা, প্লাবন জাতীয় আধিদৈবিক তাপ আর তাছাড়া নিজের মনের জ্বালায় তো জ্বলছিই নিরন্তর—আধ্যাত্মিক তাপ। সনাতন গোস্বামীপাদের প্রসিদ্ধ উক্তি—কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়?' এ যেন সর্বমানবের জিজ্ঞসো। 'কে আমি?' এ প্রশ্ন হয়তো সর্বজনীন নয় কিন্তু 'কেন মোরে জারে তাপত্রয়?' এ যন্ত্রণা-উৎসারিত প্রশ্ন তো সকলের। স্বামীজী বলছেন—

'যতদূরে যতদূরে যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহন,
এই সেই সংসার জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।'

সংসার জলধির দুঃখসুখের আবর্তনে আবর্তিত মানুষের আর্ত-জিজ্ঞাসা—এর থেকে কি পরিত্রাণ নেই? পরিত্রাণের বার্তা বহন করে এনেছিলেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু বার্তা শোনানোর জন্য নয়, নিজেদের জীবনে আচরণ করে আমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁরা। 'আপনি আচরি ভক্তি শিখাইনু সভারে'—শ্রীচৈতন্যের সংকল্প। 'আমি ষোল-আনা করলে তবে তোরা এক আনা করবি'—শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

দুজনেই সন্ন্যাসী। সর্বত্যাগী না বলে সর্বগ্রাহী বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত। সকলকেই অন্তরে গ্রহণ করেছেন। সর্বভাবহীন কলিমলমলিন জীবকে উদ্ধারের সংকল্প নিয়ে তাঁদের আবিভার্ব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 'তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ'। মৃত্যুসংসার সাগরের পারের তরণী নিয়ে তাঁদের আবির্ভাব। আপন আপন সাধনোদ্দেশ্যে কি তাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন? মহাপ্রভুর উক্তি—

'যবে সন্ন্যাস লইনু, ছন্ন হইল মন।
সন্ন্যাসে কি কাজ মোর—প্রেম প্রয়োজন॥'

জীবপ্রেমের দায় মেটাতেই তাঁর গৈরিক বসন মুণ্ডিত মস্তক। শ্রীরামকৃষ্ণ তো সন্ন্যাসীর সাজটুকুও রাখেন নি। অঙ্গে জামা, পরনে ধুতি, পায়ে জুতো। স্ত্রীও সঙ্গেই থাকেন। অথচ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ এ এক বিচিত্র সাধনা—সব সাধনার চেয়ে কঠোরতর। যেখানে 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে' সেখানে এ এক অভিনব জীবন যাপন। 'আমি মা বৈ কিছু জানিনা' এ শুধু মুখের কথা নয়—এ তাঁর জীবনবেদ। সবই তাঁর মা, সর্বত্রই তাঁর মা। 'তাঁর মা বিরাজে ঘরে ঘরে জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।' শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবনের মূল সুরটি তো এই 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে। তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥' সর্বত্রই তিনি তাঁর আরাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখছেন।

প্রেমিক পাগল শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি আসে যায় তাতে। কেউ যদি 'ঈশ্বর' নামক অদেখা অজানা কোন সত্তার ভাবর্ষণে ঘর ছাড়েন তাতে আমরা তাঁদের পূজার বেদীতে স্থান দেব কেন? তাঁদের আমরা পূজার বেদীতে স্থান দিয়েছি এই জন্য যে তাঁরা ঈশ্বর প্রেমকে এক লোকোত্তর অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আত্মানন্দে বিভোর থাকেন নি। ঈশ্বর প্রেমকে রূপান্তরিত করেছেন মানবপ্রেমে। বাসুদেব ঘোষের ভাই গোবিন্দ ঘোষ বর্ণনা করেছেন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কারণ :

দেখিয়া জীবের দুঃখ ছাড়িনু গোলকের সুখ
লভিলাম মনুষ্য জনম।
পাইলাম কষ্ট যত তোমরা পাইলা তত
হইল সব পশু পরিশ্রম॥
পণ্ডিত পড়ুয়া যারা আমারে না মানে তারা
মোর উপদেশ নাহি লয়।
ভাবি হই বুদ্ধিহারা কিরূপে তরিবে তারা
দূর হবে নরকের ভয়॥
অনেক চিন্তার পর দৃঢ়াইনু এ অন্তর
আমি ত্বরা ছাড়ি গৃহবাস!
মস্তক মুণ্ডন করি এ ডোর কৌপীন পরি
অবিলম্বে লইব সন্ন্যাস॥
তবে তো পাষণ্ডী সব শুনি হরি হরি রব
নামে প্রেমে হইবে পাগল।
সবে যাবে নিত্যধাম পূর্ণ হবে মনস্কাম
অবতার হইবে সফল॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।' আর মানবকে ঈশ্বরলাভ করানোই শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ব্রত। 'সবে যাবে নিত্যধাম' এই তাঁদের মনস্কাম। ঈশ্বরলাভের উপায় নির্দেশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 'সাধুসঙ্গ ও ব্যাকুলতা'। ব্যাকুলতার মাত্রাটা যে কী সেটা জীবনে সাধন করে দেখিয়েছেন। রাতের পর রাত পঞ্চবটীতে ধ্যানরত। সকাল থেকে আকুল কান্না 'মা গো, আরেকটা দিন বৃথা চলে গেল মা, তোর দেখা পেলাম না।' ঘাসের মধ্যে মুখ ঘসেছেন আর কাঁদছেন—"দেখা দে মা দেখা দে। তবে কি সব মনের ভুল? তাতো নয় মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, কমলাকান্তকে দেখা দিলি আমায় দিলি নে।" মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চুল ছিড়ছেন, কাদায় সর্বাঙ্গ মাখামাখি। অঙ্গে বস্ত্র নেই, উপবীত নেই, লজ্জা নেই, লৌকিকতা নেই। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তিনি। উত্তুঙ্গ বিশ্বাস আর উদ্দাম ব্যাকুলতা সম্বল করে মাতৃহারা বৎসের মতো মাতৃসন্ধানে মাতৃসান্নিধ্যের আশায় দিবারাত্র কাটিয়েও যখন মাকে পেলেন না তখন দেবী ভবতারিণীর হাতের খড়্গ তুলে নিলেন ব্যর্থ জীবনের অবসানের সংকল্পে।

এই ব্যাকুলতা যেন আরও দীর্ঘায়িত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনে। পিতৃকার্যের উদ্দেশ্যে গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের পর থেকে বাকী জীবনটাই যেন এক আকুলতার প্রতিচ্ছবি। পরম দৈন্যে সাধারণ জীবের ভাবে দাস্যভক্তি প্রার্থনা করছেন তিনি—

'প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন! / দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥'

প্রেমময় যিনি তিনি প্রেমের অভাব অনুভব করছেন। বলছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

হে জগদীশ্বর, আমি ধনজন সুন্দরী বা কবিত্বশক্তি কামনা করি না। যেন জন্মে তোমাকে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে এই প্রার্থনা। সর্বলোক নিস্তারিতে গৌর অবতার'। তাই যেন সর্বজীবকে প্রার্থনা শেখাচ্ছেন। আকুল ক্রন্দনে প্রার্থনা করছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

হে নন্দনন্দন, আমি তোমার দাস, আমি বিষম ভবসমুদ্রে নিপতিত, তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার চরণকমলস্থিত ধূলিকণার ন্যায় মনে কর। কাতরভাবে ডাকছেন 'হে কৃষ্ণ তোমার নাম করতে বিগলিত অশ্রুধারায় কবে আমার নয়ন ভেসে যাবে, কবে আমার গদগদ্‌বাক্যে বদন রুদ্ধ হবে, কবে আমার সমস্ত শরীরে পুলকে রোমাঞ্চিত হবে। হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে আমার কাছে এক নিমেষ যেন যুগ যুগান্তরের ন্যায় মনে হয়, নয়নে যেন বর্ষার ধারা নামে। হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে আমার কাছে নিখিল বিশ্ব যেন শূন্যে মিলিয়ে যায়। প্রাপ্তির উচ্ছ্বাসে কখনও বলছেন 'মুই সেই, মুই সেই'। আবার কখনও গোবিন্দবিরহে 'দন্তে তৃণ ধরি' আকুল প্রার্থনা করছেন 'আমায় কৃষ্ণ এনে দে'। কী গম্ভীর, বিস্ময়কর সাধন-জীবন। আমাদের কাছে অচিন্ত্যনীয়।

এই সুদুর্লভ 'কৃষ্ণপ্রেম' কিন্তু কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির সম্পদ করে রাখতে চাননি। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'—জীবমাত্রেরই প্রতি যাঁর ভাবনা তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও নয়। তাই—

'জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে / আপনি আস্বাদি ভক্তি করিলা প্রকাশে ॥

নিম্নবর্ণের তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষ যারা উচ্চবর্ণের অত্যাচারে দলে দলে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল তারা আবার মানুষের মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। এই তো জীবের জাতি। হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মে তৎকালীন মানুষ মানবত্বে উত্তীর্ণ হলো আর ভবিষ্যৎ মানবকুল পেল মৃত্যুসংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার পরম পাথেয়।

এই মানবপ্রেমের আরেকটি ধারা শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'সর্বধর্ম স্বরূপ' 'অবতারবরিষ্ঠ' গুরুদেব সম্বন্ধে বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্মচিন্তার সাকার বিগ্রহরূপ।' আট বছরের বালক সবে পৈতে হয়েছে ভিক্ষা-মা করলেন ধনী কামারনীকে। ব্রাহ্মণকন্যা নন সামান্য কর্মকার কন্যা। তথাকথিত 'ছোটজাত'। তবু জিদ ধরে কুলপ্রথা লঙ্ঘন করলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ঈপ্সিত বহন করছে এই সামান্য অথচ অসামান্য ঘটনাটি। পরবর্তী জীবনে রসিক মেথর থেকে নটী বিনোদিনী পর্যন্ত কে না তাঁর কৃপা পেয়েছে। জীবসেবাই তো মানবধর্ম। কিন্তু জীবসেবার প্রাক্‌ শর্ত দিলেন 'শিবজ্ঞান'। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। জীবের অন্তরে আগে শিবকে দেখতে শেখা তারপর তার সেবা। না হলে 'জীবসেবা তো' শুধু আত্ম অহঙ্কারকে স্ফীত করে। তাই প্রকৃত মানবধর্মটি কি, মূলসুরটি কি সেইটি ধরিয়ে দিলেন সুরেন্দ্রনাথকে। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে, আপন সাধনশক্তি দান করে নরেন্দ্রনাথকে। জগৎজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দে পরিণত করলেন তিনি। এরও মূলে আছে মানুষের প্রতি অতলান্ত ভালবাসা। তাঁর ভাষায় 'আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলা নয়, সেটি কেটে কেটে সকলকে ভাগ করে খাওয়ানো' শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মানুষের প্রাণের ঠাকুর। মানুষ হিসেবে আমাদের বিনম্রচিত্তের প্রণতি তাঁদের প্রাপ্য। কৃতজ্ঞচিত্তে তাই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমরাও বলি—

'যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ / রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্‌' ॥

যাঁর শক্তিতে আমরা ও সমুদয় জগৎ কৃতার্থ সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি। পরম ভাগবত বৈষ্ণব মহানন্দের সঙ্গে আমরাও প্রার্থনা করি

'নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যশে / সভার শরীর পূর্ণ হউক প্রেমরসে ॥' □

সমন্বয়সাধক শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

বরুণ সাহা

বাংলা তথা ভারত তথা বিশ্বের আধ্যাত্মিক আকাশে যে দুটি শক্তিমান জ্যোতিষ্ক চির ভাস্বর হয়ে সারা বিশ্বের ধর্ম জিজ্ঞাসুদের উপর সমধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন—তাঁরা আমাদেরই এই বাংলার দুই যুগপুরুষ; একজন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য, অপরজন প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গের বহু শাস্ত্রীয় আলোচনা, ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্য সাহিত্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য—উভয়কেই পরিপুষ্ট করেছে। সংস্কারমুক্ত যথার্থ পণ্ডিতগণ ব্যতীত উভয় ধারার অনুবর্তী ভক্ত সাধারণের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভেদবুদ্ধি সর্বদা দৃষ্ট হয়। অন্ততঃ আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। প্রেম যমুনা আর পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা যদিও বহমানা দুই স্বতন্ত্র ধারায়—তবু তারা মিলিত হয়েছে তাদের সঙ্গমস্থলে। এই মিলনের মধ্যেই এই দুয়ে মিলে একের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ সাধনা। তাই তো গঙ্গা যমুনার মিলনস্থল হয়েছে পুণ্যভূমি—তীর্থক্ষেত্র।

ধর্মরক্ষা ধর্মসংস্থাপন হেতু ঈশ্বরের নরদেহে আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের বহু যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করা হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে ও পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যে। উভয় সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হলো তাঁদের অবতারত্বের এই যুক্তি প্রমানগুলি। শ্রীচৈতন্যের জীবনীকারগণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মুরারী গুপ্তের কড়চা প্রভৃতিতে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকারগণ, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থে উভয়ের সাধনা, অবতারত্ব, শিক্ষাদান, জীবনাদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য ভক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত উভয়েই শ্রীচৈতন্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতে পারেন অনায়াসে। প্রকৃত ভক্ত অবশ্যই তা করেন। কিন্তু আমরা অনেকেই সংস্কারের গুটি কেটে বাইরে আসতে পারি না—আপন সৃষ্ট গুটির মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যাই ; ফলে প্রজাপতি হয়ে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে এসে মধুপানে তৃপ্ত হতে পারিনা। ভক্ত শুষ্ক আচার আর প্রাণহীন সংস্কারের বাইরে এলেই কেবল ঈশ্বরীয় মধু আস্বাদনের অধিকার লাভ করেন। তখন শ্রীচৈতন্যে আর শ্রীরামকৃষ্ণে ভেদ থাকে না। তবে ভক্ত তাঁর বাঞ্ছিত রূপে যে ভগবানকে চাইবেন এটা স্বতন্ত্র। যেমন চেয়েছিলেন মহাবীর তাঁর আরাধ্যকে দুর্বাদলশ্যাম রঘুপতি রাঘব শ্রীরাম মূর্ত্তিতেই, আবার গৃহত্যাগের প্রাক্কালে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেও মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে নদীয়া বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের মূরতিতেই দেখতে চেয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আর্বিভাবের সময় তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় আমরা কী দেখতে পাই ? দেখতে পাই হিন্দুধর্মের উপর মুসলমান শাসকদের উৎপীড়ন, হিন্দুদের ছলে বলে কৌশলে

ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদগ্র প্রচেষ্টা। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের যাঁরা অধিকাংশই ছিলেন শক্তিপূজক তাঁরা প্রায়শ ধর্মের নামে বামাচার ও ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকতেন। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ বিকৃত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ও ভিন্ন ভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। সমাজ-ব্যবস্থার শিথিলতায় সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত, সমাজ জীবন বিকৃত উপধর্ম সমূহের মতবাদ ও আচারে পংকিল। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের ঘৃণা ও ছুঁতমার্গের শিকার হয়ে স্বেচ্ছায় বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে জাতিকে পরিত্রাণের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন শ্রীচৈতন্য। তখন এমন একটি ধর্মের আবশ্যক হয়ে পড়েছিল যা ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে এক সূত্রে গ্রথিত করে নতুন করে প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে পারে জাতির জীবনে; সর্ব প্রকার মালিন্য, কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ধর্মের দুর্বার গতিশীলতায়।

লোকশিক্ষার নিমিত্ত গার্হস্থাশ্রম থেকে সন্ন্যাসাশ্রমে গেলেন শ্রীচৈতন্য ত্যাগ ও পবিত্রতার দৃষ্টান্ত স্থাপন কল্পে, আর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমদ্‌ নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণ করলেন সন্ন্যাসশ্রম থেকে গার্হস্থাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানেও লোকশিক্ষার প্রয়োজন ছিল। উদ্দাম বা বল্গাহীন ভোগ নয়, পরিমিত বা সংযত ভোগের বিধান দিলেন গৃহীদের। বললেন—

"মর্কট বৈরাগ্য না করিও লোক দেখাইয়া।

যথাযথ বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥"

যাগ-যজ্ঞ-পূজো কোনকিছুরই আবশ্যক নেই, "হরের্ণামৈব কেবলম্‌" কলিযুগে ভবরোগের মহৌষধ—এ সত্য ঘোষণা করে এবং "জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবনের" শিক্ষা দিয়ে শিথিল সমাজ ব্যবস্থায় তিনি এনেছিলেন একটা সুসংবদ্ধতা। শ্রীচৈতন্য জাত পাতের কুসংস্কারকে আমল না দিয়ে তৎকালীন সমাজের কাছে যা কিনা অভিনব এমন একটি কথা শোনালেন, "চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরি ভক্তি পরায়ণঃ।" সে যুগে বৈষ্ণবধর্মের মতো এমন একটি যুগ ধর্মের প্রয়োজন ছিল যার ব্যাপ্তি সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা, নীচতা, জাত্যাভিমানকে পরিহার করে একটি সুবিশাল জাতি গঠন করতে পারে। আচার সর্বস্ব অভিজাত মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের হিন্দু শক্তি পূজকেরা এতকাল তাদের দ্বারা অবহেলিত, দরিদ্র, নিপীড়িত, নীচকুলোদ্ভব এই বিরাট জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন না, পারলেন না শ্রীচৈতন্যের সেই প্রেমধর্মের প্লাবন রোধ করতে। রক্ষা পেল সনাতন হিন্দুধর্ম চরম অবক্ষয়ের হাত থেকে।

আমরা এখন ফিরে আসি শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে সাড়ে তিন শত বছর পরে। এ যুগের সামাজিক পটভূমিকায় দেখতে পাই ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের মধ্যাহ্নকাল, মধ্যাহ্ন সূর্যের মতোই বৃটিশ শাসকের দাপট। শিক্ষিত বাঙালীরা অধিকাংশই ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকুরী পাবার জন্য লালায়িত, অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত মানুষেরও ইংরেজদের সম্পর্কে একটা ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা রয়েছে। শিক্ষিত শ্রেণীর চাল চলনে হাবভাবে দেখা গেল ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তা, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-শিল্প-ধর্মে অনীহা কেবল নয়, অশ্রদ্ধা ও দেখা দিল।

দেখা দিল ধর্ম জীবনে আবার একটা শূন্যতা। খৃষ্টান মিশনারীরা ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচারের সুযোগ নিয়েছিল সেই সময়। ভারতীয় জীবন ও দর্শনের মূল্যবোধ গেল কমে। দলে দলে শিক্ষিত সম্প্রদায় খৃষ্ট ধর্মের প্রতি ঝুঁকলেন, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির জন্য এই ধর্মও মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শৈবাল আচ্ছাদিত বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হলো। হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতার দোষদুষ্ট বলে অভিযুক্ত ও অবহেলিত হলো। জন্ম হ'লো ব্রাহ্ম ধর্মের।

ব্রাহ্মধর্ম'ও তার নেতারা সমকালীন সংকট থেকে উদ্ধারের পথ দেখাতে পারলেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম মূলত এক নির্দিষ্ট মানুষজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো এই যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি, "একধারে রাম ও কৃষ্ণ"। বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন "অবতার-বরিষ্ঠ"। সেই ধর্ম রাখার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহে অবতরণ। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মকেই কেবল বাঁচালেন না, সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বধর্মের মূল সুর যে একই সেটাই উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করলেন। "যত মত, তত পথ," এর চেয়ে উদারতর অথচ সত্য কথাটা আর কেউ বলেননি। আমরা শুনলাম এ যুগে তাঁরই কণ্ঠে। সংঘাত নয়, মিলন। এ মহামিলনের মন্ত্র মানুষ আগে শোনে নি। তিনি মত ও পথের উর্দ্ধে। সব মতে সিদ্ধিলাভ করলেন ঠাকুর, প্রচার করলেন মানব ধর্ম। বললেন—"জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূর শালা কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীব সেবা।" তাইতো তিনি সর্বমত ও পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে জড়বিজ্ঞানের যুগে যুক্তিশীল মানুষের কাছে সর্বশেষে যে বার্তাটি সুন্দর ভাবে—উপস্থাপন করলেন তা হলো, "যার পেটে যা সয়।" তিনিই তো বললেন সহজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোন ধর্ম, কোন মতই বড় বা ছোট নয়, এরা একই জলাশয়ের ভিন্ন ভিন্ন ঠাকুর যে অন্যান্য ধর্মমত সাধনা করেছিলেন তার উল্লেখ করতে হবে। ঘাট বই তো নয়। খুল্লতাতপুত্র রামতারক ওরফে হলধারীকে বললেন, "তুই মাকে তামসী বলিস—মা যে সব—ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধ সত্ত্বাগুণময়ী।" এ শুধু হলধারীকে নয়, সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছেই—এ শ্রীরামকৃষ্ণের বলিষ্ঠ ঘোষণা। শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাথে রাখীবন্ধন করালেন ঠাকুর এখানেই। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনেই ছিলেন শক্তির উপাসক। শ্রীচৈতন্যের দেবী—অন্নপূর্ণা আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভুবনেশ্বরী।

শুধুমাত্র এই দুটি মতের সমন্বয় নয়, অন্যান্য মতেরও সমন্বয় সাধন করেছিলেন তিনি। ঠাকুরকে সকল মতের সকল পথের লোকরাই আপনজন বলে মনে করতেন। শাক্ত-শৈব, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বৈষ্ণব সাধকেরা নিজ নিজ ইষ্টরূপে তাঁকে দেখেছেন। জ্ঞানপন্থী সাধক, শিখ ব্রাহ্ম সকলেই তাঁর কাছে এসে ভীড় করেছেন, তাঁর মধ্যে নিজেদের ভাব ও আদর্শের পরিপূর্ণতা খুঁজে পেয়ে ভক্তিরসাপ্লুতভাবে—তাঁর চরণ বন্দনা করেছেন। তাই তো বিবেকানন্দ প্রণাম মন্ত্রে ঠাকুরকে "সর্ব ধর্ম স্বরূপিণে" বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের সময় সমাজ পরিস্থিতি একটু ভিন্নতর ছিল। বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাব না থাকায় এ যুগের মতো ধর্মাচরণ তখন ততটা উপেক্ষা ও উপহাসের বস্তু হয়নি। আপামর জনসাধারণের অন্তরের গভীরে ফল্গুধারার ন্যায় ধর্মবোধ বহমান ছিলই। কেবল রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, বিভিন্ন উপধর্ম ও কুসংস্কারের প্রভাব, ধর্মের গোঁড়ামি সমাজ জীবনকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। সেই সুযোগে অভিজাত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ত্যাগ ও ধর্মের নামে ব্যাভিচার ও বিষয় ভোগ লিপ্সা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই কারণেই শ্রীচৈতন্য নিজের ও নিজ ভক্তদের উপর কঠোর অনুশাসন, সংযম ও কৃচ্ছ্রতা আরোপ করেছিলেম। "উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহ" নদীয়া বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ মুণ্ডিত-কেশ দণ্ডধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন লোকশিক্ষার স্বার্থেই। অন্তরঙ্গ পার্ষদের কাছে তিনি তা ব্যক্তও করেছেন।

শ্রীচৈতন্য হরিনাম বিলিয়েছেন। হরিনামে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও হরিনাম কীর্তনানন্দে বিভোর হতেন—তাঁর ভাব সমাধি হ'তো। পানিহাটী মহোৎসবে ঠাকুরের নৃত্য দর্শন করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর হইতে কখন পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি

করিতেছেন।" শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ শ্রীচৈতন্যের মত শ্রীরামকৃষ্ণও আমাদের সামনে রেখে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবমতে বাৎসল্য ও মধুরভাবে সাধনা করেছেন, সিদ্ধিলাভ ও করেছেন।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনেই অবতার পুরুষ। প্রেম-ভক্তি শ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে শ্রীচৈতন্য মতবাদ লক্ষনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, কর্ম—যার যেভাব সেই পথেই অগ্রসর হতে বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "ভক্ত হন রস, ভগবান রসিক; ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন—রাধাকৃষ্ণ লীলা।" ভক্তি জ্ঞান থেকেও গরিয়সী, এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে, ভক্তি অন্দরমহলে যায়।"

শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিলতা রোপন করেছিলেন কালের প্রভাবে পুষ্ঠির অভাবে ও আগাছা সংকুল হওয়ায় তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ আগাছা পরিস্কার করে জল সিঞ্চন ও পুষ্টির যোগান দিয়ে সেই ভক্তিলতাকে সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

"যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।" চৈতন্যচরিতামৃত

জ্ঞান ও ভক্তি, মত ও পথের সমন্বয়ের যে সূচনা করেছেন ভগবান শ্রীচৈতন্য, ভগবান রামকৃষ্ণ তার পরিপূর্ণতা দান করে "শ্যামা মায়ের কোলে বসে শ্যাম সাধনার" মাধ্যমে আমাদের সকল ভ্রান্তি দূর করেছেন। ☐

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও সারদাদেবী

সরস্বতী মিশ্র

বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীমা সারদাদেবী বর্তমান সমাজপটভূমিতে অত্যুজ্জ্বল দুটি নাম। বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যগৃহিণী ও সারদাদেবী রামকৃষ্ণগৃহিণী তথা লীলাসঙ্গিনী। যুগে যুগে ভগবান্ যুগ-প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন। সঙ্গে আনেন মায়ারূপিণী লীলাসঙ্গিনী। দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ কলিতে পুনরায় চৈতন্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন্। রামকৃষ্ণ রূপে তিনিই আবার প্রকটিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই নিজের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যে রাম সেই কৃষ্ণ ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ।' শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনেই যুগাবতার। যুগের প্রয়োজনে এই দুজনেরই আবির্ভাব। বিষ্ণুপ্রিয়া ও সারদামণি দুজনেই এই আবির্ভাব লীলায় বিশেষভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পাঁচশো বছর আগেকার দিনগুলির দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে—শ্রীগৌরাঙ্গের নামে নবদ্বীপ প্লাবিত। শ্রীগৌরাঙ্গকে সকলে গৌরহরি নামেই ডাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার তখন শৈশবকাল। শিশুকালে তিনিও ছোটদের সঙ্গে হরিবোল বলে নৃত্য করেছেন। গৌরহরি নাম শুনে তাঁর শরীর পুলকিত হয়ে ওঠে। এই গৌরহরি নাম তাঁর কর্ণে যত সুধা ঢালে তা আর কখনও হয়নি। এই আনন্দ তিনি জীবনে পাননি। তিনি সব সময় ভাবতেন এই আনন্দঘন সঙ্গ কি তাঁর ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটবে!

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যহ তিনবার গঙ্গায় স্নান করেন। তিনি গৌরহরি নামে মনপ্রাণ পরিপূর্ণ করে রাখেন। একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করে আসছেন, এমন সময় শ্রীগৌরচন্দ্র বয়স্য সমভিব্যাহারে সেইপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর ছিল অপূর্ব মাধুরী। বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন ভরে মাধুরীটি দেখে নিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও সোনার প্রতিমাখানি দেখে নিলেন। মুহূর্তের জন্য চারিচক্ষুর মিলন হল। কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণখানি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করে বাড়ী ফিরে এলেন। তিনি কিন্তু রুক্মিনীর দ্বারা পত্র দিয়ে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন নি, কিংবা রাধার মত অভিসারেও যাননি, তাঁর গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলন হল শচীমাতার মাধ্যমে।

পরবর্তীকালে শ্রীমার জীবনেও আমরা দেখতে পাই যুগ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর এই পরিণয় পূর্ব নির্ধারিত। একটি ঘটনা থেকে তা আমরা জানতে পারি। জয়রামবাটীর অনতিদূরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। ঐ গ্রামে শান্তিনাথ শিবের একটি প্রাচীন দেবালয় ছিল। বিশেষ বিশেষ উৎসবে ঐখানে যাত্রাভিনয় হত। এই সকল উৎসবের দিনে বিভিন্ন নরনারী সমবেত হত। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও উপস্থিত ছিলেন। তখন শ্রীমা ছোট বালিকা। তিনি জনৈক রমণীর কোলে বসে গান শুনছিলেন। গান শেষ হলে এক বর্ষীয়সী রমণী সারদাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এতলোক এখানে রয়েছে, তুমি কাকে বিয়ে করবে?" আশ্চর্যের বিষয়, এই ক্ষুদ্র বালিকা দুহাত তুলে মণ্ডপে উপবিষ্ট

যুবক গদাধরকে (ঠাকুর রামকৃষ্ণ) দেখালেন। এই ঘটনা সাধারণ দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ, কিন্তু এটা যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং উভয়ের ভবিষ্যৎ দিব্যজীবনকেই সূচিত করে তা অনস্বীকার্য। এইভাবে আমরা দেখি এবং উপলব্ধি করি যে পতি নির্বাচনে বিষ্ণুপ্রিয়া ও সারদামণির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও সারদামণি দুজনেই স্বামীর কার্যের সহায়ক ছিলেন। দুজনে তাঁদের অতিমানব স্বামীর ঘরে অত্যন্ত আনন্দে ছিলেন। একবার ঠাকুর শ্রীমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ ? মা বলেছিলেন—'আমি তোমাকে সংসার-পথে টানবো কেন ? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।' শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া একবার পিত্রালয়ে ছিলেন। সেইসময় তিনি শুনতে পান যে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নেবেন। তখন সংবাদটির সত্যতা যাচাই করার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি স্বামী-সকাশে চলে আসেন। যখন এসে শুনলেন যে কথাটি ঠিক, তখন স্বামীকে বলেন, আমি তো তোমাকে ধর্মীয় কোন কাজে বাধা দিই না। আমি পিতৃগৃহে থাকবো তুমি সন্ন্যাস নিয়ে নিজের বাড়ী থাকো। নইলে বৃদ্ধা-মা অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। দুজনেই ছিলেন আদর্শ গৃহবধূ। পতির সেবা করেছেন দুজনেই নিষ্ঠা সহকারে। শুধু এই নয়—বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতার ও শ্রীমা চন্দ্রাদেবীরও সেবাযত্ন করেছেন নানাভাবে।

তারপর আমরা দেখতে পাই যে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ দর্শন করেন একবার মাত্র এসে তাঁর নিজের খড়ম জোড়া দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেই খড়ম জোড়াকে সামনে রেখে আর ৩২ অক্ষরী মন্ত্রজপ করে—সারাজীবন অত্যন্ত কষ্টে কাটান। তিনি আহার পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। জনশ্রুতি একলক্ষ জপ করে একটা চাল রাখতেন। এইভাবে যতলক্ষ জপ করতেন ততগুলি চাল রান্না করতেন অর্থাৎ নাম মাত্র ভক্ষণ করে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনিই প্রথম নিমকাঠে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পুজো করেন। শ্রীমাও ঠাকুরের ছবির পুজো আরম্ভ করেন। এখন যেমন ঘরে ঘরে ঠাকুরের মূর্তির পুজো হচ্ছে ; এর প্রবর্তিতা শ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে সেই পট দিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া আজন্মকাল আপন স্বামীর মধ্যে ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর থেকে জীবন ত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের রাত্রে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। এ শুধু সজ্জা নয়, এ দীর্ঘ অবহেলিত, অত্যাচারিত নারী সমাজের প্রতি শ্রীচৈতন্যের শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এই সজ্জা শ্রদ্ধার সীমা অতিক্রম করে পুজায় রূপান্তরিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে প্রেম আর পুজো একাসনে আসীন 'যারে কয় প্রেম তারে কয় পুজো'। বিবাহোত্তর কালে বিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীচৈতন্য ক্রমশঃ তাঁর সাধন পথের যোগ্যা করে তুলেছিলেন। সাময়িকভাবে চৈতন্য বিচ্ছিন্নতায় বিষ্ণুপ্রিয়া আকুল হলেও পরে আত্মসচেতনতায় উদ্দীপ্ত হয়েছেন। সামলে নিয়েছেন নিজেকে। তারই ফলশ্রুতি চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বৈষ্ণব সমাজকে নেতৃত্ব দানে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপস্থিতি। গৃহিনী থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণব সমাজে জননী রূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ত্যাগ, তিতীক্ষা—নারী সমাজের আদর্শ।

বিবাহের পর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে আপন অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গিনীরূপে ক্রমশঃ প্রস্তুত করেছিলেন। আদর্শ নারীর রূপ ও ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শ্রীমাও নিজেকে তুলে ধরেছিলেন লোকসমক্ষে। চোদ্দ-বছর বয়সে শ্রীমা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তখন তাঁর অনুভূতির কথা লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী জানিয়েছেন—'পবিত্র বালিকা দেহবুদ্ধি বিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদর-যত্ন লাভে ঐকালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন।'[১] শ্রীমা নিজে এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—'হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে ; এই সময় থেকে সর্বদা এমন মনে হত। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতখানি যে পূর্ণ হয়ে থাকত তা বলে বোঝাবার নয়।'[২] শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে তাঁকে প্রস্তুত করছিলেন সে প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—'প্রদীপের

সলতেটি কিভাবে রাখতে হবে, বাড়ির প্রত্যেককে কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি সংসারের খ‍ুঁটিনাটি কথা থেকে, ভজন কীর্তন ধ্যান সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয়ই তিনি আমাকে শেখাতেন।'[৩]

এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীরা পেয়েছে ভারতীয় নারী আদর্শের সার্থক পথ, সাধারণ মানুষ পেয়েছে জ্ঞানদায়িনী-লোকজননীকে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠায় ও তার অগ্রগতিতে শ্রীমার উজ্জ্বল ভূমিকা আমাদের সকলেরই জানা। শ্রীমার ত্যাগ, তিতীক্ষা, সেবা, আধ্যাত্মিকতা, তুচ্ছ আবার-বিচারের বিরোধিতা, শুভঙ্করী কর্মে প্রেরণা—এ সবের মধ্য দিয়ে তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন লোকজননী, দেশজননী, সংঘজননী ও বিশ্বজননীতে। তাঁর এই রূপান্তরের মধ্যে সার্থক হয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমোঘবাণী—'ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।' অন্যত্র বলেছেন—'ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে। ও আমার শক্তি।' এ শুধু কথার কথা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালী পুজোর রাত্রে শ্রীমাকে পুজো করে, পুজার্ঘ নিবেদন করেছিলেন তাঁর পাদপদ্মে। এ ঘটনা প্রমাণ করলো নারীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি। প্রবহমান নারী-অবহেলার বিরুদ্ধেও এ এক উজ্জ্বল প্রতিবাদ। নারীকে যোগ্য আসনে বসাবার এমন দৃষ্টান্ত এ দেশে আর তেমন নেই। শ্রীচৈতন্যের বিষ্ণুপ্রিয়া সজ্জার সঙ্গে অংশত তা তুলনীয়।

পরিশেষে যে কথাটি বলতে হয়—তা হল বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীমা—দুজনেই দুঃখভোগ করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেই দুঃখভোগ বইবার কালে তা প্রকাশ পেয়েছে আচরণে। তাই বুঝি সহজিয়া বাউলের সুরে উচ্চারিত হয়—'আমি চার যুগে হই জনম দুঃখীনী। দুঃখে দুঃখে জনম গেল মোর···' ইত্যাদি পংক্তি। চারযুগের শেষ জনা যে বিষ্ণুপ্রিয়া তা বুঝতে আমাদের বাকী থাকে না। শ্রীমার জীবন ছিল আনন্দে পরিপূর্ণ। শত দুঃখে, কষ্টে তিনি থেকেছেন অবিচল। যুগপ্রয়োজনে শ্রীচৈতন্য গৃহত্যাগ করে সাময়িকভাবে দুঃখ কষ্ট দিয়েছেন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বিষ্ণুপ্রিয়া তাই সেই দুঃখভার থেকে বলে উঠেছিলেন—'কেমনে ছাড়িব আমি প্রাণনাথ। তাহারে ছাড়িয়া বা সাঝিব কোন কাজ।' শ্রীমাকে এমন কথা বলতে হয় নি ; শ্রীরামকৃষ্ণও সন্ন্যাস নিয়ে গৃহে অবস্থান করেছেন। লোকশিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে দুঃখের বিশীর্ন রেখাকে মুছে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন শান্তি বারি গৃহভ্যন্তরে এবং বাইরে। আর এই কাজে ছিলেন শ্রীমা তাঁর যথার্থ সঙ্গিনী। □

প্রসঙ্গ সূত্র ঃ

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৫৩
২. ঐ, পৃঃ ৩৫৩
৩. ঐ, পৃঃ ১৩৯

ভুবনজোড়া আসনখানি

ড. তাপস বসু

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোয় বহু যোজন পথ অতিক্রম করা যায়। সে আলোয় কৃপণের জং ধরা কৌটোটা যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যক্ষপুরের মানুষজন স্বজন হারানোর বেদনা নিয়েও চিনতে পারে নিজস্ব মুখচ্ছবি, সমস্ত ক্রোধকে জড়ো করে যে মানুষ শান দেয় নিজস্ব অস্ত্রে তার চাকচিক্যে গলে পড়ে হিংস্রতা-ক্রোধাগ্নি, নারীজীবনের বেহিসেবী অবগুণ্ঠন পড়ে খশে। স্বার্থের চিলেকোটায় পৌঁছানো মানুষটি নামে, নেমে আসে। প্রেমিক পুরুষ দু হাতের মুঠিতে চেপে ধরে সানন্দে বলে ওঠে আরো আলো, আরো ব্যাপ্তি। প্রসারতা সীমা ভেঙে নতুন সীমা গড়ে। মানুষজন সেই আলোকিত রহস্যের উৎসে দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে। উম্মোচিত হয় রহস্য, খুলে যায় দ্বার। আলো যিনি বহন করে এনেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে হৃদয় মাঝে জমা হয়ে যায় টইটম্বুর শ্রদ্ধার সে আসন। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী স্তরে তাঁর উচ্চারণ তাঁর অমেয় অনুভবের প্রকাশ তীব্র গতি সম্প্রসারিত করে। আসলে পথটা যে আলোকিত সত্যের, জীবনের উষ্ণতায় মাখামাখি, ভাবীকালের জন্যও সটান এবং বড় বেশি প্রয়োজনীয়—কেননা 'অরুণ আলোর সোনার কাঠির' স্পর্শে 'বিশ্বহৃদয়-হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া' ছুটে বেড়ায় গৃহ হতে গৃহান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো বাংলার মাটিতে সাড়ে তিনশো বছরের ব্যবধানে বয়ে এনেছিলেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ। দুজনের জন্ম লগ্নের প্রেক্ষাপটেই জমে ছিল দুঃসহ অন্ধকার। উর্দু কবি হালীর একটা শায়েরীতে চমৎকার ভাবে সেই অন্ধকারের ধাপটি গাঁথা হয়ে গেছে—'ইধর হিন্দ মে হরতরফ অন্ধেরা। / কি থা গিয়ান গুণকা লড়াইয়াসে ডরা।'[১] হাবসী নেতা সিদি বদরের শাসনকালের (১৪৮৭—১৪৯৩) অন্ধকার ছিল বড় বেশি ভয়াবহ। তিলক কেটে, পরিপাটি পোশাকে অঙ্গ ঢেকে ছুৎমার্গের দল সমস্বরে বলে চলেছেন—'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।' বুদ্ধের উদারতা, ভ্রাতৃত্বের বাণী তখন মলিন হয়ে গেছে। তার ইংগিত মিলেছে চর্যাপদের মধ্যে—'নগর বাহিরেরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া। / ছোই ছোই জাই সে ব্রাহ্ম নাড়িআ।'[২] শুধু সাহিত্য নিদর্শন নয় ঐতিহাসিক নিদর্শন চাই। তাও আছে—'ভূমিহীন সমাজে শ্রমিক-শ্রেণীও সুস্পষ্ট, ইহার অধিকাংশ অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ বর্ণবন্ধ, স্বল্পসংখ্যক মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের নিম্নস্তরে। পালপর্বে চণ্ডাল পর্যন্ত সমাজের নিম্নতম শ্রমিকশ্রেণীস্তর সমাজদৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত; কিন্তু সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অত্যুচ্চারণের ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দৃষ্টির আচ্ছন্নতার ফলে তাঁহাদিগকে সমাজদৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।'[৩]

অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদপ্রথা, ধর্মের নামে ভণ্ডামী যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন ধর্মান্তরণের কাজ দুর্বার গতিতে করে চলেছেন পাঠান শাসকদের নির্দেশে ধর্মপ্রচারকেরা। সুফী শাহ জালাল একাই নাকি রেকর্ড সংখ্যক মানুষকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।[৪]

পারিপার্শ্বিক দুঃসহ অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো বহন করে এনেছিলেন শ্রীচৈতন্য। কার্ল মার্কস সেই উৎসারিত আলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে উচ্চারণ করেছেন—'চৈতন্য ছিলেন ভারতবর্ষে প্রবহমান জাতপাতের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামী প্রবক্তা। তাঁর ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনাদৃপ্ত সংস্কার মুক্ত স্বচ্ছ একটি মন। হৃদয়ে ছিল মানুষের জন্য অপার ভালোবাসা।'[৫]

অপার ভালোবাসাইতো টেনে এনেছিল সকলকে। যে যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে কিংবা বসে, শুয়ে কিংবা নিজের ছায়াকে ছুঁয়ে—সবাই এসেছিল। একটা নামের কৌলিন্যে, উচ্চারণে দূর হয়েছিল জড়তা অবসাদ। প্রাণে প্রাণ যোগ করার বীজ মন্ত্র সে নাম। সে নামই হরিনাম। নিত্য মুক্তির সোপান। হরিনাম। এই নামে সকলের অধিকার। বিপিনচন্দ্র পাল খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করলেন—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের বড় কথা হল এর সার্বজনীন আবেদন। হিন্দুধর্মের জাতিনির্ভর অধিকারীভেদের ব্যাপারটি শ্রীচৈতন্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ভগবানের নাম কীর্তনই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ পূজা ;—কোন নৈবেদ্য উপাচার, আচার অনুষ্ঠান নয়, কোন পুরোহিতের প্রয়োজন নেই. পূজার্চনা ভক্ত নিজেই করবেন একবার ঈশ্বরের নাম নিলেই মানুষ দেহমনে পবিত্র হবে এবং ভগবানের পূজার অধিকারী হবে। এই সার্বজনীন পূজার মন্ত্র হল একটিই—হরিনাম।'[৬] শুধু কি বাংলায়? ক্রমাগত তা সম্প্রাসারিত হয়েছে ভারতের নানা স্থানে। চার্লস গোভার সেই সম্প্রসারিত ছবিটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন দক্ষিণ ভারতে। তাই লিখে জানিয়েছেন—'বৈষ্ণবদাসেরা বা ভিক্ষুক গায়কেরা ত্রিপদী ছন্দে গান রচনা করে গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন গ্রামে গ্রামে। এরাই কৃষ্ণ উপাসনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন চৈতন্য। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ ভারতের সব বিখ্যাত মন্দির তিনি দর্শন করেছিলেন। সর্বত্র মানুষকে শিখিয়েছিলেন হরিনাম নিতে।'[৭]

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে; সেটা আলোর ধর্ম। এই ব্যাপ্তিই স্বাভাবিক। তাই শ্রীচৈতন্য অনায়াসে ত্রিপুরা, মণিপুর, উড়িষ্যায় ক্রমাগত পৌঁছে-গেছেন। পূর্ব থেকে দক্ষিণ ভারত এমনকি পশ্চিমেও। উত্তরের বৃন্দাবন—মথুরায় তাঁর পদস্পর্শ আজও অমলিন। আজ আমরা জাতীয় সংহতির সূত্রগুলি খুঁজে নিতে চাই যেভাবে, বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করতে চাই যেভাবে তাতে শ্রীচৈতন্য আমাদের সামনে এক উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত। স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে বেশ স্পষ্ট এবং যথার্থ—'শ্রীচৈতন্যের প্রভাব রয়েছে ভারত জুড়ে। যেখানেই আছে ভক্তিমার্গ, সেখানেই তাঁর অর্চনা, চর্চা ও উপলব্ধি।…বঙ্গদেশে তাঁর তথাকথিত শিষ্যদের অধিকাংশই জানেন না, সারা ভারত জুড়ে তাঁর প্রভাব আজও কিভাবে কাজ করে চলেছে।'[৮] ইতিহাসবেত্তা যদুনাথ সরকারও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন—'বাংলা ত্রিহুত উড়িষ্যা ও আসামে শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু জনসমষ্টির অধিকাংশের হৃদয় জয় করেছিল। শ্রীচৈতন্যের ঐ সকল অঞ্চলের অনেক স্থানে বহু প্রচলিত তান্ত্রিক উপাসনার অমার্জিত পুরুষোচিত বর্বরতা ও সর্বপ্রাণবাদকে পোষ মানিয়ে সর্বাংশে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল; তাতে ছিল প্রাণের উল্লাস। সপ্তদশ শতক এই নব বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগ—এই সময়ে সাগ্রহে শ্রীভগবানের ব্যক্তিপূজা, শিশু ও দুর্বলদের প্রতি দরদী ব্যবহার, সাহিত্যচর্চার ব্যাপক প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়াও দরিদ্রতম ব্যক্তির দিন-চর্চার মধ্যেও সংগীত, নৃত্য ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই নবযুগধর্ম সামাজিক বিভেদ দূর করে সর্বত্র গড়ে তুলেছিল ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।'[৯] সুভাষচন্দ্র মহারাষ্ট্রের পুণায় অনুষ্ঠিত (১৯২৮) মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণদিতে গিয়ে বলেছিলেন—'লোকপরম্পারায় শোনা যায় বাংলার শ্রীচৈতন্য মহারাষ্ট্রে এসেছিলেন এবং এখানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। সন্ত তুকারাম শ্রীচৈতন্যের কাছে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।'[১০] নিকল ম্যাকনিকল মহারাষ্ট্রে চৈতন্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন এইভাবে—"চৈতন্য তাঁর সম্প্রদায়ে শূদ্র ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁকে নিয়ে

গান হয়েছিল—'তোরা দেখে যারে ভাই, হেতায় জাতের বালাই নাই।' মারাঠা সন্তরাও চৈতন্যের মত ছিলেন ব্রাহ্মণ—অচ্ছুৎ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর।'[১১] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে আলোর পথ রেখা দর্শন করে তার ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—'চৈতন্যদেব আসিয়া বাঙ্গালিকে আর 'ঘরো' ও 'কুনো' থাকিতে দিলেন না; তিনি যে নাম প্রচারের আহ্বান শুনাইলেন, তাহাতে সে আর নিজ কুটীরে বা গ্রামে নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না, তাহাকে বাহিরে আসিতে হইল; রাজনীতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাকে আর একবার বড় হইতে হইল, ভারতীয় হইতে হইল।'[১২] সুনীতিকুমারের মূল্যায়ন যে কতটা সঠিক তা শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন পরিক্রমার ঐতিহাসিক গুরুত্বে অনুভবভেদ্য হয়ে ওঠে। ব্রজধাম বৃন্দাবনে যেতে তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল বিহারের একটা বড় অংশ এবং বারাণসী ও প্রয়াগ। বিহারের অংশগুলি ছিল ব্যবসা প্রধান আর বারাণসী ও প্রয়াগ তীর্থভূমি। সর্বভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে এই পরিক্রমা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বৃন্দাবনে অবস্থান কালেও তিনি সর্বভারতীয় ঐতিহ্য, প্রাণস্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন। বৃন্দাবনের ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল সেকালে অপরিসীম। বৃন্দাবনের কাছেই আগ্রা—যেখানে তখন অবস্থান করছেন তামাম হিন্দুস্থানের রাজনীতিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রকেরা। পাঠান শক্তির পতন ও মোগল শক্তির উত্থানকালে বৃন্দাবনের সন্নিকটস্থ হিন্দু প্রধান রাজপুতনার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এসব শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টি এড়ায়নি। কৃষ্ণপ্রেমে, মাতোয়ারা হয়েও তিনি চিত্তে ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রসারিত করেছিলেন। তাই সেকালের দুজন মননশীল পণ্ডিতকে বৈষ্ণব আন্দোলনের সেনাপতি করে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। বৃন্দাবন থেকে চৈতন্যমতাদর্শ প্রবেশ করেছিল রাজস্থান ও গুজরাটে।

সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দের অভিমত দুটি বিবেকানন্দের মন্তব্যকেই স্মরণ করায়। সুরেন্দ্রনাথের কলমে উঠে এসেছে—'আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা জানিনা, কিন্তু অতীত আমাদের কাছে একটা খোলা বই-এর মতো। এবং অতীত আমাদের বলছে, সনাতন ধর্মের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে রঘুনন্দন যখন হিন্দু আইন ও স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করছিলেন, তাঁর প্রায় সমকালেই, আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি মানুষে-মানুষে, পুরুষে—নারীতে ভেদ তুলে দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল—মুসলমানকে দেখেছিলেন সমচক্ষে এবং নারীসমাজকে মুক্তি দিয়েছিলেন বাধ্যতামূলক বৈধব্য থেকে।'[১৩] শুধু অতীত নয় শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চৈতন্যচর্চার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন এইভাবে—'বাংলার বৌদ্ধিক বিকাশের উত্তুঙ্গ চূড়ায় চৈতন্য এক নিটোল সুন্দর বিকচ কুসুম।…বাংলার আত্মা স্বরূপের নবজাগরণকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে প্রথমেই যাহা প্রয়োজন, তাহা হইল এই নব আন্দোলনের ভাবাদর্শ ও উদ্দীপনাকে ধরিয়া রাখা। সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণের ভাব—চৈতন্যের যেরূপ ছিল হরির প্রতি—দেশমাতার জন্য উহাই আজ বাঙালীর একান্ত প্রয়োজন।'[১৪]

শ্রীচৈতন্য তারুণ্যের ধর্মকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর জীবনের সংলগ্ন ঘটনাগুলি সে কথাই বলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। তাঁর তারুণ্যদীপ্ত স্বরূপটি সম্পর্কে রবীন্দ্র অভিমত আজও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যায়—'সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।'[১৫]

তারুণ্যের উদ্দীপ্তিতে শ্রীচৈতন্য ভেঙে ছিলেন সংস্কারের অচলায়তন, ধর্মের ভণ্ডামী সব মানুষের জন্য খুলে দিয়েছিলেন আত্ম অনুভবের পথ—সেই আলোকিত পথ বেয়েই অন্তরদেবতার আগমন। রবীন্দ্রনাথ সেই উদ্দীপ্তি লক্ষ্য করেই বলেছেন—'চৈতন্য সে ভাবনাকে তাঁহার রাজ-

সিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল—এমন কি প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া, যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ, সে-ও গৌরব লাভ করিল, যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে, সেও সম্মান পাইল, যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল প্রেমের অধিকারে ; সৌন্দর্যের অধিকারে ভগবানের অধিকারে কাহারাও কোন বাধা রহিল না।'[১১]

মানবজীবনে, সমাজজীবনে, ধর্মজীবনে সব বাধা সরিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীচেতন্য। এই অপসারণ, বাধামুক্তি কেবল বাংলাদেশের মানুষজনের জন্য নয় তা ভারত এবং সারাবিশ্বের মানুষের জন্যই। একটা জীবন একটা সংকল্পের বাস্তবায়ন। সেই জীবনের নির্মাণটি মোটেও সহজ নয় ; বেশ কঠোর। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নির্মাণের ছবি মেলে ধরেছেন—'প্রেমোন্মাদ কি রকম ? সে অবস্থা হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নেই। বাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন—ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা নেই, শরীর বলে বোধই নেই।'[১২] না থাকাটিই স্বাভাবিক কেননা অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো যিনি বহন করে নিয়ে যাবেন অনেকটা পথ তাঁর আসনখানি যে ভুবনজোড়া। আজ সাগরপাড়ের শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়—সব মানুষ আসছেন। নামগানে, আলোচনায়, গ্রন্থ রচনায় মেতে উঠছেন—'ইসকন' নামে আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। এসবই তাঁর ভুবনজোড়া আসনেরই উজ্জ্বল ফলশ্রুতি।

২

সাড়ে তিনশো বছরের ব্যবধানে সমাসন্ন অন্ধকার ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি জমাট। বণিককুলের শাসন শোষণের পাশে ধর্মান্তরণ ও প্রবাহিত সুপ্রাচীন ভারত ঐতিহ্যকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলার সুচতুর প্রয়াস ছিল অব্যাহত। রক্ষণশীল মানুষজন ধর্মের ভণ্ডামীতে ছেয়ে ফেলেছিলেন চেতনার আকাশ। নব্য শিক্ষিত মানুষজন পাশ্চাত্য ধর্ম-সংস্কৃতির টানে আত্মগত সংকটের মধ্যে পড়েছিল। শেষোক্ত সংকট ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ—'পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত, ডিরোজিও-র ব্যক্তিত্বে অভিভূত এবং আচার—আচরণে প্রচলিত সংস্কার বিরোধী। যে কারণে মুসলমান খানসামার রান্না ছিল তাঁদের প্রিয়, বিস্কুট' বিফস্টিক, ফাউলকারির তাঁরা ছিলেন ভক্ত, মদ খেতেন প্রকাশ্যে, প্রণাম বা কোলাকুলি না করে করতেন করমর্দন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রতি তাঁরা বিতৃষ্ণ (বাড়ী বাড়ী গো মাংস ছুঁড়ে মারতেন) আর দেবদেবীতে বিশ্বাসহারা।'[১৮] তাদের মদ্যাসক্তি, মিথ্যাচারণ, নারী-আসক্তি, সভ্যতার নামে সভ্যতা বিনাশী নগ্ন রূপটি তুলে ধরেছিলেন স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নব্য প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ এই সংকট থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে নিতে পারেনি। নিজেদের মধ্যেও ছিল সংঘাত ; সর্বোপরি তা সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় মানুষজনের মধ্যে। ধর্মান্তর ও ঐতিহ্য বিনষ্টির যে তীব্র প্রয়াস চলছিল তারই মধ্যে সংস্কারপন্থী আচারনিষ্ঠ হিন্দুদের স্বরূপটি ছিল এইরকম—'সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁঢ় আছে,…এঁদের মধ্যে কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে প্রাতঃস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ী ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে করতে পারে শ্রীযুত গঙ্গা স্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়ীতে প্রিয়তমাকেও আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদায় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন।'[১৯] কামিনী আর কাঞ্চনের প্রতি দুরন্ত লোভ তখন বেঁকে বসছে আর একদিকে ধর্মান্তরণ ঐতিহ্য বিনষ্টি আত্মগত সংকট--তারপাশে ধর্মীয় নৈরাজ্য গীতোক্ত 'সম্ভাবামি যুগে যুগের' অনুকূল। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো বহন করার দায়িত্ব বহন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি তিনি। তাঁর আবির্ভাব, যুগান্তকারী ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি চমৎকার—'পরমহংসদেবকে আমি শ্রদ্ধা করি কারণ তিনি ধর্মীয় নৈরাজ্যের শংককালে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সত্যতা নিজ উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ করেছেন, কারণ তাঁর মহান সত্তা

আপাতবিরোধী সাধনসমূহকে নিজ সত্তার অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর চিত্তের কারুণ্য চিরদিনের জন্য ম্লান, করেছে পুরোহিত ও পণ্ডিতদের আড়ম্বর, বিদ্যাভিমানকে।'[20] রোমা রোঁলা তাঁর ফরাসী অনুভবের বাইরে এসে বুঝতে পেরেছিলেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন দু হাজার বছরের ভারতীয় সাধনার ঘনীভূত রূপ।'[21]

শ্রীরামকৃষ্ণ পরধর্ম সহিষ্ণুতা নয় তা গ্রহণ এবং সব ধর্ম পথ একই পথে এগিয়ে গেছে তা সোচ্চারে জানিয়ে গেছেন। এজন্য তিনি ডুব দিয়েছিলেন সব ধর্মের গভীরে, পেঁৗছেছিলেন মর্মমূলে। তাই সেই প্রগাঢ় অনুভবের উচ্চারণ আমরা শুনতে পেয়েছি—'যত মত তত পথ।' অল রোডস্ লীডস টু রোম। 'সেই পথে পথে তিনি বাহির হয়েছিলেন'। রোমা রোঁলার মন্তব্য সেই 'বাহির', সেই সাধনার সম্মেলনের দিকে। রবীন্দ্রনাথ এই দিকে দৃষ্টি দিয়েই তাঁর প্রণতি পেঁৗছে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে—'বহু সাধকের / বহু সাধনার ধারা / ধেয়ানে তোমার / মিলিত হয়েছে তারা। / তোমার জীবনে / অসীমের লীলাপথে / নূতন তীর্থ / রূপ নিল জগতে ; / দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি / সেথায় আমার / প্রণতি দিলাম আনি।'[22] শুধু রবীন্দ্র অনুভব নয়, ব্রাহ্ম নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুভবও মিলে যায় এইভাবে—'রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক ; রূপে ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।'[23]

প্রকৃত ধর্মতো আমাদের উদার হতে শেখায়, আত্মায় আত্মা যোগ করতে শেখায়, সমগ্র শক্তি দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলতে শেখায় ; নিজের সুন্দর, ভালো, যথার্থ হয়ে ওঠাও এই সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয়ে আছে। এই উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতার হাত ধরলে কখনোই বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধ সংগঠিত হবে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে আর্ণল্ড টয়েনবী তাই বলেছিলেন, বর্তমান পৃথিবীতে বিধ্বংসী আনবিক যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী।[24] এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন—'তিনি ঈশ্বরকে মুখোমুখি দর্শন করেছেন। তাঁর জীবনের মূলে ছিল সত্য ও অহিংসা।'[25] খুব খাঁটি কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যকে ছুঁয়ে ছেনে নিজের সঙ্গে লেপটে দিয়েছিলেন। সত্যানুসরণের জন্যে তাই ঐ আকর্ষণীয় আহ্বান শোনা গেছে বারেবারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যক্তি সংকট থেকে রাষ্ট্রীয় সংকট সমাধানের অমোঘ সূত্র আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। তাঁর সেই অমৃত কথা গ্রন্থিত হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ। সেই কথামৃত পড়ে পাকিস্থানের বুদ্ধিজীবী মহম্মদ দাউদ রহবর সুন্দর করে জানিয়েছেন—'রামকৃষ্ণ বাণী মনমুগ্ধকর, আমাকে তা অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে।'[26] মহম্মদ দাউদের অভিমতের মূলে আছে সেই সর্বধর্মের সত্যতাকে গ্রহণ। জওহরলাল নেহেরু ভারত ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'আত্মানুভূতির মধ্য দিয়ে অন্যান্য ধর্মের মূল সত্যটি গ্রহণ করতে চেয়েছেন বলেই ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের সাধনা করেছিলেন। তিনি সকল সংকীর্ণতা, সকল ধর্মের বিরুদ্ধে সর্বধর্মের সত্যতাকে প্রকাশ করে সমন্বয়ের যথার্থ পথ দেখিয়ে গেছেন।'[27] তাইতো জার্মান পণ্ডিত ম্যাকসমূলার তাঁকে চিহ্নিত করেছেন, 'প্রকৃত মহাত্মা'[28] রূপে। ভারতবর্ষের শাশ্বত ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, হিন্দু ধর্মকে শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্যোগের ঘনঘটার মধ্যে রক্ষা করেছিলেন—একথা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণকে বলতে হয়েছে।[29] শুধু ঐতিহ্য রক্ষা নয় ভবিষ্যত ভারতবর্ষের ছবিটিও তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। তাঁর জীবনাচরণে, তাঁর নির্দেশে ভবিষ্যত ভারতবর্ষের স্থিতিশীলতা ও পল্লবিত প্রসারের কথা আছে। শ্রীঅরবিন্দ সেই কথা বলেছেন জোরের সঙ্গে, 'যাঁহার পদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছিল যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টি স্বরূপ ; তিনি ভবিষ্যত ভারত

দেখেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি না'[৩০] তার জীবন, তাঁর বাণী, তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের প্রতীতি দৃঢ় হয় তিনি অবতার। যুগাবতার। তিনি সকলকে পথ দেখাবার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। সয়েছেন অশেষ কষ্ট। তবুও ক্ষান্ত হন নি। পিছিয়ে পড়েন নি। মানুষের জীবনে শতফুল বিকশিত হোক—সেই লক্ষ্যে এগিয়েছেন রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও। তাই ক্রুশে আর ক্যানসারে কোন ভেদ নেই।

ভেদ নেই বলেই সব মানুষের উপর তার অগাধ আস্থা, সবাইকে তিনি পেঁছে দিতে চান সুস্থিত জীবনে, পরম প্রাপ্তিতে। যে প্রাপ্তির মূলে মানুষ খুঁজে পায় তার অস্তিত্বের উৎস, আবার সেই উৎস থেকে নির্মাণ। উৎস থেকে নির্মাণের পথে জল-ছাপ চিহ্নিত হয়ে যায় এক, দুই, তিন—অগণিত মানুষের। তাই তিনি ছুটে বেড়ান যে যেখানে আছে। সেই পথের হদিস দিতে অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, জীবনের প্রথম পর্বে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপ সহ্য করেছেন যিনি তীব্রভাবে সেই অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর জীবন পাল্টে গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে। আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন তিনি সেই কথা—আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৺পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়েছিলেন। …তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, 'মা তোমার চৈতন্য হউক।' তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্ত্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি।'[৩১]

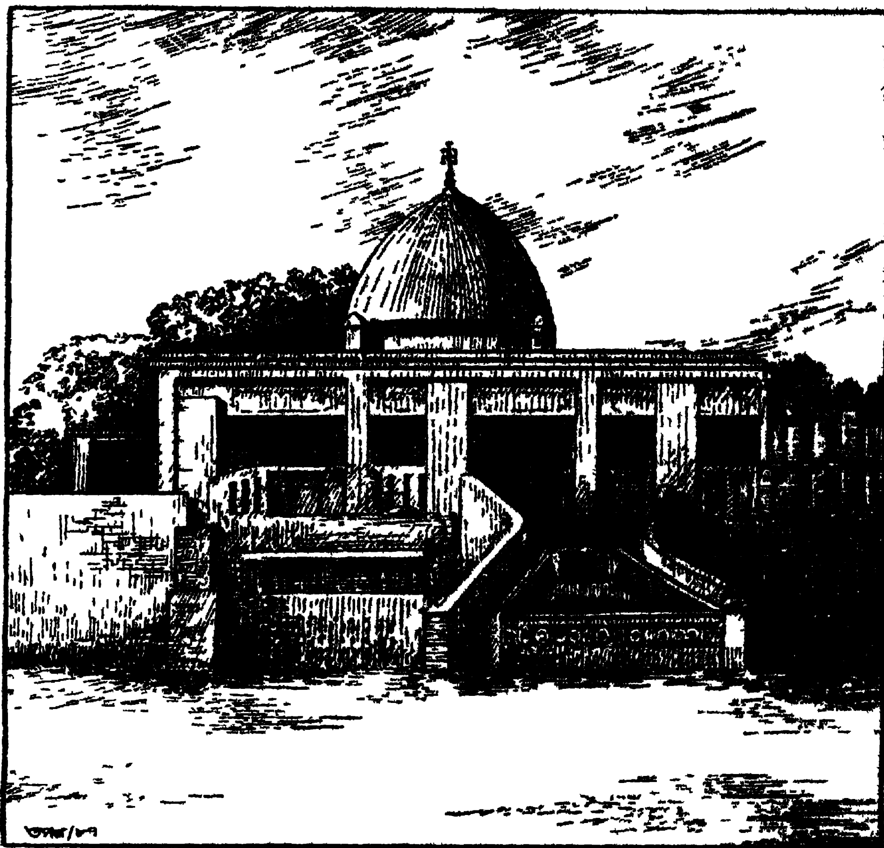
সাধারণ মানুষের যিনি তাঁর করুণাময় দৃষ্টি সাধারণ মানুষের উপর সম্প্রসারিত হবে—এটাই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতার স্পর্শ রুশবাসী প্রাচ্য বিশারদ ড. বোম্টিলাভ রিভাকভ পেয়েছেন—'আমি ও'কে (শ্রীরামকৃষ্ণ) একটু আলাদা করে দেখি। সবার উপরে রামকৃষ্ণ ছিলেন কবি। …আকাশে মেঘ দেখলে তাঁর ভাবোদয় হচ্ছে। প্রকৃতির সৌভাগ্য তিনি আত্মহারা হচ্ছেন তার ভাব সমাধি আমি বুঝতে পারি না কিন্তু এটা বুঝি তিনি সাধারণ মানুষের। তিনি সাধারণ মানুষ হয়ে এসেছেন।'[৩২] মার্কিন জ্যোতির্বিদ হালো সেপলের অনুভব। এ প্রসঙ্গে আরো ঘন—'জগৎ পরিকল্পনায় মানুষের নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কীয় সমস্যাগুলি সমাধানে যাঁরা কাজ করেন এবং চিন্তা করেন—রামকৃষ্ণের হৃদয় মন তাঁদেরই ঠিক পরিবেষ্টন করে থাকে।'[৩৩] বৃটিশ বুদ্ধিজীবী উইলিয়ম ডিগবি এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যঘন রূপটি যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল—'আমরা যাকে পাণ্ডিত্য বলি তাঁর কিছু না থাকলেও রামকৃষ্ণ যেসব কথা বলে গেছেন, সেসব কথা তাঁর যুগে আর কেউ বলেন নি। তিনি অবসাদগ্রস্ত মানুষের কাছে সুন্দরকে প্রকাশ করেছেন।'[৩৪]

সহজতা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ভূষণ। জীবনে আচরণে, চলায়-বলায়, ভাষায় উপমায় সর্বত্র সেই সহজতা, সারল্য। সৈয়দ মুজতবা আলী কথামৃত পড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন—তার কোন জুড়ি নেই। জার্মান পণ্ডিত ড. যোহানেক ওয়ালটাস যে কথাগুলো বলেছিলেন তা মুজতবা আলীরই অনুসরণ—'জীবন বাহিত পথের হদিশ দেওয়ার সময় কিন্তু তিনি প্রচলিত প্রথা বা রীতি মেনে চলতেন না। আনন্দ উজ্জ্বল কথোপকথনের মাঝে গভীর তত্ত্বকথা অপরূপ সারল্যে নির্দেশ করতেন।'[৩৫]

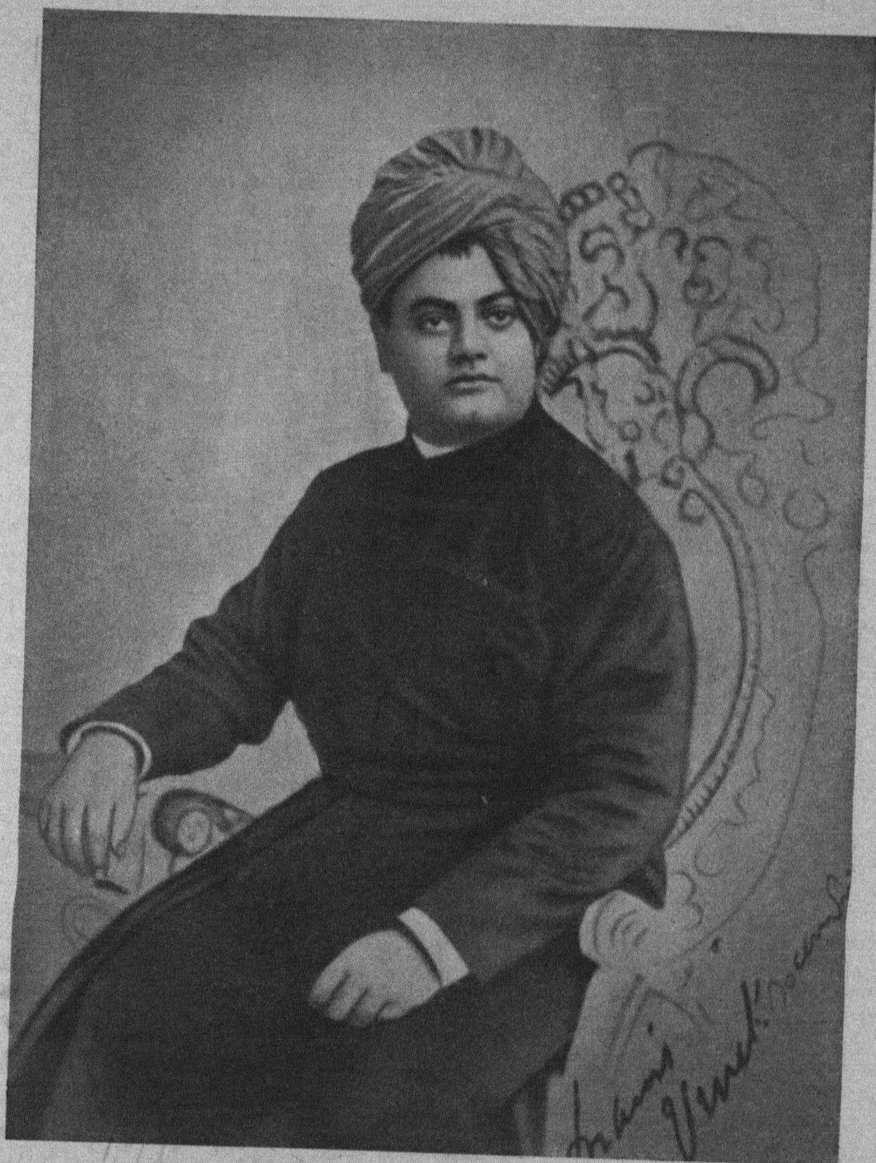
শ্রীরামকৃষ্ণ আপন লীলায়িত ছন্দে প্রসারিত হয়েছেন—প্রতি ঘরে, ঘরের বাইরের মন্দিরে, মাঠে, ঘাটে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বাসে, মোটরে। সর্বত্র তা'র ছবি প্রণাম পায়, নিত্য শুদ্ধির সৌরভ ছড়ায়। জাপানের বিদগ্ধ মানুষ ইয়াশিকো হিয়ামার সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে—'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কি ধনী, কি দরিদ্র, সবার ঘরে ঘরে আজ তাঁর ছবি, তাঁর নাম, তাঁর কথা।'[৩৬] আসলে এই পথেই পথ হেঁটে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে একদিন, এখন শুধু সেই দিনের প্রতীক্ষা।□

উৎস নির্দেশ ঃ

১. উদ্ধৃত হয়েছে, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ড. নীহাররঞ্জন রায়, গ্রন্থ থেকে। পৃঃ ৫১২ । ১৯৮০
২. নীলরতন সেন সম্পাদিত চর্যাগীতিকোষ (মূল পাণ্ডুলিপির ফটোসংস্করণ) ১৯৭৮, পৃঃ ১৩৩
৩. বাঙ্গালার ইতিহাস (আদিপর্ব), ড. নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৮০, পৃঃ ১৩৩
৪. ভারতের সূফী (১ম সংস্করণ), মোবারক করিম জওহর, পৃঃ ৩
৫. দি এনথোপলজিক্যাল নোট বুকস অফ কার্ল মার্কস, ১৯৭৪, পৃঃ ২৫০-৫১, ২৬০
৬. Bengal Vaishnavism—Bipin Chandra Pal, 1933, Chapter v.
৭. Folk song of south India—Charles E. gover, p-59
৮. Complete works of Swami Vivekananda vol IV, p-337
৯. History of Bengal, Jadunath Sarkap !932, p-12
১০. সুভাষ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, জয়শ্রী প্রকাশন, ১৯৭৮, পৃঃ ১৩৩-৩৪
১১. Psalms of Maratha Saints, 1919,—Nicol Macnicol Introduction.
১২. জাতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৫, পৃঃ ৯২-৯৩
১৩. A Nation in Making—Surendranath Bandlyopadhyay p-141
১৪. The Demand of the mother-Aurobinda ghosh, Bandemataram, April-11, 1908
১৫. বিদ্যাসাগর চরিত, ১৩০২ ১৬. সমূহ, পরিশিষ্ট, দেশহিত, ১৩১৫
১৭. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, উদ্বোধন সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩দশ খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ
১৮. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, ১৯৮৫, পৃঃ ৩২
১৯. হুতোম প্যাচার নকশা—কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃঃ ৯৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ
২০. The Religion of the world, Published by Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1938, p-124
২১. The life of Ramakrishna, 1979, p-11
২২. পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃঃ ৫৭
২৩. আত্মচরিত (প্রবাসী কার্যালয়) ১৩২৮, পৃঃ ২১৬
২৪. Sri Ramkrishna & his unique messege, 1970, London, Forward, p.-VII—IX.
২৫. Life of Sri Ramakrishna, 1977, Foreward, XI.
২৬. Clude Alan Stark, God of all, 1974, p-190-99
২৭. Discovery of India, Jaharlal Neheru, p-338
২৮. A Real Mahatman ; The Nineteenth Century, August, 1986.
২৯. The Cultural Heritage of India, 1960, p-2-4
৩০. ধর্ম, ১৩১৬, ১৮ সংখ্যা। ১ম বর্ষ। পৃঃ ৩
৩১. আমার কথা ও অন্যান্য রচনা। বিনোদিনী দাসী, সম্পাদনা—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য, ১৩৭৬, সুবর্ণরেখা।
৩২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬. ১. ৮৭
৩৩. Prabuddha Bharat, Vol-LXI—1, Jan 56, p-18
৩৪. Prosperous British India, 1901, p-99
৩৫. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ—১৯৮৭, উদ্বোধন, পৃঃ ৮৪৯ ৩৬. ঐ, পৃঃ ৮৪৩



□ প্রসঙ্গ : স্বামী বিবেকানন্দ



জগতে যখন এসেছিস তখন দাগ রেখে যা।

স্বামী বিবেকানন্দ



বর্তমান ভারতবর্ষের সংকট সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজনীয়তা

স্বামী আত্মস্থানন্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতবর্ষের আর্য-সংস্কৃতি এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। ইংরেজ-শাসনে বিদেশী সভ্যতার শিক্ষাপ্রভাবে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁর নিজ সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। নিজের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ভুলতে আরম্ভ করল, অপবাদ দিতে লাগল। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে শ্রেষ্ঠ—তারই চাকচিক্যের মোহে নিজেরা জড়িয়ে পড়ল। এই সময় ভারতীয় সভ্যতাকে এই পাশ্চাত্য মোহ থেকে রক্ষা করবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানান ধর্ম আন্দোলনের ঢেউ একটার পর একটা আসতে লাগল। কিন্তু পুরোপুরিভাবে কেউ সফলকাম হলেন না। আর ঠিক এই সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠভূমি কলকাতার কাছেই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়িতে মা ভবতারিণীর কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্বধর্মের সর্বসাধনায় সিদ্ধ হয়ে যে-ধর্ম আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধর্ম আন্দোলন ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, প্রতিহত হয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত। স্বামী বিবেকানন্দও এই সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়ে গেছেন। বর্তমান ভারতের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক।

বিবেকানন্দ তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা দ্বারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ভারতের অতীত গৌরবকে ভোলেননি। বরং ভারতবাসীরা এই মহিমময় সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে বলেই তাদের এত অধঃপতন, হীনমন্যতা। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ছিল—"সমগ্র মানব-জাতির অধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ড-স্বরূপ। ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসন-কালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।" তাই ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য ভূমিতে দীর্ঘ কয়েক বছর কাটানোর পরও স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণা ছিল পবিত্র। বৈদিক ঋষিদের অনুভূত সত্য, মহাপুরুষদের বাণী, সাধু-সন্তদের উপদেশ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করে স্বামীজী বলেছেন, ধর্মই হল ভারতের মেরুদণ্ড। সেই আবহমানকাল হতে ভারত ধর্মকে আশ্রয় করে বড় হয়েছে। বলেছেন তিনি, "এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়?—ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।" "ভারতে কিন্তু ধর্ম জাতীয়জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই

যেন জাতীয়জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনশক্তি—শত-শতাব্দী ধরিয়া যেদিকে উহার বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।…এই জগতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পথ বাছিয়া লয়, প্রত্যেক জাতিও সেইরূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্বে নিজেদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে।" "এইটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।" "জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্‌ধক্ করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান—এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয়ত হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার।" রাজনীতিও করতে হবে ধর্মের মাধ্যমে। রাজনীতি মানুষের জীবনে সর্বস্ব হতে পারে না, অঙ্গমাত্র। ধর্মই মানুষের যথার্থতা আনতে পারে। ধার্মিক মানুষ যদি রাজনীতি করে তবেই সেটি হবে সুষ্ঠু রাজনীতি। তখন রাজনীতি পঙ্কিল আবর্তে ডুবে যাবে না। তাই স্বামীজী বলেছেন, "তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকে জাতীয়জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।"

ধর্মের মধ্যে যে কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা সেইটি দূর করেছেন স্বামীজী। ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে ধর্মধ্বংসী, আত্মঘাতী ও মানবিকতার বিপরীত পশুভাব। মানুষের মধ্যে দেবত্ব রয়েছে, তার উন্মোচনকে ধর্ম বলেছেন স্বামীজী। মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, সে মানুষের দ্বারা কোনমতেই মারামারি, হানাহানি, দ্বেষাদ্বেষী, পরস্পরের বিরোধিতা সম্ভব নয়। তখনই একতা আসবে। বিভেদ কখনই আসবে না। দেবত্বে উন্নীত মানুষ যদি রাজনীতি করে, তাহলে সে দেশকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে, কল্যাণের দিকে নিয়ে যাবে। সেই হবে প্রকৃত নাগরিক। রাজনীতি মানুষকে কোনমতেই যথার্থতার পথে নিয়ে যাবে না।

স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন দিকে নানান উন্নতি হয়েছে। গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে, শহর রূপান্তরিত হয়েছে নগরে, স্থাপিত হয়েছে বিরাট বিরাট কল-কারখানা, শিল্পালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, যন্ত্রালয়; প্রভূত চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে বিজ্ঞানের, চিকিৎসার; সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের; বড় বড় পাঁচশালা পরিকল্পনা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি, একেবারে নজর দেওয়া হয়নি, কোন চিন্তা-ভাবনাও করা হয়নি। তাই ভারতবর্ষ সর্ববিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হলেও মানুষের নৈতিকতা, মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানুষের সদ্‌গুণ—এগুলির অভাব একান্তভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে আজকে চতুর্দিকে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, হানাহানি করছে পরস্পরের মধ্যে, অপরকে বঞ্চিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করতে একটুও চিন্তা করে না, ট্রামে-ট্রেনে-বাসে টিকিট কাটে না, ঘুষ ছাড়া কাজ চলে না ইত্যাদি। তাই আমরা নজর দিতে হবে মানুষ গড়ার দিকে।

বহু আগে স্বামীজী বারবার বলেছেন মানুষ গড়ার কথা। তাঁর বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে আমরা এই মানুষ গড়ার কথা পাই। তাই স্বামীজী বলেছেন, "মানুষ চাই, মানুষ চাই আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।" "এস, মানুষ হও।…নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে

ভালবাসো ? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো ? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না। সামনে এগিয়ে যাও।"

প্রকৃত মানুষ কখনও অপর মানুষকে খুন করতে পারে না। সে যদি দেখে যাকে খুন করছি, সে তার নিজেরই প্রতিরূপ, তাহলে সে কাকে খুন করবে ? "প্রত্যেক নরনারীকে—সকলকেই ঈশ্বর-দৃষ্টিতে দেখিতে থাকো।" "আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।"—বলেছেন স্বামীজী। তাই দেখি, স্বামীজীর সাধনা, তপস্যা, প্রব্রজ্যা—সবকিছুই মানুষকে নিয়েই হয়েছে।

মানুষ গড়তে হলে যথার্থ শিক্ষা চাই। প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার দ্বারাই মানুষ তৈরি করা সম্ভব। "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা।" "আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।…তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে। যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে। ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার।" —স্বামীজী বহু আগে আমাদের এ-কথা বলেছেন।

সেইসঙ্গে স্বামীজী নারী জাতির উন্নতি চেয়েছেন। নারী জাতির উন্নতি ছাড়া দেশ এগুতে পারবে না। বলেছেন তিনি, "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।" "অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।"

স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করেছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে বলে অনেকে মনে করেন। স্বামীজী আমাদের বারবার দেখিয়ে গেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ নেই। এ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। দুটির মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য আছে। স্বামীজী আলোচনা করে দেখিয়েছেন, "বিজ্ঞান ও আলোচনার বিষয়রূপে ধর্ম মানবমনের পক্ষে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর অনুশীলন। অনন্তের জন্য এই অন্বেষণ, অসীমকে ধরা-ছোঁয়ার জন্য এই সংগ্রাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়কে অতিক্রম করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে অভিব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টা, অনন্তের সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার এই প্রয়াস—এ-সবই হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকর, সর্বোচ্চ গৌরবময় প্রয়াস।"

ব্যবহারিক জীবন ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে স্বামীজী কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। আধ্যাত্মিক মানুষের প্রকাশ হয় ব্যবহারিকে। যে মানুষ আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছে তার দ্বারা কোন অকল্যাণকর কাজ হতে পারে না। সে সমাজে শুধুমাত্র কল্যাণকর কাজেই ব্যাপৃত হয়। সমাজের মধ্যে যত বেশি আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা হবে, ততই সমাজের মঙ্গল।

স্বামীজী অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি সর্বপ্রযত্নে অনুকরণ পরিহার করতে বলেছেন। সাবধান করে তিনি বলেছেন, "আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে।...অনুকরণ-হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন।"

স্বামীজী শুধুমাত্র ভারতের ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির। তিনি যেমন ভারতের কথা বলেছেন, তেমনি বলেছেন বিশ্বের কথা। তিনি কোন গোষ্ঠীতে, দেশের মধ্যে আবদ্ধ নন। তাই তাঁর মুখেই শুনতে পাই—"আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সংঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র।" One World. (এক বিশ্ব)।

সর্বশেষে বলি, ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় সংহতি, একতা সম্ভব। ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের বিরোধ মিটবে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের সমাপ্তি ঘটবে। স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে বলে গেছেন, "মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণকল্পে যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনটিই, যে শক্তির বিকাশকে আমরা ধর্ম বলি তার চেয়ে বেশি শক্তিমান নিশ্চয় নয়। এই অদ্ভুত শক্তিই সর্ববিধ সামাজিক সংহতির পটভূমি, পরস্পর মিলিত হয়ে থাকার জন্য যা কিছু প্রাণের বিকাশ মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, তারও উদ্ভব হয়েছে এই শক্তি হতেই।...মানুষের মনে প্রেরণা জাগাবার জন্য সবচেয়ে বেশি বেগসঞ্চারী শক্তি এটি। আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পরিমাণ শক্তি দিতে পারে, সে-পরিমাণ শক্তি আর কোন আদর্শই দিতে পারে না।" তবেই আমরা বলতে পারব—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" □

স্বামীজীর আহ্বান

স্বামী প্রভানন্দ

সুনীল চাঁদোয়ার নীচে বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গনে স্বামী বিবেকানন্দের সু-উচ্চ মন্দির। পাশে বয়ে চলেছে সুর-তরঙ্গিনী গঙ্গা। মন্দিরের চূড়ায় পত পত করে উড়ছে গৈরিক পতাকা। হাতছানি দিয়ে ডাকছে দেশের প্রাণ-চঞ্চল তরুণদের। দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান।

১৯৮৫ সাল, ১২ই জানুয়ারী। ভোরবেলা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এসেছিল। তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী স্বামীজীর মন্দিরের দীপ থেকে মশাল জেনুলে তরুণ দলটির হাতে তুলে দিলেন। মশাল হাতে ছুটে চলল তরুণ দল। চল্লিশ মাইল দৌড়ে গিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উৎসবের উদ্বোধন করবে। তাদের বিদায় দিয়ে তিরানব্বুই বছরের প্রবীণ সংঘাধ্যক্ষ আবেগমথিত স্বরে বলে উঠলেন, 'ছড়িয়ে দাও, ছড়িয়ে দাও স্বামীজীর আগুন, দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।'—উপস্থিত সকলের বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

আবার কয়েকমাস পরে গঙ্গার ধারে বেলুড় মঠে বসে গিয়েছিল সবুজের মেলা। সমবেত হয়েছিল সারা দেশের ন'হাজার তরুণ-তরুণী। তারা সাতদিন ধরে বিবেকানন্দকে অন্তরঙ্গভাবে জানতে বুঝতে চেষ্টা করেছে। বিবেকানন্দের প্রাণোচ্ছল চিরনতুন ভাবে তারা ভরপুর হয়ে উঠেছে। তাছাড়াও তারা আবিষ্কার করেছে যে বিবেকানন্দের চাইতে বেশী তাদের জন্য কেউ কখনও ভাবেন নি। তাদের মনে হয়েছে তাদের আন্তর্জাতিক যুব-বর্ষের উদ্‌যাপন সার্থক হয়েছে।

বিবেকানন্দ জাতির সংকট-মুহূর্তে জাতীয় চেতনাকে আহরণ করে বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন। এই শতকের প্রথম দুই দশকে তাঁর আহ্বান তরুণ-চিত্তকে আলোড়িত, মথিত করেছিল। এই আহ্বানে পুনরায় ভারতের আকাশ-বাতাস মন্দ্রিত। আশির দশকে সত্যানিষ্ঠ অনুসন্ধান সু-প্রমাণিত করেছে যে বিবেকানন্দই বর্তমান ভারতের যুবসমাজের সর্বাধিক উপযোগী এক মূর্ত আদর্শ। সে কারণে যুবসমাজ তাঁর জন্মদিন ১২ জানুয়ারী জাতীয় যুবদিবস রূপে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অন্যান্য 'দিবস'গুলির মত এই দিনটিকে তরুণেরা অনুষ্ঠান-সর্বস্ব করে তুলতে চায় না। তাদের সঙ্কল্প বিবেকানন্দ-ভাবধারায় নিত্য অবগাহন করে তারা শরীর মনকে পবিত্র স্নিগ্ধ করে তুলবে। সঙ্কল্প বিবেকানন্দ-ভাবধারা থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করে তারা তাদের চরিত্র-বৃক্ষকে সুদৃঢ় করবে, প্রাণে অদম্য শক্তি সংগ্রহ করবে, নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তিতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। তারা উপলব্ধি করেছে, এই বিবেকানন্দীয় আদর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেই তাদের ব্যক্তিজীবনে যোগ্য মূল্যবোধের আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, জীবন অবক্ষয়ের করাল গহ্বর থেকে মুক্ত হবে। এবং তখনই ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে তার প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে।

বিবেকানন্দীয় আদর্শকে বরণ করে নিতে হলে প্রয়োজন নিশ্ছিদ্র আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেকানন্দ-চর্চা। বিবেকানন্দের বাণী মানুষকে যেমন সম্মান দিয়েছে তেমনি শক্তি জুগিয়েছে; যেমন ভাবোন্মাদনা সৃষ্টি করেছে তেমনি উদ্ভাবনী প্রতিভার নিত্য-নতুন খোরাক জুগিয়েছে। ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রঁলার দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের বাণী একটি মহাসংগীত, তাঁর বাগ্‌বৈশিষ্ট্য বিঠোফেনের ভঙ্গিতে রচিত, তা প্রাণে ঝংকার তোলে হ্যাণ্ডেলের কোরাসের তালে কুচকাওয়াজের মতো। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'Freedom, freedom is the song of the soul'—এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্ত প্রায় করিয়া তোলে।' মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করেছেন যে, বিবেকানন্দের পাঠ গ্রহণ করে তাঁর দেশপ্রেম বেড়ে গিয়েছিল সহস্রগুণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন রোমাঁ রঁলাকে 'If you want to know India study Vivekananda।' ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর স্বীকৃতি, আমাদের যাবতীয় অভ্যুদয়ের জন্য আমরা বিবেকানন্দের কাছে ঋণী।' বিবেকানন্দের বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্ন উল্লেখ করে মানবেন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'This romantic vision of conquering the world by spiritual superiority electrified the youug intellectuals.' এভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন-ভূ-খণ্ডে বিভিন্ন কালে মনীষী মানষ-মুকুরে উদ্ভাসিত বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও বাণী সকল মানুষের মনে যে দোলা জাগায় তা গণ-মোহন যে কোন রাজনৈতিক নেতার প্রত্যাশার অতীত।

বিবেকানন্দ-চর্চা করতে গিয়ে তরুণরা শুনতে পায় স্বামীজীর প্রাণ-মাতানো দৃপ্ত আহ্বান—'আমার ভিতর যে আগুন জ্বলছে, তোমাদের ভিতর জ্বলে উঠুক সেই আগুন।' উপরন্তু তারা স্বামীজীর বাণী ও রচনার মধ্যে দেখতে পায় চির-নতুনত্ব, যেমন দেখতে পেয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। তিনি লিখেছেন, 'If you read Swami Vivekananda's writings and speeches, the curious thing you will find is that they are not old.' সেগুলি শুধুমাত্র নতুন নয়, সেগুলি সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার সম্মোহনী শক্তি অতীত মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে; এখনও তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব অনুভবসিদ্ধ। বিবেকানন্দ প্রভাবের মলয় হাওয়া বইছে; প্রত্যয়ের পাল তুলে ধরতে পারলেই জীবন-নৌকা সেই হাওয়ার উপর নির্ভর করে তর তর করে এগিয়ে যাবে। চারিদিকে লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে সেই প্রভাব শিশির-বিন্দুর গোলাপফুল ফোটাবার মতো কত ব্যক্তিকে রসসিক্ত করছে, সমষ্টির উদ্যমকে বিকশিত করতে সাহায্য করছে। যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সমকণ্ঠে স্বীকার করবেন, 'বিবেকানন্দের প্রভাব এখনো বিপুলভাবে কাজ করে চলেছে,—আমরা দেখতে পাই—ঠিক জানি না কিরূপে, বলতে পারি না কোথায়, এমন কিছুতে যা এখনো স্পষ্ট নয়; এমনকি যা সিংহপ্রতিম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে।' প্রকৃত পক্ষে বিবেকানন্দীয় আদর্শবাদ সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে ভারতবাসীর ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্পচর্চা, জাতীয়তাবোধ, সমাজ-সংগঠন, সব কিছুর উপরেই। এই প্রভাবের বাতাবরণে প্রবেশ লাভ করবার জন্য বৈজ্ঞানিক মানসিকতা দিয়ে দশ খণ্ডের বাণী ও রচনার পাঠ ও অনুধ্যান করতে হবে, যে মহত্তর জীবনবোধে তিনি দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তার স্বরূপটির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হবে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তত্ত্বের প্রয়োগ করে ফলাফল বিচার করতে হবে। এসকলের জন্য প্রয়োজন নিবিষ্টচিত্তে বিবেকানন্দ-চর্চা।

নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার অধ্যয়ন করা যেতে পারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। সুখ-পাঠ্য সরস বিবেকানন্দ রচনাবলী অপর দশটি সাহিত্য গ্রন্থ পাঠের মত পাঠ করে রসগ্রহণ করা যেতে পারে। কেউ কেউ স্বামীজীর রচনা অনুপ্রেরণার সঞ্জীবনী-সুধারূপে গ্রহণ করে থাকেন। আবার কেউ তাঁর তীক্ষ্ম ধী-শক্তি, দক্ষ বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও যুক্তিসম্পন্ন চিন্তার আলোকে বিবেকানন্দ

রচনাবলী পাঠ করে থাকেন, ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিবেকানন্দ চিন্তা-মঞ্জুষার দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। যিনি যে উদ্দেশ্য নিয়েই পাঠ করুন তিনি বিবেকানন্দ রচনাবলীর সামগ্রিক রূপটি অবধারণার জন্য ভগিনী নিবেদিতার মূল্যবান মন্তব্যটি অবশ্য স্মরণ করে থাকেন। নিবেদিতার মতে, 'শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি—যেন তিনটি সুর, এই গুলিই মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান সংগীত।' এই মহান সংগীতটি শুনতে পাওয়া ও রসাস্বাদন করা হবে বাণী ও রচনা পাঠের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে বিবেকানন্দ-বাণীর বীর্যবত্তা, তীব্র আকর্ষণী শক্তি ও সর্বাবগাহিত্ব। তাঁর বাণী পাঠ করে রোমা র‍্যঁলা অনুভব করেছেন বিদ্যুৎ-স্পর্শের শিহরণ। শরীর-মন চাঙ্গা রাখবার জন্যে প্রতিদিন বিবেকানন্দ টনিক সেবনের উপদেশ দিয়েছেন অধ্যাপক বিনয় সরকার। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর নিকট-বন্ধু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের স্বীকৃতিও খুব মূল্যবান। তিনি লিখেছেন, 'স্বামীজী, আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্প-গাছা করিয়াছি, তখন জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে, তোমায় হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয় পর্বত ভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছি।··· এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি—অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক, দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণ-মনকে ভরপুর করিয়া ফেলে।'—সুধিবৃন্দের এ ধারণার কারণ আলোচ্য বাণী ও রচনার মধ্যে রয়েছে স্বামীজীর সত্তার আভাস ও শক্তি, ভাষার ঋজুতা ও ভাবের গভীরতা, নির্মোহ যুক্তিবিচার ও বিশুদ্ধ উপলব্ধি। তাঁর বাণীর অনেকাংশই বর্তমানে quotable quotes—প্রবাদ প্রবচন তুল্য, আপ্তবাক্যের মর্যাদা সম্পন্ন। তাছাড়াও স্বামীজীর চিন্তা তরঙ্গিনীর গভীর অনুধ্যান করলে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় স্বামীজীর নিজস্ব প্রতিশ্রুতি, অনুভব করা যায় যে তাঁর বাণীতে রয়েছে তাঁর জীবন্তশক্তি, যে শক্তি সমগ্র সংসারের অভেদ জ্ঞান প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকবে।

দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হলে প্রয়োজন তাঁর বাণী ও রচনার নির্যাস যা তাঁর জীবনদর্শন তার রূপরেখাটির অবধারণ। জীবনদর্শন সেই বৃক্ষরস যা জীবন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-পল্লব-অংকুর সর্বকিছুতে প্রাণসুধা সঞ্চার করে থাকে। ব্যক্তি জীবন দর্শনও ভাবৈশ্বর্যের বৈশিষ্ট্যের নির্নায়ক। জীবনদর্শনই ব্যক্তির ভাব-সম্পদের উৎস ও পরিপোষক। ব্যক্তির জীবনদর্শনই অনুসৃত হয়ে থাকে তার যাবতীয় চিন্তাভাবনা ও আচরণের মধ্যে। সুতরাং সম্যকভাবে বিবেকানন্দ চর্চার জন্য একান্তভাবে দরকার স্বামীজীর জীবনদর্শনের স্বরূপের পরিচয়।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন বিবেকানন্দ-রচনাবলীর বিষয়ানুগ আলোচনা ও সমস্যাভিত্তিক আলোচনা। বাণী রচনার কিছু অংশে রয়েছে স্বামীজীর নিজস্ব রচনা, কিছু অংশে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষায় লেখা চিঠি, কিছু অংশে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী ও তাঁর সম্বন্ধে মূল্যবান স্মৃতিকথা, তাছাড়া আনেকখানি জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন স্থানে নানান বিষয়ে স্বামীজী প্রদত্ত বক্তৃতা। যদিও এ সকলের অধিকাংশেরই পটভূমিকা ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক তবুও এ সকল রচনার অধিকাংশই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক! এ সকল রচনার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দুর্লভ ভাবসম্পদ, রয়েছে স্বামীজীর কিছু মৌল চিন্তা। এ সকল ছড়ানো-ছিটানো ভাব-সম্পদকে বিষয়ানুগ করে বা topic-wise পাঠ ও আলোচনা করা দরকার। তাছাড়াও সাম্প্রতিক-কালের জাতপাত, জাতীয়-সংহতি, জাতীয়তাভিত্তিক শিক্ষা, নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অধিকার ভোগের তারতম্য ইত্যাদি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে কিরূপে সম্ভব তা আলোচনা করা দরকার। এ ধরণের পাঠ ও আলোচনার ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে

বিবেকানন্দের বিপুল চিন্তারাশি থেকে সব পক্ষই নিজ নিজ সমর্থনযোগ্য বহু উদ্ধৃতির আশ্রয় নিতে পারে। বলাবাহুল্য, উদ্ধৃতিগুলি রচনার যে অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেটি বিবেচনা না করলে ভুল করা হবে।

চতুর্থত, যদিও বিবেকানন্দ ভারতের বঞ্চিত-অবহেলিতদের সঙ্গে অস্থি-মজ্জার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তিনি তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে জাতির পুনর্গঠনের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোন মডেল দিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু প্রশ্ন, স্বামীজীর মূল্যবান চিন্তাভাণ্ডার থেকে চিন্তাসূত্র অনুসন্ধান করে করে 'বিবেকানন্দ মডেল' গড়ে তোলা সম্ভব কি? যদি সম্ভব হয়, তবে তার রূপরেখাটি কি হবে? তার বৈশিষ্ট্য বা কি হবে। আর সে মডেল রূপায়ণে বাধাই বা কোথায়? স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, আমাদের দেশে যে পাহাড় প্রমাণ সমস্যা রয়েছে তার সুষ্ঠু সমাধান করতে এই মডেল কতদূর সমর্থ? এবিষয়ে নিশ্চিন্ত কোন সিদ্ধান্ত করতে হলে শুধুমাত্র বাণী ও রচনার সঙ্গে পরিচিতই যথেষ্ঠ নয়; স্বামীজীর সকল চিন্তা-ভাবনাকে অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিকায় বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ভাবনা পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে ফলাফল যাচাই করে দেখতে হবে। বেশ কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে জাতির পুনর্গঠনের জন্য 'বিবেকানন্দ মডেলের' রূপরেখা অঙ্কন অসাধ্য কিছু নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক সামাজিক ভাবনা নিয়ে নানা বেসরকারী সংস্থা যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করা দরকার। সেই সঙ্গে দরকার এ দেশের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য মডেলগুলির সঙ্গে 'বিবেকানন্দ মডেলের' তুলনামূলক আলোচনা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'বিবেকানন্দ মডেলের' পিছনে প্রকল্পিত তত্ত্বটির বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত সংস্কার পরিকল্পনাগুলির পরিবর্তে আমূল সংস্কারের উপর স্বামীজী জোর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতাদর্শ অনুসারে যাবতীয় উন্নয়নের মূল প্রাথমিক প্রয়োজন মানবিক সম্পদের উৎকর্ষ সাধন। তৃতীয়ত, আইন-কানুন-বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে সমাজের স্থায়ী উন্নয়ন বা কল্যাণ সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি-মানুষের উৎকর্ষ। নির্ভর করছে ব্যক্তির উৎকর্ষের উপর। চতুর্থত, জনসাধারণের উৎকর্ষ-সাধনের প্রধান হাতিয়ার শিক্ষা। স্বামীজী বলেন, গণ শিক্ষার বিস্তারের দ্বারা চেতনা সৃষ্টি (conscientisation) করতে হবে; জনগণের লুপ্ত আত্মচেতনার পুনরুদ্বোধন করতে হবে, তাদের সংগঠিত করতে হবে। এই চারটি নীতির ভিত্তিতে 'বিবেকানন্দ মডেলটিকে' বাস্তবে রূপায়ণ করতে হবে।

এই ধরণের সশ্রদ্ধ বিবেকানন্দ-চর্চার মাধ্যমেই স্বামীজীর আহ্বানের তাৎপর্য বোঝা যাবে, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভবপর হবে। এইভাবে গভীরভাবে বিবেকানন্দ-চর্চা করতে পারলেই আমরা সার্থকভাবে ধারণা করতে পারব রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: 'বিবেকানন্দের বাণী মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।' তাছাড়া স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারলেই শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়ন সম্ভবপর হবে। নদীবেগের মতো সমাজের কল্যাণী স্রোতও বাধাহীন পথে আপনা থেকে চলতে চেষ্টা করে। বিবেকানন্দ মতাদর্শের উৎকর্ষই তাকে সমাজের মধ্যে সহজেই গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। □

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আমেরিকা থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট স্বামীজী এক চিঠিতে লিখেছেন—

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই। ভরসা তোমাদের উপর, পদমর্যাদাহীন দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর এই ভাব লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি। তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি এই দেশে শীতে বা অনাহারে মরিতে পারি, কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট গরীব অজ্ঞ অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টাদায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।"

আমেরিকা থেকে এই চিঠি যখন লেখেন তখন তিনি অপরিচিত হিন্দু সন্ন্যাসী মাত্র, ধর্ম-মহাসভায় তাঁর সুবিখ্যাত ভাষণের জন্য দাঁড়াননি, এবং সত্যই নিঃশেষিত-পুঁজি যুবকটি তখন অনাহার ও শীতে মৃত্যুসম্ভাবনার মুখে।

কয়েক বৎসর পরে বিবেকানন্দ যখন বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ—পাশ্চাত্য থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন—তখনকার একটি চিত্র রোমা রোঁলার রচনা থেকে তুলছি—

"তুরীয়ানন্দ অনুরূপ আর একটি বর্ণনা দেন। তাহা সম্ভবতঃ কলিকাতা বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে ঘটিয়াছিল। তুরীয়ানন্দ নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, তিনি বারান্দায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করিতেছেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করিলেন না।······মীরাবাঈ-এর একটি বিখ্যাত গান গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন। অশ্রুতে তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া গেল। থামিয়া আলিসার উপর ভর দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হইল। তিনি গাহিতে লাগিলেন। বারবার করিয়া বলিলেন ঃ

ওরে আমার দুঃখের কথা কেউ বোঝে না।

আবার বলিলেন, দুঃখ যে পেয়েছে সেই বোঝে দুঃখ কি?

একটি তীরের মত তাঁহার কণ্ঠস্বর আমাকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার দুঃখের কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না।······তারপর যেন চকিত বুঝিলাম। তাঁহার মধ্যে যে করুণা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেছিল, তাহারই রক্তধারা তাঁহার চোখের জল হইয়া প্রায়ই বিগলিত হইত। দুনিয়ার লোক তাহা জানিত না।"

অতঃপর তুরীয়ানন্দ তাঁহার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই যে রক্তধারা, অশ্রুধারা হইয়া বিগলিত হইয়াছিল তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে মনে করেন? দেশের জন্য পরিত্যক্ত তাঁহার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু, তাঁহার শক্তিমান হৃদয়ের প্রতিটি উদ্দীপ্ত, উচ্চারিত ধ্বনি অসংখ্য বীরের জন্মদান করিবে। এই বীরের দল তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম দিয়া পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিবেন। (ঋষি দাস অনূদিত)

আমার ভারতবর্ষ। আমার মাতৃভূমি! পতিত ও দুর্গত ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীর জন্য বিবেকানন্দের অসীম যন্ত্রণাচ্ছবি দর্শন করে তুরীয়ানন্দ বলেছেন—"বিবেকানন্দের মধ্যে অনুভবের যে দুর্নিবার শক্তি বর্তমান ছিল অন্ততঃপক্ষে তাহার একাংশও যিনি অনুভব করিতে না পারিবেন, তিনি কখনো কোনমতে বিবেকানন্দকে বুঝিতে পারিবেন না।"

পাশ্চাত্য থেকে স্বামীজী ভারতে ফিরেছেন, তাঁর ইংরাজ বন্ধু প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজী, বিলাসময়, শক্তিময়, গৌরবময় পাশ্চাত্যে চার বৎসর কাটিয়ে ফেরার পরে আপনার মাতৃভূমি কি রকম লাগবে?"

স্বামীজী উত্তরে বললেন, "যাবার আগে ভারতকে ভালবাসতাম। এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র—ভারত আমার পুণ্যভূমি—তীর্থভূমি।"

স্বামীজীর একান্ত অনুরাগিণী ও কর্মসহায়িকা মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্বামীজী, কিভাবে আমি সর্বোত্তম সাহায্য আপনাকে করতে পারি?'

'ভারতকে ভালবাসো'—স্বামীজীর উত্তর।

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ। মা, মা, মা, ভারতের কন্যাগণ তোমরা সকলে জপ করিবে—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, মা, মা, মা।'

সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ তার সমগ্র রূপ নিয়ে বিবেকানন্দের কাছে ধরা দিয়েছিল। সর্বাংশে তিনি ভারতকে বরণ করেছেন—অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত সেই দেশ। বিবেকানন্দের এই ভারত চেতনার আত্মা "ধর্ম"। হিন্দুধর্ম বলতে এখানে ভারতধর্ম বুঝতে হবে। ঐ ভারতধর্ম নিত্যধর্মেরই নামভেদ। ঐ ধর্মকে স্বামীজী বেদান্ত বলেছেন। স্বামীজীর মতে হিন্দুর কৃতিত্ব এই বেদান্ত ধর্মকে সে-ই প্রথম পূর্ণভাবে তত্ত্বরূপে আবিষ্কার করতে পেরেছে। তাই বলে এ ধর্ম তার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, এমন কি ভারতবর্ষের ভূগোলের আবদ্ধ থাকবে না ভবিষ্যতে। সার্বভৌমিক এই বেদান্তধর্মকে স্থান ও কালের উপরে নিখিল সত্যরূপে দর্শন করে তিনি বলেছিলেন,

"যে অনন্ত ঈশ্বরকে ইহা প্রচার করিবে তাহার মতই অনন্ত হইবে। সেই ধর্মের সূর্য তাহার কিরণ কৃষ্ণভক্ত, খ্রীষ্টভক্ত, সাধু অসাধু—সকলেরই উপর সমভাবে বিস্তার করিবে: সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে।··· উহাতে প্রত্যেকটি মানুষের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে উহার ঈশ্বর প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।"

এই সার্বভৌমিক ধর্ম যদিও কোন বিশিষ্ট স্থান বা কালের অধীন বস্তু নয়, তথাপি ঐতিহাসিকভাবে এ পর্যন্ত ভারতবর্ষেই এ ধর্মচেতনা সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে।

"আর কী দেশ—এই ভারতবর্ষ যে কেউ এই পুণ্যভূমিতে এসে দাঁড়াবে—সে এই ভূমির সন্তান অথবা অন্যভূমির সন্তান, যাই হোক—সে অনুভব করবে পৃথিবীর সর্বোত্তম ও পবিত্রতম সন্তানদের ভাবনারাশির দ্বারা সে পরিবৃত হয়ে আছে, যাঁরা ইতিহাসের বিস্মৃত অতীত থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশু সত্তাকে ঈশ্বর সত্তায় উন্নীত করার কাজে ব্রতী হয়ে আছেন।··· এখানে শুধু এখানেই মানবহৃদয় সম্প্রসারিত হয়ে পশুপক্ষী তরুলতা, মহত্তম দেবগণ থেকে ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম থেকে নিম্নতম সত্তা অবধি, সবকিছুকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে—হয়ে উঠেছে

বিরাট অসীম অনন্ত। শুধু এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে অখণ্ড ঐক্যযুক্ত বলে ধারনা করেছে—ঐ বিশ্বের প্রতিটি স্পন্দনকে নিজের নাড়ীর স্পন্দন বলে অনুভব করেছে।…

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ভারত আত্মার সাক্ষাৎ এবং পরিব্রাজক অবস্থায় বছরের পর বছর ধরে পায়ে হেঁটে ভারতের অরণ্যে প্রান্তরে গ্রামে সহরে ঘুরে বেড়িয়ে সেই আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক দর্শন ঘটেছে স্বামীজীর। ঐ দর্শনের স্বাভাবিক ফল—ভারতের শোচনীয় দুর্গতির সঙ্গে তাঁর ব্যাপক পরিচয়। বিবেকানন্দ দেখলেন, ছিন্ন পক্ষ গরুড়ের মত তাঁর দেশ মহামানবত্বকে বহন করবার অধিকার প্রাপ্ত কিন্তু আহত, রক্তাক্ত, অসমর্থ। ভারতকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার হৃতশক্তি, বিবেকানন্দ অনুভব করলেন আত্মব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত সেই দেশ ইতিহাসে বিরাট ভূমিকা নেবে। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'।

২

ভারতবর্ষকে বৃহৎ পৃথিবীর সূচীপত্ররূপে দেখে স্বামীজী লিখেছিলেন "…এ যেন একটি নৃতত্ত্ব সংগ্রহশালা…দ্রাবিড়, আর্য আধা ও গোটা মোঙ্গল জাতি তাতারদের বহু শাখা প্রশাখা,—হাঁ পারসিক, গ্রীক ইনুচি, হুন, চীন, সিথীয়ান, আরো আরো—সবাই মিলিত মিশ্রিত—ইহুদী, আরব, স্ক্যাণ্ডনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দল অবধি—যারা এখনো একাত্ম হয়ে যায়নি—সকলকে নিয়ে জাতি-তরঙ্গিত মহাসাগর—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনাময়, নিরন্তর পরিবর্তনশীল…" এত মিশ্রণ যে-দেশে সেখানে বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। বৈচিত্র্যকে বিবেকানন্দ জীবনের লক্ষণ বলেই মনে করেন, ব্যক্তিত্বের ধর্মই হল পার্থক্যের অনুভব ; একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের চেহারার যেমন পার্থক্য আছে তেমনি মনেরও,—সুতরাং সম্প্রদায়ের বাহুল্য অনিবার্য, এমনকি মানবমনের বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা জানাবার শেষ প্রান্তে পেঁছে বলেছেন—যেদিন প্রতিটি মানুষ একটি করে সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়াবে, আমি সেই শুভদিনের অপেক্ষায় আছি। সম্প্রদায় উত্তম কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা যা অন্যের পৃথক ব্যক্তিত্বকে আঘাত করে? এর বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মহান আহ্বান—

"সহায়তা—সংঘাত নয়। অঙ্গীকরণ—বিনাশ নয়। সমন্বয় ও শান্তি—মতবিরোধ নয়।"

ভারতের মূল সমস্যা আঞ্চলিকতা, ভাষা সংঘাত, সাম্প্রদায়িতা, জাতিভেদ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই সকল সমস্যার সমাধানে বিবেকানন্দ কি ভেবেছেন?

ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার ঘনিষ্ঠযোগ। কেবল বাংলা বা হিন্দী নয়, অন্যান্য সকল ভারতীয় ভাষাতেই যথেষ্ট উপাদান আছে স্বামিজীর এই বিশ্বাস ছিল—এই সকল ভাষারই তিনি পূর্ণ স্বাধীন বিকাশ চাইতেন। ভারতের ঐক্যবন্ধনের পথে ভাব-বিনিময়ের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন আছে। সে ভাষা কী হবে?

পৃথিবীর কোন বৃহৎ সভ্য স্বাধীন জাতি বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করেনি। (বিদেশী) ইংরেজি ভাষা শিক্ষিত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সাধারণ চিন্তাভূমি রচনা করেছে, বিশ্বচিন্তার সঙ্গে ভারতের যোগ ইংরেজি মারফৎ। বিবেকানন্দের দানও তার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ইংরেজিও সর্বত্র প্রশংসিত। সেক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে ইংরেজিকে তিনি সমর্থন করবেন—তাই মনে হয়। একেবারে নয়। তিনি সমর্থন করেছেন সংস্কৃতকে।

"ইণ্ডিয়াজ মেসেজ টু দি ওয়ার্লড" নামে তাঁর একটি খসড়া রচনা কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। সেটি ভারত সম্বন্ধে একটি পরিকল্পিত গ্রন্থের সূচনাংশ। ভারত বিষয়ক চিন্তাকে তিনি ৪২টি সূত্রে নিবন্ধ করেছিলেন। এই খসড়ার কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত করছি :

১। প্রত্যেক দেশের যে সমস্যা এখানেও সেই সমস্যা—বিভিন্ন জাতির একীকরণের সমস্যা। কিন্তু ভারতবর্ষের মত এই সমস্যা অন্যত্র এত বিশালরূপে দেখা দেয় নাই।

২। ভাষা, শাসনব্যবস্থা, সর্বোপরি ধর্মের ঐক্য—একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।

৩। অন্যান্য দেশে ইহা দৈহিক বলের দ্বারা সাধিত হইয়াছে অর্থাৎ কোনো এক গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে অপরাপর সংস্কৃতির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তার ফল, কিছুকালের জন্য প্রবল জাতীয় জীবন, তারপর ধ্বংস।

৪। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে সমস্যা যেমন বৃহৎ সমাধানের উপায় তেমনি শান্ত কোমল। প্রাচীনতম কাল হইতে বিভিন্ন আচার পদ্ধতি, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

৫। যে সব দেশে সমস্যা অল্প এবং সহজেই বলপ্রয়োগে ঐক্য আনা গিয়াছে, সে সব দেশে যথার্থতঃ কিন্তু প্রধান গোষ্ঠীকে বাদ দিয়া বাকী সকল গোষ্ঠীর স্বাস্থ্যকর বিচিত্র উন্নতির বীজকে অংকুরেই নষ্ট করা হইয়াছে। সে সব ক্ষেত্রে এক বিশেষ শ্রেণীর মস্তিষ্ক নিজ উন্নতির স্বার্থে বাকি বিপুল সংখ্যক মানুষকে ব্যবহার করিয়াছে, যার ফলে সম্ভাব্য বিকাশের অধিক অংশই নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঐ প্রধান গোষ্ঠীর প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হইয়া গেলে আপাত দুর্ভেদ্যরূপে প্রতীয়মান সৌধ ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে; যেমন গ্রীস, রোম, এবং নর্ম্যানদের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে।

৬। একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচনা অনুসারে বলা যাইতে পারে ইহাদ্বারা প্রচলিত ভাষাগুলির প্রাণশক্তি নষ্ট হইবে।

৭। একমাত্র সমাধান—এমন একটি পবিত্র মহান ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে অন্য ভাষাগুলি যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃত সেই ভাষা।

৮। দ্রাবিড় ভাষা সকল মূলে সংকৃত সম্ভূত হইতে পারে, নাও পারে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা প্রায় সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংস্কৃত প্রবর্তনের অসুবিধা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। এ ভাষার কাঠিন্যের সীমা নেই। শেষ পর্যন্ত জনগণকে মাতৃভাষাতেই শিক্ষা দিতে হবে। ভারতের ভবিষ্যৎ নামে এক এক বক্তৃতায় পালি প্রভৃতি লোকচলিত ভাষায় শিক্ষাদানের ফলে বৌদ্ধাদি ধর্মের দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সংস্কৃতের প্রসার না হওয়ায় 'গৌরববুদ্ধি' ও 'সংস্কার' জন্মায়নি, ফলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। স্বামীজী বলেন,

"শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলি জ্ঞানসমষ্টি কখনও নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে টিঁকিতে পারে না···আমরা সকলেই আধুনিককালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ কতকগুলি জ্ঞান আছে কিন্তু সে সকল জাতি ঘোর অসভ্য জাতির তুল্য, তাহারা ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—কারণ তাহাদের জ্ঞান সংস্কারগত হয় নাই।···সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জ্ঞান যাহাতে সংস্কারে পরিণত হয় চেষ্টা কর।"

ভারতের ভাষা ও জাতিগত ভেদ ও সংঘাত দূর করার একমাত্র উপায়রূপে স্বামীজী সংস্কৃত শিক্ষার কথা বলেছেন, 'না হলে নানাভাগে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃ আরও বিভক্ত হইয়া পড়িবে।' এই ভাষাকে অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও থাকবে না, যেহেতু কোনোদিনই এটি কোনো গোষ্ঠীর মাতৃভাষা হয়ে উঠবে না।

প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতার চেষ্টা সম্বন্ধেও তাঁর আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল। তাকে দূর করার অন্যতম উপার—অন্যের গুণ দর্শন ও তার বিষয়ে গৌরববোধ করা।···

সাম্প্রদায়িকতা বা মুসলমান ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামীজীর মনোভাব বিশেষভাবে আলোচনা যোগ্য। তিনি প্রত্যেকটি ধর্মের অস্তিত্ব সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে এক সর্বব্যাপক ধর্মচেতনার প্রসার চাইতেন···। তিনি বলতেন, "আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—সেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই, বেদ, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয়ের

স্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম একত্বরূপ, সেই এক ধর্মেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে, আমাদের নিজেদের মাতৃভুমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

"আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।"

আর একটি সতর্কবাণী বিবেকানন্দের ছিল :

"স্বাধীনতা যে দিতে প্রস্তুত নয়, সে স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়। ধরো আজ যদি ইংরেজ তোমাদের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিয়ে চলে যায়—তখন? তখন যারা ঐ ক্ষমতা মুঠোতে পাবে ওই ক্ষমতার দ্বারা জনসাধারণকে দমন করতে চাইবে—জনগণের সঙ্গে ক্ষমতাকে ভাগ করে নেবে না। দাসেরা ক্ষমতা চায় অপরকে দাস বানাতে।" ধনিক ও শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রামের সমস্যা—বিদেশীর অধীন থাকাকালে প্রখর হয় না। কারণ তখন পরাধীন দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষই দাস। কিন্তু স্বাধীন হওয়ামাত্র উচ্চতর অধিকারভোগী দাসেরাই প্রভু হয়ে উঠে দরিদ্র দাসদের উৎপীড়ন আরম্ভ করে। দাস ক্ষমতা চায় অপরকে দাস বানাবার জন্য।

বিবেকানন্দের মানবতা এক বিরাট বস্তু। সীমাহীন সেই প্রেম একদা ভারতের প্রাণে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। পাগল করা এই প্রেম এমনই যে বিবেকানন্দের মত হিন্দু সন্ন্যাসীকে হেরিডিটি তত্ত্বের যাথার্থ্য বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছে, ধর্মচিন্তায় নয়, জনগণের অন্নচিন্তায় দেশে দেশে ঘুরিয়েছে, ভারতের জন্য ঐহিক সভ্যতার সমর্থন করিয়েছে এবং ভাবী শূদ্র একাধিপত্যকে বন্দনা করতে উদ্বুদ্ধ করিয়েছে।

ইতিহাস ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণ ক্রমান্বয়ে পৃথিবী শাসন করবে। প্রথম তিন বর্ণের আধিপত্যকাল শেষ হয়ে গেছে—বা হওয়ার মুখে, এবার অধিকার শূদ্রের, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না। শূদ্র শাসন আনবে দারুণ সংঘর্ষের ও আলোড়নের মধ্য দিয়ে। অন্ততঃ বিবেকানন্দ তাকে রোধ করতে চাননি—"আমি সমাজতান্ত্রিক"—ঘোষণাদ্বারা তা জানিয়ে গেছেন।…শূদ্রশাসন সমর্থন করার কালে তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের অনেকখানি অংশের বিরোধিতা করছিলেন। বিবেকানন্দ কি জানতেন না, সোস্যালিজম, কমিউনিজম প্রভৃতি আন্দোলন ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার (কিংবা বস্তুবাদী) উপর নির্ভর করে স্থাপিত? অবশ্যই জানতেন, এবং জানতেন—শূদ্র শাসন ভোগের উত্তেজনায় জীবনের গভীরতর অধ্যাত্ম—পিপাসাকে অবৈজ্ঞানিক বলে অগ্রাহ্য করবে। সে কথা জানতেন, তবু অনাহারে অশিক্ষায় মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকবে তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। …কিন্তু জনগণের ঐহিক অধিকারের সঙ্গে তার আত্মিক অধিকারের সমস্যার প্রশ্নকে তিনি কখনো ত্যাগ করতে পারেননি। সোস্যালিজম তিনি অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করলেন, কিন্তু বললেন, "তার প্রতিষ্ঠার আগে অধ্যাত্মবন্যায় দেশকে ভাসাও। নচেৎ মনুষ্য ও সুখী পশুতে কোনো প্রভেদ থাকবে না। এমনকি প্রাপ্তি সুখও অচিরে ক্লান্তিকর, সুতরাং অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।" মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনের পক্ষে বিবেকানন্দ যোদ্ধা, মানুষের আত্মগত প্রয়োজনের পক্ষেও।

ভারতবর্ষের প্রতিভায় বিশ্বাসী এই মানুষটির মতে সে সমাধান তাঁর ব্যক্তিগত নয়, তাঁর জাতির ইতিহাসের ঘোষণা। ভারতই তার উত্তর দিয়ে গিয়েছে বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে। □

যুবজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী ঈশাত্মানন্দ

যুবকদের অনুরোধ শুনে অবাক হয়ে গেলেন ষ্টেশন মাষ্টার। কুম্ভকোণাম থেকে মাদ্রাজগামী মেলট্রেনটাকে থামাতে হবে? এই অখ্যাত ষ্টেশনে! কেন? কি এমন গুরুতর কারণ ঘটলো? মেলট্রেন থামাবার মতো কোন গুরুতর কারণ ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে না থাকলেও আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে আসা কয়েক শত যুবকের কাছে ছিল। ঐ বিশেষ ট্রেনটিতে কুম্ভকোণাম থেকে মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যুবকদের জীবনের ধ্রুবতারা, তাদের প্রাণের নেতা চলে যাবেন ঘরের সামনে দিয়ে আর তাঁকে তারা দর্শন করবে না! সুতরাং থামাতেই হবে ট্রেন—দলে দলে তারা শুয়ে পড়ল লাইনের উপর। বাধ্য হয়ে গতি কমাল মেলট্রেন। দারুন উত্তেজনার মধ্যে যুবকেরা লক্ষ্য করল কামরার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন সূর্যের মতো দীপ্তিমান তাদের প্রাণের মানুষটি। ক্ষণিকের জন্য দর্শন পেয়েও শত শত তরুণ কন্ঠ আকাশ কাঁপিয়ে ধ্বনি তুললো—"জয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজী কি জয়"।

সেদিন ধ্বনি উঠেছিল সারা ভারত জুড়ে। ৯০ বছর আগে বিবেকানন্দের নাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ভারতের প্রতিটি শহরে, নগরে, গ্রামে, গৃহে। হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে যুবকেরা সমবেত হয়েছিল বিবেকানন্দের চারপাশে। তাঁর বিজয় রথের অশ্ব খুলে দিয়ে সানন্দে তা নিজেরাই টেনে ছিলো। স্বামী বিবেকানন্দ, তাদের নেতা, তাদের হৃদয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে তাদের পরিচালনা করবেন আর তারা তাঁর আদেশ পালন করে এগিয়ে যাবে নতুন দিগন্তের সন্ধানে। বোধহয় এই ভাবটা প্রকাশ করতেই যুবকেরা প্রতীক হিসাবে বিবেকানন্দের বিজয় রথ টেনেছিলো।

কিন্তু কেন? কেন যুবকেরা ছুটে এসেছিলো বিবেকানন্দের কাছে? কেন তাঁকে মেনে নিয়েছিলো তাদের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে? বিবেকানন্দের মধ্যে কি এমন বিশেষ গুণ ছিল যা যুবকদের আকৃষ্ট করেছিল, উদ্বেলিত করেছিল?

উত্তর পেতে গেলে যেতে হবে ইতিহাসের পথ ধরে। জানতে হবে বিবেকানন্দের অবদানের কথা, ভারতের চরম অধোগতির সময়ে, যে অধোগতির সূচনা হয়েছিল দীর্ঘদিন আগে, ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরীর হাতে দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের পতনের মধ্য দিয়ে। ভারতের বুকে তুর্কীরা যে "কাফের হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন" করেছিল তাতে যোগ দিতে ছুটে এসেছিল মোগল পাঠান প্রভৃতি। আঘাতের পর আঘাতে ভেঙে পড়তে লাগলো ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম। জানতে ইচ্ছা করে কেন এমন হলো, কেন ভারত পারল না এই বিদেশী স্রোতকে প্রতিরোধ করতে? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঐতিহাসিক

দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে এর কারণ আবিষ্কার করেছেন। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ শক্তি প্রবল ছিল, বৌদ্ধযুগে ক্ষাত্রশক্তি প্রবল, বৌদ্ধযুগের পর—"এই দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক ; কিন্তু সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্য'ও নাই, ব্রহ্মবীর্য'ও লুপ্ত। পরস্পরের স্বার্থের সহায়—বিপক্ষের সমূল উৎকাষণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্য ক্ষয়িত বীর্য নতুন শক্তিসঙ্গম, নানাভাবে বিভক্ত হইয়া প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল ; শোণিত শোষণ, বৈর নির্যাতন, ধন-হরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া পূর্ব রাজন্যবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাত মাত্র করিয়া ভাটচারণাদি চাটুকার শৃঙ্খলিত পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাযোগ জালে জড়িত হইয়া পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।"

উত্তর ভারতের ভিতর দিয়ে যেমন এলো ইসলামশক্তির স্রোত তেমনি দক্ষিণ ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করলো আর এক দুরন্ত শক্তি। ১৪৯৯ সালে ভাস্কো-ডা-গামা'র পায়ে পায়ে এলো পর্তুগীজ। তারপর এক একটি ঢেউ-এর মতো এলো ডাচ্, ফরাসী, ইংরাজ। ভারতের রুটির শোষণ নিয়ে শুরু হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাঁধল লড়াই। ভারতের দুর্ভাগ্য, ভারতীয় রাজারা এ সময়ে একতাবদ্ধ হওয়ার বদলে যোগ দিল বিভিন্ন বিদেশী শিবিরে—নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় হলো ইংরাজদের। ১৭৬১ সালে ফরাসীদের ধ্বংস করে উঠে দাঁড়াল ইংরাজশক্তি। এবার তাদের রুধিরলিপ্ত তরবারি নেবে এলো ভারতীয় রাজশক্তির উপর। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল মারাঠা, রাজপুত, শিখ, পাঠান, মোগল—সমস্ত শক্তি এবং, "By 1856, from the Indus to the Brahmaputra, from the Himalayas to the cape camorin the Union Jack flew in unquestioned Supremacy.'[১]

সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করেও থেমে যায়নি সুচতুর ইংরাজ। তারা বুঝেছিল ভারতের প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে আছে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে নয়, আছে ধর্মে। তাই ভারতের সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। তবে তারা তাদের পূর্ববর্তী আক্রমণকারীদের মতো ভুল করেনি। বুদ্ধিমান ইংরাজ জাতি বুঝেছিল মন্দির বা দেবমূর্তি ধ্বংস করে ভারতের ধর্মকে ধ্বংস করা যাবেনা। সুতরাং তারা শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধির বিভ্রম ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবং এ ব্যাপারে যে তারা প্রায় সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। তার প্রমাণ হিসাবে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। উলিয়ম কেরী ও রাজা রামমোহন রায়ের একান্ত প্রচেষ্টায় তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় গড়ে উঠেছিল হিন্দু কলেজ যা পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হিসাবে বিখ্যাত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিস্তারে হিন্দু কলেজ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। সেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে ড. মজুমদার বলেছেন, "হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সনাতন ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি ত্যাগ করে সনাতন বিশ্বাসের পরিপন্থা আচার-আচরণে ইচ্ছা করে মেতে উঠল, যেমন—মদ্যপান ; গরুর মাংস খাওয়া ইত্যাদি।"[২]

বিদেশী শিক্ষা-সংস্কৃতির দ্বারা ভারতের যে একেবারেই কোন উপকার হয়নি তা নয় তবে ক্ষতিও বড় কম হয়নি। সব থেকে বড় ক্ষতি যা হয়েছিল তা হলো একটা তীব্র ঘৃণা, অশ্রদ্ধার বীজ ঢুকে গিয়েছিল তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে। যা কিছু ভারতীয় তা সব কিছুই খারাপ —এই ভাবের ফলে শিক্ষিতদের মধ্যে বিদেশী ভাব ও ধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, মধুসূদন দত্ত, লালবিহারী দে, গোবিন্দ দত্ত প্রভৃতি খ্যাতিমান ব্যক্তিরা খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন।

ধর্মান্তরণের এই দুরন্ত স্রোত রোধ করতে সচেষ্ট হয়েছিল কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে ব্রাহ্ম সমাজের নাম। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজপতিদেরও সনাতন ধর্মের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিলনা। তাই তাঁরা এক নতুন ধর্ম-দর্শন স্থাপনের চেষ্টা করলেন। তাঁদের

সেই দর্শনের ভিত্তি কি ছিল? "ফরাসী কাস্তেজীয়ান দর্শনের সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের খৃষ্ট প্রীতি সত্ত্বেও তিনি স্কটল্যাণ্ডের 'সহজ-জ্ঞান' বাদ এই দার্শনিক ভিত্তির উপরই তাঁর ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যে ব্রাহ্মধর্মের সাক্ষাৎ আমরা চাই তাহার ভিত্তি জার্মেনীর হেগেল দর্শনের ইংলণ্ডীয় তর্জমা। তরঙ্গের পুরভাগে ফেনিল বেদান্তের কলকল ধ্বনি থাকিলেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি যথাক্রমে ফরাসী, স্কটল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইংলণ্ড হইতে অগ্রসর করা হইয়াছে।"[৩]

ব্রাহ্মসমাজের পথ ধরে মাধব গোবিন্দ রাণাডের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে গড়ে উঠেছিল প্রার্থনা সমাজ আর এগিয়ে এসেছিল আর্য সমাজ বিখ্যাত সন্ন্যাসী দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে। কিন্তু এঁরাও সমগ্র বেদ, যা সনাতন ধর্মের ভিত্তি ভূমি, গ্রহণ না করে শুধু কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও সংহিতা অংশটুকু গ্রহণ করলেন ফলে সারা ভারতে এঁরা প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হলেন।

সনাতন হিন্দুরা এ সময়ে কি করছিল? সে চিত্র তুলে ধরেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার—"So far the Hindu masses were concerned, religion meant an unending series of rituals and ceremonies, performed in strict accordance with spiritual rules. Many obnovious rites were practised by the common people, immoral customs, with belief in witchcraft and sorcery, were in vogue. Religion as a source of moral purity and spiritual force exercised little influence over a large section of common people.[৪] সাধে কি আর স্বামীজী বলেছেন, "হে হরি, যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার করেছেন, ডান হাতে খাব কি বাঁ হাতে, ডান দিক থেকে জল নেব কি বাঁ দিক থেকে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে?"

অধোগতি হয়েছিল ভারতের, চূড়ান্ত ভাবেই। ইংরাজ সরকার ও খৃষ্টান মিশনারীদের পরিকল্পিত প্রচারের ফলে স্বদেশের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি—স্বদেশীয় সমস্ত কিছুর উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে, নিজেদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে অতীতের গৌরবময় ইতিহাসকে ভুলে পরানুকরণের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো ভারত। ধনীদের তখন ধ্যান-জ্ঞান হলো কেমন করে ইংরাজ সরকারকে খুশি করে একটা 'উপাধি' পাওয়া যায়। শিক্ষিতদের লক্ষ্য হলো বিদেশীদের তোষামদ করে একটা চাকরী জোগাড় করা আর অসংখ্য গরিব ভারতবাসী, স্বদেশী-বিদেশী সকলের কাছেই শোষিত হতে হতে হীন পশুর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলো, বাধ্য হলো। এদিকে মিশনারীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমস্ত পৃথিবীর সামনে ভারতের এক কুৎসিত ছবি তুলে ধরলো। বিশ্বের চোখে ভারত তখন এক বীভৎস দেশ। সাপ, ব্যাঙ আর কুমিরে ভর্তি। কালো নোংরা মানুষের বাসভূমি, যেখানে স্বামীরা স্ত্রীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারে, মায়েরা তাদের সন্তানদের কুমীরের মুখে ফেলে দেয়।

বিদেশীদের এই পরিকল্পিত প্রবল অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, অকথ্য অত্যাচার আর অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি। হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু সমস্ত ভারতকে নাড়া দেবার মতো একটি মানুষও তখন ছিল না। অসহ্য যন্ত্রনায় গুমরে মরছিল ভারতের অন্তরাত্মা।

এমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন বিবেকাকন্দ। একথা বলা মোটেই অসঙ্গত হবে না যে তখন যদি বিবেকানন্দ না আসতেন তবে হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হতো। হয়তো বা হারিয়ে যাওয়া ইনকা সভ্যতার মতো হারিয়ে যেত সনাতন ভারত, শুষ্ক ইতিহাসের পাতায় পড়ে থাকতো তার স্মৃতি চিহ্ন।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ত্রিভুবনই তাঁর স্বদেশ তবু নিজ মাতৃভূমির অপমানে আহত

সিংহের মতো ক্ষিপ্ত হলেন তিনি—"যে আপনার মাকে ভাত দেয়না, সে অন্যের মাকে আবার পুষবে?"[৫] ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘরে দেশীয় রাজা, জমিদার, শিক্ষিত ব্যক্তি, পণ্ডিতদের মধ্যে জাগাতে চাইলেন স্বদেশ প্রেম। কিন্তু পারলেন না; কারণ তাদের দৃষ্টি তখন পাশ্চাত্যের দিকে নিবদ্ধ, মোহাছন্ন। বিবেকানন্দ বুঝলেন এই মোহকে ভাঙতে হলে মোহজাল সৃষ্টিকারী পাশ্চাত্যে গিয়ে আঘাত হানতে হবে। সুতরাং "Strike the centre" কেন্দ্রে আঘাত হানো।

গর্জে উঠলো বিস্মুভিয়াস্—আমেরিকার বুকের উপর দাঁড়িয়ে নিপীড়িত ভারতের প্রতিনিধি এক নিঃস্ব সন্ন্যাসী সুমহান আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but rebel child and christianiy, only distant Echo"—আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে বেরিয়েছি, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান আর খৃষ্টধর্ম সুদূরবর্ত্তী প্রতিধ্বনি মাত্র।

স্তব্ধ হয়ে গেল বিশ্ব। বিবেকানন্দ মুখ নিঃসৃত লাভা স্রোতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মিশনারী-দের অপপ্রচারের বিশাল কালো পাহাড়। আর অপরূপা ভারতবর্ষকে জানতে পেরে পাশ্চাত্যের উদার শিক্ষিত সমাজ তার স্তুতি শুরু করলো। সসম্মানে অভিনন্দন জানাল ভারত-প্রতিনিধি বিবেকানন্দকে।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মোহ ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল ভারত। শুনতে পেলো আকাশের গায়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিবেকানন্দের আহ্বান—কে বলে তোমরা দুর্বল, কে বলে তোমরা কাপুরুষ, অমৃতের সন্তান তোমরা, ওঠো, জাগ, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছ ততদিন ক্রমাগত এগিয়ে চলো।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম ঘটলো এক অবিস্মরণীয় ঘটনা—জাতি, ধর্ম ভাষার বিভেদ তুলে সমস্ত ভারত একযোগে দাঁড়িয়ে উঠলো স্বামী বিবেকানন্দকে অভিনন্দন জানাতে। আর এর মধ্যে দিয়ে জন্ম নিল ভারতীয় জাতিয়তাবোধ।

জাতীয়তার একটি বিশেষ লক্ষণ হলো নিজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গৌরববোধ। প্রলোভন ও অপপ্রচারের প্রবল স্রোতে ভারতবাসী হারিয়ে ফেলেছিল সেই অপূর্ব সম্পদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেই সম্পদ তারা আবার ফিরে পেয়েছিল, ফিরিয়ে এনেছিলেন বিবেকানন্দ। ভারতের প্রতিটি নর-নারীকে ডেকে তিনি বলেছিলেন—

> এই সেই প্রাচীন ভূমি, অন্যান্য দেশে যাবার পূর্বে তত্ত্বজ্ঞান যে স্থানকে নিজ প্রিয় বাসভূমি রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন;…এই সেই ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম ঋষি মুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এখানেই সর্ব প্রথম অন্তর জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এখানেই মানব-মন নিজ স্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎ প্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতি সমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার শত শত বৈদেশিকে আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতি-নীতির বিপর্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি, যাহা অবিনাশী ব্যর্থ ও জীবন লইয়া পর্বত হইতেও দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ। আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমারা এই দেশের সন্তান।'[৬]

জেগে উঠলো বিশাল ভারত, অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বুকে নিয়ে জেগে উঠলো। জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে বিবেকনন্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললো, "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ;…মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই…ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী…ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"[৭]

"স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বর্তমান জাতীয় জীবনের শুকতারা"। ১৯১২ সালে 'মারাঠা' পত্রিকা স্বগর্বে ঘোষণা করেছে, "বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তার যথার্থ জনক…প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁর জন্য গর্বিত।"[৮]

জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিল আর একটি বিস্ফোরণ—যুব জাগরণ।

যুবকেরা স্বভাতই স্বাধীনতাপ্রিয়, সাহসী বীরের পূজারী। তাই যখন তারা দেখলো মুক্তি সূর্যের লাল আলো বিবেকানন্দের মাধ্যমে, যখন তারা দেখলো একাকী নিঃসঙ্গ বীর অকুতোভয়ে যুদ্ধ করছে এক বিশাল দুর্দান্ত শক্তির বিরুদ্ধে, নিজের স্বার্থে নয় শুধু তাদের ভালবেসে, তাদের সকলের জন্য—ছুটে এলো তারা বিবেকানন্দের কাছে, সানন্দে মেনে নিল তাঁকে তাদের নেতা হিসাবে। আর বিবেকানন্দকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়ে যুবকেরা ভুল করেনি।

বিখ্যাত সাংবাদিক-লেখক কালীনাথ রায় 'ইন্ডিয়ান রিভিউ'তে লিখেছেন, "বিবেকানন্দ তরুণ ভারতের যোগ্য নেতা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীরগণের পংক্তিভুক্ত, যে সারিতে আছেন ওয়ালেস, রুস, হ্যাম্পডেন, ক্রমওয়েল কিংবা মাৎসিনী। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে বিবেকানন্দ ওঁদের ভূমিকাই নিতেন। পাশ্চাত্ত্যের মগ্ন আগ্রাসী চেহারা একদিকে, অন্য দিকে [তথা কথিত] ধর্ম-প্রকোপে নিস্তেজ ভারতবাসী—এই উভয়ের মধ্যে সঠিক পথের দিগ্দর্শক হিসাবে বিবেকানন্দের আবির্ভাব, যিনি একই সঙ্গে ভক্ত ও মণ্ডনেতা, দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী, ইহবাদী অথচ সংসার-ত্যাগী। তিনি যথার্থই যুগসন্ধিকালে ভারতবর্ষের যোগ্য প্রতিনিধি।"[৯] আর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভেতর যোদ্ধা বিবেকানন্দকে দেখে অবাক হয়ে নিবেদিতা বলছেন, "প্রায়শঃ স্বামীজীর সন্ন্যাসীর বহির্বাস খসে পড়ত, আর দেখা যেত ভেতরে রয়েছে সৈনিকের বর্ম।"

ভারতের মুক্তি সূর্যের অগ্রদূত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, যোদ্ধা বিবেকানন্দের কাছে যেমন ছুটে এসেছিল যুবকেরা তিনিও তেমনি দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন তাদের আর মনের আনন্দে বলে ফেললেন প্রাণের কথাটি, "I have born to organize these young men." আমি তো এদের জন্যই এসেছি।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত যুবশক্তিকে আলাদা করে কোন গুরুত্ব দেওয়া হতো না। কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে যুবশক্তিকে। এর কারণ হিসাবে বলা যায়—১. অর্থনৈতিক : বিশ্বের বাজারে যুবশক্তি এক বিশাল ক্রেতা হিসাবে গণ্য হচ্ছে। ২. সাংস্কৃতিক সমন্বয় : পৃথিবীর সর্বত্র এখন যুবকেরা একই রকম শিক্ষা, পোষাক, ব্যবহারে অভ্যস্ত। ৩. সংগঠিত শক্তি : যুবকদের সংগঠিত শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে চীনের 'রেড়গার্ড''দের মধ্যে আর অতি সাম্প্রতিক কালে ইরানে। সমস্ত বিশ্ব যে যুবশক্তিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে রুমানিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী জাতি সংঘ ১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

বিবেকানন্দ অনেক আগেই যুবশক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন তবে তার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা।

যৌবন মানুষের জীবনের এক বিশেষ অবস্থাকে বলা হয়। বয়ঃসন্ধি অবস্থা থেকে শুরু হয় যৌবন আর শেষ হয় যখন মানুষ বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন হয়, স্বনির্ভরতা লাভ করে সমাজের এক দায়িত্বশীল সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত সকলকে যুবক বা

যুবতী বলা হয়। এই কটি বৎসর বিশেষ করে যৌবন প্রাপ্তির প্রথম অবস্থা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। কারণ এই সময়ে সে যা করে সেটাই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে। সেই জন্য স্বামীজী যৌবনকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে এই প্রচণ্ড শক্তিকে যদি কল্যাণময়, গঠন মূলক পথে পরিচালনা করা যায় তবে ব্যক্তি হিসাবে তারা হবে সত্যিকারের 'মানুষ' আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের হবে অশেষ মঙ্গল। তাই স্বামীজী যুবকদের সামনে জীবনের সব 'ইতিবাচক' দিক তুলে ধরে তাদের আত্মবিশ্বাসী করতে চেয়েছেন। তাদের সামনে ধর্মের আসল রূপটি তুলে ধরে তাদের নীতিবান, চরিত্রবান করতে সচেষ্ট হয়েছেন, আর দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, "আমি চাই এমন লোক —যাহাদের পেশী সমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর উহার মধ্যে থাকিবে এমন একটি মন, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত।"[১০]

বীরত্বের প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দ। দুর্বলতা, কাপুরুষতা, মিনমিনে, প্যানপ্যানে ভাব একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। জাতীয় জীবনের যেখানেই দেখেছেন দুর্বলতা সেখানেই তিনি হেনেছেন কঠিন আঘাত। "গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেনা। আর সে গানের মধ্যে প্যাচের কি ধুম। সে কি আঁকা বাঁকা ডামাডোল, ছত্রিশ নাড়ীর টান তায়রে বাপ্।" ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম—জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র বলবান হোক, উন্নত হোক এই আশা নিয়ে বললেন, "জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা-শিল্প-সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কোথা থেকে আসবে বল, কেমন করে হবে উন্নতি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, "উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা।" পরাধীন জাতি ইচ্ছা থাকলেও জাতীয় জীবনে উন্নত হতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। সুতরাং ভারতকে যদি উন্নত হতে হয় তবে সর্বপ্রথম কাজ হলো বিদেশী শাসকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে স্বাধীনতা, দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে দেশমাতাকে। ভারত-প্রেমিক বিবেকানন্দ বাজালেন রণ ভেরী—"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া এই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন। অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।"[১১] কি দিয়ে হবে এই জাগ্রত দেবতার পূজা? বলি-জীব বলি। "এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবন বলি, তাদের জন্য—যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন-দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।"[১২]

বিবেকানন্দের রণ-আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল যুব-ভারত। স্বাধীনতা পূজার অর্ঘ্য হিসাবে নিজের হাতে নিজ হৃৎপিণ্ডকে উৎপাটিত করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা নেই তাদের মনে বরং 'তারি লাগি কাড়াকাড়ি'। তাদের পেশীবহুল লৌহ কঠিন হাত চেপে ধরলো বিদেশী শাসকের কণ্ঠনালী। তাদের নিক্ষিপ্ত বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো বৃটিশ সিংহের প্রাণ। অবাক হয়ে তারা ভাবতে লাগলো—কোথা থেকে এলো এই আগুন খেকো ছেলের দল? মৃত্যুর আদেশ শুনলে এরা হাসে, ফাঁসির দড়ি যেন এদের বরমাল্য, বন্ধুকে আলিঙ্গন করার ব্যগ্রতা নিয়ে ছুটে এসে বুক পেতে দেয় বন্দুকের সামনে, বীভৎস নির্জন কারাগারের কুঠুরী যেন হিমালয়ের গুহা—সাধকের নিষ্ঠা নিয়ে সেখানে ধ্যান করে, কারা এরা? কোথা থেকে পায় এত শক্তি? শক্তির উৎস খুঁজতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল বৃটিশ। একি এতো একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। পুলিস অফিসার ডেনহ্যান মিস্ ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন, "যেখানেই বিপ্লবীদের সন্ধানে যাই, সেখানেই বিবেকানন্দের পুস্তক নাই।"[১৩]

অফিসার ডেনহ্যাম যে মিথ্যা বলেননি তার প্রমাণ 'অগ্নিপুত্র'দের এক পাণ্ডার উক্তি। বিখ্যাত 'অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম নেতা প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর আত্মজীবনী 'বিপ্লবীর জীবনদর্শন'

তৎকালীন বিপ্লবীদের উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের অপূর্ব সংবাদ দেয়—"স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অন্তরের মধ্যে পরসেবায় আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল।"[১৪] প্রত্যেক বিপ্লবী আখড়ায় স্বামীজীর 'ক্রম কলম্বো টু আলমোড়া' (বাংলা অনুবাদ 'ভারতে বিবেকানন্দ') গ্রন্থটি পড়া হতো। বিবেকানন্দের অগ্নিময় বাণীই যে যুবকদের দুঃসাহসিক করেছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯ এপ্রিল ১৯২৮ সালে ডাঃ সরসীলালকে লিখেছেন,"আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। ···বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে···।"[১৫] শুধু বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যেই নয় বিবেকানন্দের ডাকে সাড়া দিয়ে দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন সারা ভারতের যুবসমাজ। শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধেই নয় ভ্রান্ত জাতি-বর্ণের অহঙ্কার ত্যাগ করে উচ্চবর্ণের যুবকেরা এগিয়ে এসেছে নিম্নবর্ণের দুঃস্থ-পীড়িত মানুষকে সেবা করার জন্য। ঘরে ঘরে গিয়েছে অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করার ব্রত নিয়ে। যুব-জাগরণের স্পন্দন পৌঁছেছিল জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে।

বিবেকানন্দের ঋণকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন ভারতের সমস্ত নেতারা—"Swami Vivekananda saved Hinduism and saved India. But for him we would have lost our religion and would not have gained our freedom. We, therefore, owe everything to swami Vivekananda." চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর এই সানন্দ স্বীকারোক্তির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ, নেহেরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণ—সকলে।

* * * *

একদিন এই ভারতে বিবেকানন্দের অগ্নিময় বাণী বুকে নিয়ে নিয়ে এগিয়ে এসেছিল যুবকেরা, অর্পণ করেছিল প্রাণ। তাঁদের বুকের রক্তের উপর দিয়ে এগিয়ে এসেছে স্বাধীনতার বিজয় রথ। স্বাধীন ভারতের যুবশক্তিকে এখন এগিয়ে আসতে হবে, শক্ত হাতে ধরতে হবে সে রথের রজ্জু। সকল বাধা চূর্ণ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভারতকে। এ সুমহান দায়িত্ব যে স্বামীজী তোমাদেরই উপর অর্পণ করেছেন—"হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।"[১৬]

স্বাধীনতা কালে যুবকেরা হয়তো মনে যে ভারত স্বাধীন হয়ে গেছে সুতরাং দেশের জন্য যুবকদের এখন আর কিছু করার নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? স্বাধীন ভারতের যুবক-যুবতীরা কি শুনতে পাচ্ছেনা ভারতের কান্না ? অসংখ্য দীন-দরিদ্র, পতিত-উৎপীড়িত ভারতবাসীর করুণ আর্তনাদ কি শুনতে পাচ্ছে না ? জ্বলন্ত গৃহবধূদের মৃত্যু চিৎকার কি তাদের কণ্ঠে পৌঁছাচ্ছে না ? তারা কি এদের জন্য কিছুই করবে না ? নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, সুখের জন্য রেষারেষী করবে ? স্বাধীন ভারতের যুবশক্তি কি শেষে ভীরুর মতো, স্বার্থপরের মতো শত শহীদের রক্তঋণ অস্বীকার করবে ?

বিবেকানন্দ যে যুবকদের বড় ভালবাসতেন। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন দৃঢ় চারিত্রিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ভারতের তরুণ-তরুণীরা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে' আপসহীন সংগ্রাম করছে যত অন্ধকার আর অপরাধের বিরুদ্ধে। তারা রাত জেগে সেবা করছে

আর্ত রুগী, পরম মমতায় তুলে ধরছে ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন, ভালবেসে মুছিয়ে দিচ্ছে অনাথ শিশুর চোখের জল। ভারতের মাটিতে নেমে এসেছে স্বর্গ, ভারতের প্রতিটি গৃহে বেজে উঠেছে আনন্দের শঙ্খ ধ্বনি। একবুক আশা নিয়ে স্বপ্নময় দুটি আঁখি মেলে তাকিয়ে আছেন বিবেকানন্দ যুবকদেরই দিকে। আজ সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন ভারতবর্ষের যুবক-যুবতীরা কি বিবেকানন্দকে নিরাশ করবে? এই প্রশ্নটি আধুনিক, চলমান ভারতবর্ষের বুকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বেরিয়ে আসুক মথিনসৃত উত্তর—না। আমরা সাগ্রহে সেদিনের আশায় ক্রমাগত এগোচ্ছি। □

উৎস নির্দেশ ঃ

১. Evolution of Indian Culture, Prof. BN. Luniya, 1951, Page-490
২. The History and Culture of Indian people, Ed. R. C. Mazumder, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, Vol-10, Part-II Page-89
৩. স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, সন ১৩৩৪, পৃষ্ঠা-৩০০
৪. The History & culture of Indian people, Ed. R. C. Mazumder Vol. 6 p. 626
৫. স্বামীজীর কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৩৪, পৃষ্ঠা-৪৩
৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা-২৬৪
৭. ঐ, পৃষ্ঠা-২৯৪
৮. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ষষ্ঠ খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৫৪
৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৫৬
১০. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৯৫
১১. ঐ, পৃষ্ঠা-২৯৭
১২. ঐ, পৃষ্ঠা-২৯৬
১৩. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫
১৪. ঐ
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৭
১৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৯৬

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘ ও মানবসেবা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

একদিন দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) সহ অন্যান্য ভক্তদের উপস্থিতিতে বৈষ্ণবের অন্যতম কর্তব্য-'জীবে দয়া' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্তির সঙ্গে বলেন ঃ মান্‌ষ জীবে দয়া করবে-এ কি করে হয় ? জীবের মধ্যে যে ব্রহ্ম রয়েছেন তাঁকে দয়া করবে কে ? না, তা হতে পারে না-জীবে দয়া নয়, জীব সেবা-শিবজ্ঞানে জীবসেবা। যেন স্বয়ং ঈশ্বরের সেবা করছি, এই বোধ নিয়ে, শ্রদ্ধার সাথে, বিনয়ের সাথে, প্রীতির সাথে মান্‌ষের সেবা করতে হবে-দয়া নয়। 'দয়া'র মধ্যে একটা ছোট-বড় ভাব থাকে, বড় যেন ছোটকে অন্‌কম্পা করছে, এর মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব, একটা উপেক্ষার ভাব, একটা আত্মম্ভরিতার ভাব থেকে যায়। এই ভাবটা থাকা উচিত নয়। উপনিষদে আছে-'শ্রদ্ধয়া দেয়ম।' তুমি যদি কাউকে কিছ্‌ দাও তাহলে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে হবে। 'অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম'-যেখানে শ্রদ্ধা নেই, দেবার ইচ্ছা নেই সেখানে না দেওয়াই উচিত। যাকে দিচ্ছি তার প্রতি যদি ভালবাসা, প্রীতি এবং শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে তাকে কিছ্‌ দেওয়া মানে তাকে আপন করা, তার মধ্যে যে নারায়ণ রয়েছেন, শিব রয়েছেন তাঁকে অপমান করা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, জীবে দয়া নয়, সেবা। শ্‌ধ্‌ সেবা নয়, শিবজ্ঞানে সেবা এই আলোচনায় বেদান্তের গ্‌ঢ় তত্ত্বকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

শেষে স্বামীজী করলেন মনে মনে সেদিন একটি সংকল্প। বললেন-আজকে একটা অভিনব কথা শ্‌নলাম। যদি ভবিষ্যতে স্‌যোগ পাই, তাহলে আমি এই মহান সত্যটিকে সর্বত্র প্রচার করব। বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পে'ছে দেব। কোন্‌ মহান্‌ সত্য ? বেদান্তের কোন তত্ত্ব ? শ্রীরামকৃষ্ণ যার কথা বললেন-জীবে দয়া নয়-শিবজ্ঞানে জীব সেবা। শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলতেন-চোরর্‌পী নারায়ণ, দ্‌ষ্টর্‌পী নারায়ণ। যে চোর, বদমাস-তার মধ্যেও নারায়ণ রয়েছে, হয়ত স্‌প্ত অথবা অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছেন। নারায়ণকে জাগিয়ে দিতে হবে। তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে তুমি স্বর্‌পতঃ ঈশ্বর। তোমার মধ্যে সেই সম্ভবনাকে তুমি বাস্তবায়িত কর। এই দ্‌ষ্টিভঙ্গি নিয়ে মান্‌ষের সাথে মান্‌ষকে ব্যবহার করতে হবে। আমরা পরে দেখি স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ম্‌র্খ নারায়ণ, পাপী নারায়ণ, দ্‌ষ্ট নারায়ণ, আর্ত নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণ। অর্থাৎ মান্‌ষ মাত্রেই নারায়ণ। তিনি বলতেন, আমি সেই ভগবানের প্‌জো করি যাঁকে অজ্ঞরা ভুল করে 'মান্‌ষ' বলে। এই মান্‌ষর্‌পী ভগবানের সেবা করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য, ভাগ্যবান, কৃতার্থ মনে করা উচিত। সেই ভগবানের সেবা করার জন্য, প্‌জো করার জন্য বিবেকানন্দ বল্‌ছেন তিনি হাজার বার নরকে যেতে প্রস্ত্‌ত, তারজন্য তিনি নিজের ম্‌ক্তি উপেক্ষা করতে পারেন।

বেদান্তে আমরা নির্বিকল্প সমাধির কথা পাই যে অবস্থায় মান্‌ষের উপলব্ধি হয় 'অহং

ব্রহ্মাস্মি'-আমি ব্রহ্ম এই অবস্থা-প্রাপ্তিকে আমাদের শ্রুতি বলছেন মানবজীবনের চরম সার্থকতা যা মানুষকে দেয় পরম পুরুষার্থ বা আত্মমুক্তি। এই অবস্থায় যে আনন্দের আস্বাদ মানুষ পায় তা ভাষায় অবর্ণনীয়। জগতের সব আনন্দ সেই আনন্দের কছে তুচ্ছ। স্বামী বিবেকানন্দ-তখন তিনি যুবক নরেন্দ্রনাথ-শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সেই আনন্দে যাতে তিনি সর্বক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকতে পারেন তার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সে কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। কঠোরভাবে তিরস্কার করে তিনি অন্তরঙ্গ শিষ্যকে বলেছিলেন: "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। এতো অতি তুচ্ছ, হীন কথা। নারে এত ছোট নজর করিস না।" বলেছিলেন: ও অবস্থার (নির্বিকল্প সমাধির) উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস-'যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'। এই অবস্থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। নরেন্দ্রনাথ যে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকার তথা আত্মমুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন সেই ব্যাকুলতা ভারতবর্ষের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে অত্যন্ত বাঞ্ছিত বস্তু। সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ের গুহায় অথবা অরণ্যের নিভৃতে নিজের মুক্তির জন্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হওয়া ও তাঁর উপলব্ধি ভারতের সাধককুলের অধ্যাত্মজীবনের চিরন্তন অভীপ্সা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "চোখ বুজলে ঈশ্বর আছেন, আর চোখ খুললে কি ঈশ্বর নাই? চোখ খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন।" যুগাবতারের মুখে নরেন্দ্রনাথ শুনলেন এক নতুন বাণী। স্পষ্টভাবে জানালেন শুধু নিজ মুক্তির জন্য লালায়িত হওয়া চূড়ান্ত সার্থপরতা। জীবনের সার্থকতা জগৎকল্যাণে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে নিঃশেষে নিবেদনে। সেই শোনার, সেই জানার ফলশ্রুতি রামকৃষ্ণ সংঘ-রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভিনব এক ধর্মসংঘ।

স্বামীজী যে নতুন সন্ন্যাসী সংঘ গড়লেন তাতে বললেন যে এই সংঘের সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য হবে-"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" এই সংঘের সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তির জন্যে যেমন চেষ্টা করবে তেমনই জগতের কল্যাণের জন্যেও চেষ্টা করবে। কিন্তু কি ভাব নিয়ে জগতের কল্যাণের চেষ্টা করবে? ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব নিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন-অচল বিগ্রহ আর সচল বিগ্রহ। আমরা মন্দিরে যাই, তীর্থস্থানে যাই। সেখানে যে বিগ্রহ আছেন তাঁর পুজো করি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলতেন অচল বিগ্রহ অর্থাৎ যে বিগ্রহের পুজো করছি সেই বিগ্রহ হয়ত কাঠের তৈরী, মাটির তৈরি, পাথরের তৈরি না হয় কোন ধাতুর তৈরি। তাঁর সেবা করছি, পুজো করছি, কিন্তু তিনি যে আমার সেবা নিচ্ছেন, পুজো নিচ্ছেন, তিনি যে আমার সেবায় তৃপ্ত হচ্ছেন-আমি তার কোন প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি না তাঁর মুখের মধ্যে। কিন্তু ভক্ত তা দেখতে চায়। অবশ্য যথার্থ যে ভক্ত সে দেখে বা দেখতে পায়। কিন্তু সেটা আলাদা কথা। সাধারণের কাছে সে প্রকাশ স্পষ্ট নয়। তাই স্বামীজী বলছেন: তার চেয়ে তোমার সামনে, যে অসংখ্য মানুষরূপী সচল বিগ্রহ রয়েছেন, বিরাট রয়েছেন-এসো আমরা তাঁর সেবা করি। শুধু সেবা নয়, স্বামীজী বললেন, পুজো করি। এখানে নারায়ণ এসেছেন তোমার সামনে, তোমার কাছে সচল বিগ্রহরূপে। তুমি তাঁর সেবা কর, তুমি তাঁর মুখে স্পষ্ট তৃপ্তির প্রকাশ দেখতে পাবে। তিনি যে খুশি হয়েছেন তোমার সেবায় না তুমি নিজের চোখে দেখতে পাবে। এই সচল বিগ্রহ বিভিন্ন রূপে তোমার সামনে রয়েছে। হয়ত মূর্খ রূপে, বুভুক্ষু রূপে, পাপী রূপে। তাদের সকলকেই নারায়ণজ্ঞানে শ্রদ্ধার সঙ্গে, প্রীতির সঙ্গে সেবা কর। করে ধন্য হও। তিনি বলেছেন 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজি ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

স্বামীজী আরও বলেছেন—আমাদের শাস্ত্রে আছে-মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব,

আচার্যদেবো ভব। অর্থাৎ তুমি মাকে দেবীজ্ঞানে সেবা করবে, বাবাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করবে, আচার্যকে—শিক্ষককে দেবতাজ্ঞানে সেবা বরবে। স্বামীজী বললেন-আমি এই সঙ্গে আরও যোগ করব-'দরিদ্রদেবো ভব'-যারা দরিদ্র তাদের তুমি দেবতাজ্ঞানে সেবা কর। 'মূর্খদেবো ভব'-যারা লেখাপড়া শেখেনি, শেখবার সুযোগ পায়নি, তাদের তুমি দেবতাজ্ঞানে সেবা কর। স্বামীজী আরও একটা কথা বলেছিলেন তোমরা, যারা লেখাপড়া শিখেছ বা যাদের লেখাপোড়া শেখার সুযোগ হয়েছে তোমরা যদি তোমাদের প্রতিবেশী অথবা দরিদ্র জনসাধারণের—যারা লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি অথচ যাদের পয়সায় তোমরা লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে তাদের লেখাপড়া শেখবার কোন চেষ্টা যদি তোমারা না কর তাহলে আমি তোমাদের বলব বিশ্বাসঘাতক। আর যার অর্থ শুধু নিজের ভোগের জন্যে রেখে দিয়েছ, শুধু নিজেই ভোগ করছ, আশেপাশের দরিদ্র মানুষের সেবার জন্যে কিছু ব্যয় করছ না-তাকে আমি বলব তস্কর পরস্ব-পহারী। একটা অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গেলেন স্বামীজী। তিনি বলছেন-এটাই প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত, কার্যে রূপায়িত বেদান্ত। বেদান্ত শুধু একটা আদর্শ নয়, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে এবং যদি বাস্তবরূপ দিতে হয় তবে তা এইভাবে রূপ দিতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার হবে এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে। অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধিতে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন, সেই ভগবানের সঙ্গে আমি মিশছি, ব্যবহার করছি, কথা বলছি-তা স্মরণ রেখে আমরা যেন চলি। অনেকের ধারণা যে রামকৃষ্ণ মিশন সমাজসেবা করে। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। সমাজসেবা বলতে যা বোঝায়, রামকৃষ্ণ মিশন সেই অর্থে সমাজসেবা করে না। এই সেবাকাজ-যা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু সন্ন্যাসীরা করছেন—স্কুল-কলেজ চালাচ্ছেন, হাসপাতাল চালাচ্ছেন, লাইব্রেরি চালাচ্ছেন, অনাথ আশ্রম চালাচ্ছেন, খরা-দুর্ভিক্ষ-বন্যায় ত্রাণকার্য পরিচালনা করছেন ইত্যাদি যা কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করছেন, তা তার যে আধ্যাত্মিক জীবন-তারই অঙ্গ। সুতরাং সমাজসেবা বলতে আমরা সাধারণ অর্থে যা বুঝি-এ সেই অর্থে সেবা নয়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা মন্দিরে বিগ্রহের পূজাও করেন সাধন ভজন-ধ্যানধারণাও করেন। তাঁরা যখন আবার হাসপাতালে রোগীর সেবা করেন, বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সেবা করেন অথবা স্কুল কলেজ, লাইব্রেরি বা অনাথ আশ্রমে যেখানে যে কোন কাজই করেন না কেন তাঁরা এই বুদ্ধি নিয়ে তা করবার চেষ্টা করেন যেন তাঁরা ভগবানেরই আরাধনা করছেন। যেখানে যেমন প্রয়োজন, যেমন উচিত, তেমনই তাঁরা করছেন-যেমন কোথাও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন, দেশের মানুষকে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দিচ্ছেন, আবার কোথাও ওষুধ দিচ্ছেন, শিক্ষা বিতরণ করছেন, ত্রাণের কাজ করছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও এভাবেই সেবা-কার্য করেছেন। কিন্তু সবটাই বিতরণ করছেন সেবার দৃষ্টি নিয়ে, উপাসনার দৃষ্টিতে আগে সন্ন্যাসীরা আত্মমুক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত হতেন। তাঁরা যেমন ধ্যান-ভজন করেন, যেমন পূজা-অর্চনা করেন তাঁদের কাছে এও ঠিক তাই-এও পূজা-ঈশ্বরের উপাসনা। শুধু কর্ম নয়-কর্মযোগ। সূচনাপর্বে এবং তারপরেও বহুকাল সনাতনপন্থী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির কাছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসী বলেই গণ্য হতেন না। তাঁরা ছিলেন অচ্ছুৎ, অপাংক্তেয়-'ভাঙ্গী সাধু।' কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় ও তাঁর আত্মদৃষ্টিতে দেখেছিলেন ভারতবর্ষের সন্ন্যাস-আদর্শের ভাবীরূপ ও গতিকে যা হবে যুগোপযোগী, যা হবে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মক্ষেত্রে এক নতুন আলোকস্তম্ভ। আজ সেই আলোকস্তম্ভের আলো ক্রমাগত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। আলোকিত করছে অন্ধকারের বিশাল ছায়াকে। □

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা ও তার রূপায়ণ

স্বামী অনঘানন্দ

ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে চলেছে জ্ঞানের চর্চা। সেই জ্ঞান এসেছে শিক্ষার মাধ্যমে, সাধনার মাধ্যমে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের আর্য ঋষিগণ অনাদিকাল থেকেই তাঁদের উপলব্ধির সত্যতাকে বিলিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে। আর্য ঋষিগণের সেই পথ ধরেই গৌতম বুদ্ধ, গুরুনানক, শ্রীচৈতন্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ প্রমুখ লোকশিক্ষকগণ এসেছেন। এই ধারার না হলেও শিক্ষা চিন্তার বিস্তৃত পরীক্ষা নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই স্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা বিষয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তার মূল্য একালে তো বটেই, সর্বকালেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শিক্ষা চিন্তার আলোকে বর্তমান কালে বিদ্যালয় গুলিতে এর রূপায়ণ কতখানি গুরুত্ব পেতে পারে, সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

এ কথা ঠিক, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথাগত অর্থে শিক্ষক ছিলেন না। তাঁর রচনাবলীর নানা অংশে বিক্ষিপ্তভাবে যেসব শিক্ষাপ্রসঙ্গ পাই, তা পড়ে আমাদের বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, স্বামীজী শিক্ষা নিয়ে কী বিপুল চিন্তা ভাবনা করেছেন। তিনি শিক্ষা নিয়ে ভেবেছিলেন, বুঝেছিলেন জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি। স্বামীজী এক পত্রে লিখছেন, "ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষা বলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন।"

এই উক্তি থেকেই আমরা বিবেকানন্দের চিন্তার অনেকটা কাছাকাছি আসতে পারি। শিক্ষা মূলত আচরণের। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আত্মপ্রত্যয়, সহানুভূতিবোধ, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, কর্তব্যপরায়ণতা। এই শিক্ষার আলোকেই আমরা স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা ও বিদ্যালয়ে এর রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা করব।

শিক্ষা অর্থে স্বামীজী বুঝেছিলেন, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা আছে, যে অনন্ত সম্ভাবনাময় শক্তি আছে, তারই বিকাশ। এই বিকাশ আত্মশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে সমাজের কল্যাণ আনে। এই দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল সূত্রগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর শিক্ষা চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে চিত্তের সংযম ও একাগ্রতা, পরানুকরণ নয়—স্বীকরণ, চরিত্র-গঠন, সৎ অভ্যাস অনুশীলন, মুক্ত যুক্তি বুদ্ধির চর্চা, জাতীয় ভাব ও দেশপ্রেমের শিক্ষা, মানুষ গড়ার শিক্ষা, নারী শিক্ষা, গণশিক্ষা, ধর্ম বোধের শিক্ষা, সহানুভূতির শিক্ষা, অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা। এগুলি আলাদা আলাদা ভাবে বলা হলেও প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির পরিপূরক এবং দেশকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচীনকালের মত গুরুকুল শিক্ষা।

যে কোন জিনিষ লাভের অন্যতম উপায় চিত্তসংযম ও একাগ্রতা। গুরুত্ব দিয়েছিলেন চরিত্রগঠনের উপর। চরিত্রই নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের জীবন ধারাকে। দৃঢ়তা, ত্যাগ, সংযম, সৌজন্য, বিনয়, দয়া, মায়া, স্নেহ ভালোবাসা, সহনশীলতা—সবই নির্ভর করে চরিত্রের উপর। এর অভাবেই লোকে আত্মবিশ্বাস হারায়, পরানুকরণে ও অকাজে সময় নষ্ট করে। পরানুকরণকে তিনি নিন্দা করেছেন, কিন্তু অপরের ভাল কিছুকে গ্রহণ করে স্বীকরণের দ্বারা আমাদের জীবনকে নতুন পথে প্রবাহিত করার বিষয়টিকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা তার বিত্ত-বিলাসের মোহ নিয়ে অহরহ আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। এর হাত থেকে মুক্তি প্রয়োজন। বাল্যকাল থেকে সৎ অভ্যাস অনুশীলন আর মনের বিকাশকে সঠিক পথে চালনার মধ্য দিয়ে এই মোহ প্রশ্রয় পেতে পারে না। তাই তিনি দেহ চর্চার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে সুস্থদেহের সঙ্গে সুস্থ মনও জন্ম নেবে।

'ধর্ম' শব্দটির অর্থ যা-ই হোক্ না কেন, ধর্মকে নিয়ে যে গ্লানিকর, পীড়াদায়ক অমানবিক ঘটনা প্রায়শই ঘটে, তার তীব্র নিন্দা করে বিবেকানন্দ সংস্কার মুক্ত মানবিক ধর্মের বিকাশ চেয়েছেন। তাই বলেছেন, ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে ধর্মকে অবলম্বন করে তার শক্তি পেয়েছে। সেই ধর্মের পথেই ভারতকে চালিত করে এর উন্নতি ঘটাতে হবে। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ধর্মশিক্ষার উপর। এর সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার যোগ অঙ্গাঙ্গী। এই সূত্রে তাঁর স্বাজাত্য বোধ তথা দেশপ্রেমের বিষয়টি শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত।

বিদেশে দেখেছেন, সবকিছু উন্নতির মূলে কারণ শিক্ষা। তা যেমন বিজ্ঞান শিক্ষা, তেমনি স্বামীজী বলেছেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দরকার। এর সঙ্গে তিনি নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র তাঁদের জন্য পুঁথিগত শিক্ষার কথা বলেননি, রন্ধন বিদ্যার শিক্ষা, সূচীশিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সন্তান পালনের শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এঁরাই তো জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তুলবেন। একই সঙ্গে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন গণশিক্ষাকে। সব সাধারণের শিক্ষাকে তিনি অবশ্য প্রয়োজনীয় মানেন। এর ফলে ঐক্যবোধ ভ্রাতৃত্ববোধ, অসাম্প্রদায়িক বোধ জেগে উঠবে, আর দেশের প্রতি জন্মাবে ঐকান্তিক ভালোবাসা। তাই গণশিক্ষার গুরুত্ব তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষকে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য এবং দেশের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসাবশতঃ।

স্বামীজীর শিক্ষা ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে মানুষ গড়ার শিক্ষা। এ শিক্ষা দেবেন শিক্ষক। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, যে সুপ্ত শক্তি আছে তারই স্ফুরণ ঘটাবেন শিক্ষক। শিক্ষকরা হবেন সৎ, চরিত্রবান, কর্তব্যনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ। শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্দীপিত করে তুলবেন এবং সেগুলির বিকাশের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির কল্যাণ তথা দেশের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। তা স্বামীজীর কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে ছিল, সেকথা তাঁর রচনারাজির বহু লেখায় দেখতে পাই।—শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত ভাষা শিক্ষার বিষয়টিও। এ ব্যাপারেও স্বামীজীর নিজস্ব একটি চিন্তা ছিল। তিনি কেবলমাত্র মাতৃভাষা নিয়ে ভাবেননি। জনশিক্ষা বা গণশিক্ষার বাহন হিসাবে ভাষা হিসেবে মাতৃভাষাকে প্রথম স্থান দিতে চান। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য ইংরাজী ভাষা এবং ওজঃশক্তি ও জাতির গৌরব রক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষাকেও গুরুত্ব দিয়ে ত্রিভাষা শিক্ষার পক্ষপাতী।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বিদ্যালয় গুলতে এগুলির রূপায়ণ কতখানি সম্ভব, তা নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি। এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, একজন মানুষের শিক্ষাই তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। এর প্রভাবেই ব্যক্তি জীবন সুন্দর ও বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।—এই শিক্ষার প্রাথমিক কেন্দ্র হল আমাদের পরিবার ও বিদ্যালয়।

স্বামীজীর চিন্তায় সৎ অভ্যাস অনুশীলন, শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন, চরিত্র গঠন, মুক্তি ও

মুক্তিবাদী মনের উন্মোচন, নৈতিক শিক্ষা, শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা, আত্মবিশ্বাস, দেশাত্মবোধ, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে সহানুভূতির বিস্তার, ধর্মবোধের শিক্ষা। স্কুলে এসব শিক্ষা দেওয়া বাস্তব কারণ স্কুল জীবনের প্রতিটি স্তর ও দৈনন্দিন রুটিনের সঙ্গে, আচার-আচরণ ও পঠন-পাঠনের সঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলি জড়িত। শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শবান হবেন। তবে তাঁর ছাত্রদের সৎ অভ্যাস, সততা, চরিত্রগঠন ও যুক্তিবাদী মন তৈরিতে সহায়তা করতে পারবেন। আদর্শ ও ন্যায় পরায়ণ, সৎ, বিবেকবান—সহানুভূতি প্রবণ শিক্ষক নিজের যোগ্যতাগুণে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। এবোধ অজানিতে ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত হয়। তখন তাদের কাছে শ্রদ্ধার ভাব আপনা আপনি যেমন জন্মে, তেমনি, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা অন্তরে জাগিয়ে তোলেন শিক্ষক। এরূপ ধরণের শিক্ষক বর্তমান কালে পাওয়া যায় না। কিছু সংখ্যক মাত্র এরূপ শিক্ষক আছেন। সব সময় শিক্ষকরা এ বিষয়ে মনোযোগও দেন না। তাঁদের পরীক্ষার ফলের উপর দৃষ্টি বেশী। ছাত্রদের চরিত্র গঠনের দিকে বেশী নজর দেন না। এমনকি নীতি ও ভারতীয় কৃষ্টি বিষয়ে শিক্ষকের অভাব খুব বেশী। এগুলির মধ্য দিয়ে সৎ অভ্যাস, নৈতিক জ্ঞান ও কর্তব্যবোধ আপনা আপনি সঞ্চারিত হতে পারে। বিদ্যালয়ে জাতীয় প্রেরণামূলক দিনগুলি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের দেশাত্মবোধ গড়ে ওঠে। নানা কাজের দায়িত্ব পেয়ে এবং সেগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস জেগে উঠে। পারস্পরিক মেলামেশায়, প্রতিদিনের যোগাযোগে নানা সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে এক প্রীতির ভাব গড়ে ওঠে। ক্লাস করা, খেলাধুলো, সাহিত্যচর্চা, একসঙ্গে চলাফেরার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক যে অসাম্প্রদায়িক বোধ ও হৃদ্যভাব গড়ে ওঠে, তা জীবনেও প্রভাবিত হয়। ফলে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার মূল বিনষ্ট হয়।' এগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ধর্মশিক্ষাও জড়িত। ধর্মের আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য যে গোঁড়ামী নয়, হৃদয়হীন অনুষ্ঠান মাত্র নয়, কতকগুলি কুসংস্কারের অনুসরণমাত্র নয়—তা যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বিচার করে ছাত্রদের মনকে প্রথম থেকেই গড়ে তুললে ধর্মের আসল তাৎপর্য বুঝতে পারবে। 'ধর্ম'-কথার বা শব্দের ফুলঝুরি না হয়ে, আচরণের যে শ্রেষ্ঠ দিক, তার অনুভব ছাত্ররা উপলব্ধি করলে জীবনে আর ধর্ম নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে না বা দেশেও এ নিয়ে সমস্যার অবশেষও থাকবে না। এভাবে স্বামীজী চিন্তিত শিক্ষা-ভাবনা বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে যদি দিতে পারা যায়, তবে তাঁর ধ্যানের ভারত আবার যথার্থই সুসন্তানে ভরে উঠে গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে পারবে। □

বিবেকানন্দের চিন্তায় নারীকল্যাণ, বর্তমান সমাজ ও আইন

প্রশান্ত সিংহ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মানসপুত্র বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গৈরিক বসন ধারণ করে সংসার ত্যাগ করলেও জীবনকে অস্বীকার করেননি। ভারতের সাধক বা সন্ন্যাসীবৃন্দের জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁদের সাধনপথের অন্তরায় রূপে দেখে এসেছেন নারীজাতিকে এবং ঠিক সেই কারণেই পরিহার করেছেন নারীকে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে পাই অন্য এক ধরনের চরিত্র,—অদ্বৈত বেদান্তবাদী স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্রই ছিল 'সেবা' বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষাহীনা সামাজিক কুসংস্কারে অত্যাচারিতা নারী-সমাজের উন্নতির জন্যে, কল্যাণের জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। বারবার বলেছেন "নারীজাতির উন্নতি ও জনগণের জাগরণ—এই দুটিরই প্রয়োজন সর্বপ্রথম এবং তখনই কেবল দেশের, ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে।" ভগিনী নিবেদিতাও বলেছেন যে তাঁর গুরু সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শাশ্বত মহাব্রত হয় নারী ও জনগণের জন্যে প্রাণপাত করা। তিনি চিন্তা করেছেন নারীজাতি সম্পর্কে উপলব্ধি করেছেন নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবন সমান তবে উন্নত না হলে কোন দেশ বা জাতির সঠিক উন্নতি সম্ভব নয়। শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ নারীর সন্ধান পেয়েছিলেন তা বলা বাহুল্য। বলেছিলেন—"শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় নারী জাগরণের উদ্বোধন ঘটবে…" সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি তাই ব্যক্তিজীবনে নারীর কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করলেও পরম শ্রদ্ধার সাথে নারী কল্যাণের কথা ভেবেছেন, বলেছেন—"জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতীর অভ্যুদয় না হইলে সম্ভবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নাই।" শ্রীমা সারদাকে স্বামীজী দুর্গা জ্ঞানে তাঁর এক গুরু ভ্রাতাকে লিখেছিলেন, "মা ঠাকুরণ কি বস্তু বুঝতে পারনি ; এখনও কেহই পারে নাই, ক্রমে পারবে…মা ঠাকরুণ ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী ভারতে জন্মাবে।" স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্যে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে—বাল্যবিবাহের অবসান ও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজী স্বতন্ত্র পাঠক্রম নির্দেশ করে বলেছিলেন "ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার করতে হবে।…ধর্ম শিক্ষা চরিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপন—এ জন্য শিক্ষার দরকার।"[১]

স্বামীজীর মতে ধর্ম, শাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইতিহাস ও ইংরেজী এবং সেই সাথে থাকবে নানান ধর্মের শিক্ষা যেমন—সেলাই, রন্ধন, সাংসারিক কাজকর্ম ইত্যাদি আবশ্যকীয় কিছু শিক্ষা মহিলাদের জন্য আলাদা মঠ তৈরী করে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তোমরা নারীগণকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়িয়ে দাও।

তারপর তাহারাই বলিবে কোন জাতীয় সংস্কার তাহাদের পথে আবশ্যক।"[২] আরও বলেছেন "নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতেই হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।"[৩] তাহলে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীজাতিকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন যাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের প্রসরতা বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি, চেতনা বিকশিত হয়ে, নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়তে পারে। ভারতীয় নারীকে তিনি প্রকৃতই স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর শরীর চলে গেছে ৮৫ বছর আগে এবং প্রায় ১০০ বছর আগে স্বামীজীর নারী কল্যাণ সম্পর্কীয় চিন্তা বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের সামনে এসেছে, দেশ স্বাধীনও হয়েছে বছর ৪০ আগে। আজকে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে প্রশ্ন জাগছে নারী কল্যাণ সম্পর্কে স্বামীজীর চিন্তা, ভাবনা ও পরিকল্পনা আমরা কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি।

আমরা জেনেছি মূলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্ঠায় বিধবা বিবাহ আইন[৪] পাস হয়েছিল এবং বাল্য বিধবাদের শোচনীয় পরিস্থিতি দেখেই এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তিনি বিধবা বিবাহ আইন পাস করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেখতে পাই স্বামীজী একা সমর্থন করলেও সব সমস্যার সমাধান হবে বলে মেনে নিতে পারেননি। স্বামীজী বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন এবং স্বামীজীর জীবনী থেকেও জানা যায় যে স্বামীজীর বাবা ও মা এই বিধবা বিয়ে সমর্থন করেছিলেন আন্তরিক ভাবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীজী কিন্তু বিধবা পুণর্বিবাহের অধিকার পেলেই যে তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে স্বীকার করেন নি। "স্বামীজীর সামাজিক শিক্ষার মূল কথা আত্মশক্তি। নিজের সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হবে। পুরুষেরা ধরে-ধরে বিধবাদের বিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে যেখানে অনেক সংস্কারকেই এই বিশ্বাস, সেখানে বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন —যদি হৃদয়বান পুরুষেরা শিক্ষা দিয়ে বিধবাদের এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন, যাতে বিধবারা নিজেরাই ঠিক করতে পারবে বিয়ে করবে কি করবে না তখনই সমস্যার সঠিক সমাধান হবে।"[৫] বিধবা বিয়ে আইন পাস হওয়ার পরেও দেখতে পাই বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে এবং নিজের টাকা দিয়ে কয়েকজন বিধবার বিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় শংকরীপ্রসাদ বসুর বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে ৩য় খণ্ডে পেয়েছি…"আইনগত সাফল্য সত্ত্বেও এই আন্দোলন বাস্তবে ব্যর্থই হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাসের পরবর্ত্তী ৪৪ বৎসরে সারা ভারতে মাত্র ৩০০ টি বিধবা বিবাহ হয়েছিল বলে ১৯০০ খৃঃ-এ রানাডে হিসেব দিয়েছিলেন[৬]।" বিবেকানন্দ নারীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তাও বোধহয় বিস্তার লাভ করতে পারেনি আর করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য বলে মনে হয়। ভারতে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের চিত্রটি বড়ই করুণ। মা সারদার কথায় আসি—জনৈক স্ত্রী ভক্তকে মা বলেছিলেন—"বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দাও—লেখাপড়া শিখবে। বেশ থাকবে।" নারী মুক্তির ব্যাপারে মা সে যুগেও কতটা সচেতন ছিলেন তা ভেবে অবাক হতে হয়। আবার দেখেছি বাল্য বিধবা ক্ষীরোদ বালাকে মা বলছেন "বাছা অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি আর করনা। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলেছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে মা?"[৭] অন্ধ কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছেন মা জীবনকে—শিক্ষা দিয়েছে স্বাবলম্বী হতে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে কিন্তু বিবেকানন্দ ও মা সারদার শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার সুযোগ এখনও আমাদের আসেনি বললে ভুল বলা হবে না। বিধবা বিয়ের উপর স্বামীজী খুব একটা জোর না দিয়ে এর মূলে আঘাত করার জন্যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে। Child Marriage Restraint Act পাস হয় ১৯২৯ সালে বহু

তর্ক বিতর্কের পর এবং স্বামীজীর শরীর চলে যাবার প্রায় ২৭ বছর পর—সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর বয়স ১৪ এবং পুরুষের ১৮ বছর করা হয়। ১৯৪৯ সালে ঐ আইন সংশোধন করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়স বাড়িয়ে ১৫ বছর করা হয় এবং তারও পরে ১৯৭৮ সালে ঐ আইন পুনরায় সংশোধন করা হয়। সংশোধনের আগে Statement of object and Reasons এ বলা হয়…"The question of increasing the minimum age of marriage for males and females has been considered in the present context when there is an urgent need to check the growth of population in the country…"তাহলে সংশোধনের পর দেখা যাচ্ছে—Child means a person who if a male, has not completed twenty one years of age, and if a female, has not completed eighteen years of age[৮] ঐ আইনের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে—১৮ বছরে বেশী কিন্তু ২১ বছরের কম কোন পুরুষ যদি কোন নাবালিকাকে বিয়ে করে তবে তার ১৫ দিন পর্যন্ত জেল অথবা ১৮০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি একই সাথে হতে পারে[৯]। ৪নং ধারা—যদি ২১ বছরের বেশী কোন পুরুষ যদি ১৮ বছরের কম বয়সী কোন মহিলাকে বিয়ে করে তবে তার ৩ মাস পর্যন্ত জেল ও সেই সঙ্গে জরিমানা হতে পারে।[১০]

See. 5. Punishment for solemnising a child marriage—অর্থাৎ যাঁদের দ্বারা (পুরোহিত নাপিত) ঐ ধরনের বিয়ে হচ্ছে বা যাঁরা ঘটকালি করছেন তাঁদেরও ৩ মাস পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হতে পারে।

See. 6.—Punishmant for parent or guardian concerned in a child marriage অর্থাৎ বাবা মা অথবা অভিভাবকেরও ৩ মাস পর্যন্ত জেল নয় জরিমানা হতে পারে[১১] আসলে স্বামীজীর ভারতে শতকরা ১০/১১ জন শিক্ষিত ছিল, মেয়েদের মধ্যে আরও কম। আজ প্রায় ১০০ বছর পরে শিক্ষিতের হার বেড়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি যথেষ্ট? শহরের মানুষ শিক্ষার আলো কিছুটা পেয়েছে কিন্তু সেখানেও অল্প বয়সে বিয়ে যে একেবারেই নেই ও কথা বললে ভুল বলা হবে। আর গ্রামের কথা বলতে বাধা নেই যে আগের তুলনায় কম হলেও এখনও ওই প্রথা সমানে চলছে—যদিও এর বিরুদ্ধে আইন রয়েছে। আর আইন আছে কি নেই সে ধ্যান ধারণাও গ্রামের মানুষদের মধ্যে নেই। গ্রামীণ ভারতবর্ষ ও তার উন্নয়ন সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা কি—'আহা দেশে গরীব দুঃখীর জন্যে কেউ ভাবে নারে! যারা জাতের মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে…তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয় দেশে এমন কেউ নেইরে।… এরা না উঠলে মা জাগাবেন না।…সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোন দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস?"[১২] গ্রামের চিত্রটি এখানেও বড় করে লক্ষ্য রাখতে হবে। child marriage restraint Act এর সংশোধনী বিলের খসড়া প্রস্তুত কালে মাননীয় আইন প্রস্তুতকারীদের উদ্দেশ্য ছিল "To cheek the growth of populahen of the country."—অর্থাৎ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ রূপ দেখে বাধ্য হয়েই যেন ঐ আইন কিছুটা সংশোধন করে বিয়ের বয়স কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আইনের কোন প্রয়োজনীতা ছিল না যদি দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার লাভ করতো, প্রয়োজনীয়তা ছিল না যদি দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের চেতনার শ্রীবৃদ্ধি হতো। প্রকৃত শিক্ষার আলো আজও ভারতের গ্রামে পেঁছায়নি এবং গ্রামের মেয়েরা আজও নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি। আইন রয়েছে—আর সে আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত কিন্তু তার প্রতিবিধান হচ্ছে কি? কোন মামলা দায়ের হচ্ছে কি অভিভাবকদের বিরুদ্ধে, নাবালক ছেলে মেয়েদের বিরুদ্ধে—যারা জেনে বা না জেনে আইন লঙ্ঘন করছে। গত ১৫ বছরে একটা মহকুমা শহরে যেখানে কম করে ৮।১০ হাজার বেআইনী বিয়ে হয়েছে যেখানে সেখানে মাত্র ২টো মামলা দায়ের হয়েছে। এখানেও সেই প্রশ্ন শিক্ষা বা চেতনার অভাব। কিংবা শতাব্দীর শেষ প্রান্তে নারী প্রগতি, নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার নিয়ে

নানা আন্দোলন চলছে এবং সংগ্রাম বা আন্দোলনের ফলে হয়তো মেয়েরা আইনগত ভাবে কিছু অধিকার আদায় করে নিতে পেরেছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিছু শহুরে বা আধাশহুরে মেয়েদের ক্ষেত্রেই কি ঐসব প্রযোয্য ? প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে ঐসব অধিকার গুলো সম্পর্কে গ্রামের মেয়েদের অবহিত করার ব্যবস্থা করে তাদের স্বাবলম্বী হতে না শেখালে এর মূল্য কোথায় ? Dowry prohibitin Act অর্থাৎ পণপ্রথা বিরোধী আইন পাস হয়েছে ১৯৩১ সালে কিন্তু সে আইনের মর্যাদা কতটুকু রাখতে পেরেছি ? সেখানে উল্লেখ হয়েছে—

See. 2—Definition of "Dowry" Act—In th's Act, 'dowry' means any property of valuable security given or agreed be given either directly or indirectly

(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage ; or

(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person ; at or before or after the marriage in connection with the marriage of the said partees..." ১৯৬১ সালে এই আইনে See. 2 এর Explanation I—এ বলা হয়েছিল—For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties. অবশ্য ১৯৮৪ সালে সংশোধন করে Explanation—I কে বাদ দেওয়া হয়। সংশোধনের পরে যা আমাদের সামনে এসেছে তা হচ্ছে See. 3 (2)—Nothing in sub Sec.(1) shall apply to, or in relations to—(a) presents which are given at the time of a marriage to the bride (without any demand having been made in that behalf) (b) presents which are given at the time of a marriage to the bride-groom (without any demand having been made in that behalf.) প্রশ্ন হচ্ছে প্রমাণ করা যাবে কি ভাবে যে ওটা 'উপহার' 'পণ' নয় ? আর ওটা যে 'পণ' তা প্রমাণের দায়িত্ব কিন্তু অনেকাংশে যারা 'পণ' দিয়েছেন তাঁদের ওপর। উল্লেখ করা যেতে পারে পণ দেওয়া ও নেওয়া আইন বিরুদ্ধ—

Sec 3 (1) If any person, after the commencement of this act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, be shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, and with fine which may extend to ten thousand rupees or the amount of the value of such dowry, whichever is more. ছেলে বা মেয়েদেরই রুখে দাঁড়াতে হবে এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে। আইন আছে থাক—কিন্তু প্রথমেই প্রয়োজন গণ শিক্ষা ও গণ চেতনা। "পণ দেবো না"—"পণ নেবো না"—এই শ্লোগানে আন্দোলন চলছে। দুঃখের বিষয় বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিদিনের খবরের কাগজ তার প্রমাণ। মেয়েরা জ্বলছে ঘরে ঘরে। লক্ষ্য করার বিষয় একজন মেয়ের সর্বনাশের মূলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অপর এক মহিলার ভূমিকা রয়েছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে। ক'জন বাবা মা নিজের মেয়েকে স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দিয়েছে ? ভাবতেও অবাক লাগে উনবিংশ শতাব্দীর একজন গ্রাম্য প্রায় অশিক্ষিতা মহিলা যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসেও

আমাদের সেই মানসিকতা আসেনি। নারী মুক্তির যে দরজা সেদিন মা সারদা খুলে দিয়ে পথ দেখিয়েছিলেন আজও সে দরজা দিয়ে বেড়িয়ে আসার সাহস অবলম্বন করে উঠতে পারেননি আমাদের মা বোনেরা।

বিয়ের পরে স্বামী ভক্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের দাবী ন্যায্য বলে মেনে নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব আইনে স্বীকৃতি দিয়েছিল আগেই এবং সেই সাথে Criminal Procedure Code এর ৪৮৮ নং ধারার বিধান অনুযায়ীও স্ত্রী ভরণপোষণের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে দরখাস্ত দিতে পারতেন। পরবর্তীতে Criminal procedure Code সংশোধনে করা হয় ১৯৭৪ সালে তার এই সংশোধনের পর মেয়েদের অধিকার আরও জোরদার হলো। See. 125-এ বলা হয়েছে—

If any peison having sufficient means neglects or refuses to maintain— (a) his wife, unable to maintain herself or (b) …… (c) …… (d) his father or mother, unable to maintain himself or herself,—a magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife, or such child, father or mother, at such monthly rate not exceeding five hundred rupees in the whcle…… মা, বাবার প্রতি কর্তব্যও এতদিনে "legal duty-তে পরিণত হলো। নিঃসন্দেহে এটা একটা শুভ উদ্যোগ। কিন্তু কথা হচ্ছে যে আইনগুলো সম্পর্কে গাঁয়ে গঞ্জে সবার মধ্যে ব্যাপক প্রচারের দায়িত্বও তো আমাদের। বলা বাহুল্য সে ধরনের প্রচার নেই। আরও হচ্ছে ছেলের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতে ক'জন ভারতীয় মা এগিয়ে যাবেন? আইন পাস হবার পর থেকে একটা মহকুমা আদালতে মাত্র ১টি মামলা দায়ের হয়েছিল তার তাও মায়ের ইচ্ছেতেই মামলাটা তুলে নেওয়া হয়। চোখের জল মুছতে মুছতে সেদিন সেই মা বলেছিলেন, "থাক্ বাবা, ছেলেই সুখে থাক্ ভগবানের ইচ্ছেতে আমার চলে যাবে কোনরকমে।" প্রকৃত শিক্ষার আলোয় যদি আমরা বেড়ে উঠতে পারতাম তবে আমাদের মায়েদের ঐ ধরনের উক্তি করতে হতো না; আইনেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু বিবাহ বিচ্ছিন্ন স্ত্রী বা স্বামীর দ্বারা অবহেলিতা স্ত্রীরা (হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়) অনেক এগিয়ে গেছেন। একটা বছরের হিসেব দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। গত ১৯৮৬ সালে একটা মহকুমার ফৌজদারী আদালতে বিভিন্ন ধারায় যেখানে মামলা দায়ের হয়েছে প্রায় ৭০০ সেখানে ১২৫ ধারা অনুযায়ী বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৫২২ এবং এর মধ্যে ৬।৭টা সন্তানের জননীও রয়েছেন। ব্যাপক প্রকার ব্যবস্থা হতো এবং গ্রামের মেয়েরা ঐ আইন সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন আর সেই সাথে প্রয়োজনে সময় মতো 'legal aid' (বর্তমানে পঃ বঃ সরকার তথা ভারত সরকার দুঃস্থ ব্যক্তিদের legal aid দিচ্ছেন) পেতেন তবে ঐ ধারা অনুযায়ী মামলার সংখ্যা ৪ গুণ বেড়ে যেতো সন্দেহ নেই। পুনরায় বিয়ে করা না পর্যন্ত কোন মহিলা 'স্ত্রী'-সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। দম্পতি হিন্দু বা মুসলমান খ্রীষ্টান, পার্শী, অন্যধর্মী বা ধর্মবোধহীন এইসব প্রশ্ন এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কারণটা মৌলিক। যেহেতু ১২৫ ধারা criminal proceducre code-এর অংশ। দেওয়ানী বা civil আইনের নয়। অবহেলিতা স্ত্রী, সন্তান বা জনক-জননীর ধর্মে কিছু এসে যায় না বা সে অবান্তর এবং সে-দায় বলা চলে যে ১২৫ ধারা ধর্ম নিরপেক্ষ। আবার if a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife's refusal to live with him. মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের শাহাবানু মামলার বিষয়ে অনেকেই অবগত আছেন। মহামান্য আদালত শাহাবানুর পক্ষে রায় দেবার পর কিছু প্রাচীনপন্থী মুসলমান এই রায়ের বিরোধিতা করে বলেন যে এই রায় মুসলিমদের ব্যক্তিগত (personal law) আইনের পরিপন্থী এবং ধর্ম বিরোধী। ১৯৮৬ সালে

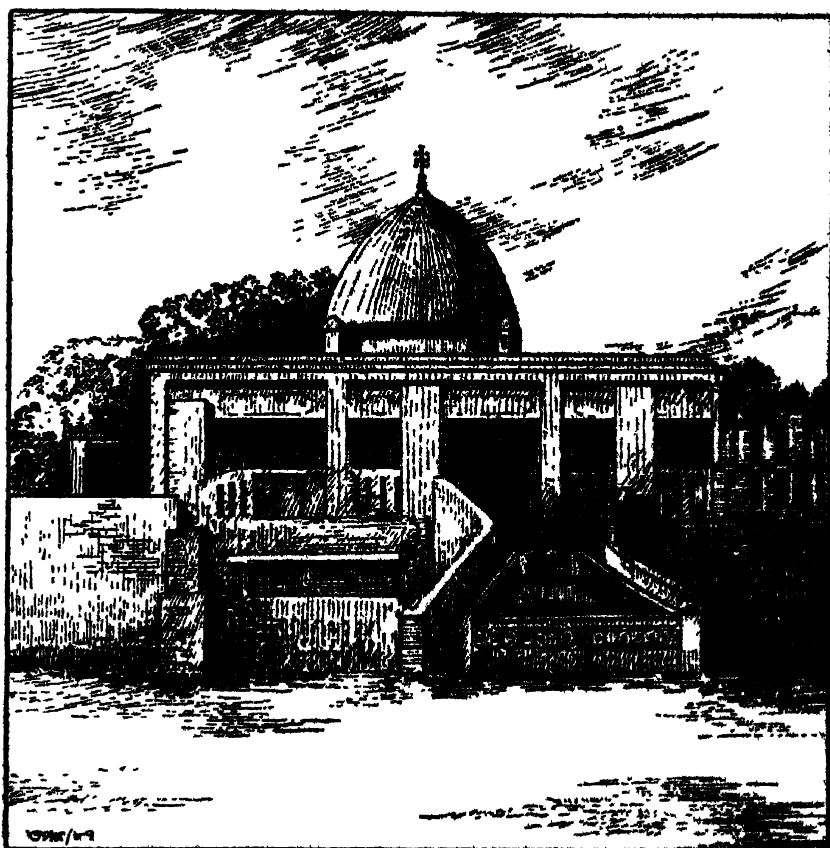
The Muslim women (Protection of Rights on Divorce) Act পাস হয়েছে এবং ঐ আইনে 'ইদ্দত' বা তিন ঋতুকাল পর্যন্ত মেয়েরা ভরণপোষণের দাবী করতে পারেন। তাহলে ঐ ইদ্দতের পরে তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলাদের ভরণপোষণের ভার কার ওপর বর্তাবে ? বর্তাবে তাদের ওপর যারা ঐ মহিলার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির অধিকারী হবেন। তারা যদি না পারেন তবে 'ওয়াকফ' বোর্ড দেবেন। বাস্তবে কি ওটা সম্ভব হবে ? জানিনা। জানিনা বর্তমান আইন মুসলিম মহিলাদের অধিকার রক্ষায় কতটুকু সাহায্য করল! তবে একথা বলা চলে যে Criminal Procedure Code-এর ১২৫ ধারায় যে সুযোগ সুবিধাগুলো তাঁরা পেয়েছিলেন তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। শাহাবানু মামলায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর শ্রীডানিয়াল লতিফ (সিনিয়র এ্যাডভোকেট এবং সর্বভারতীয় আইনজীবী সংস্থার সভাপতি) বলেছিলেন, "The Indian Muslim and the public at large should be greatful to the supreme court for restoring the Holy Quran to its rightful place of pre-eminence as the source and foundation of the Muslim personal Law. The provisions of the Holy Quran do not conflit with advancement of the rights of women." এবং আরও বললেন···It is reported that much of the cacophany against the supreme Court's judgement has been financed by the "Gulf Barous" newly rich Indian Muslims who have made fortunes in the Gulf and west Asia, and have abandoned their former wives for younger women. They are, naturally upset at the idea of paying manitenance, which they can well afford, to Their abandoned wives. According to the doctrine of the Muslim law, the ultimate authority on Earth rests with the Ijmaa ul ummat—the consensus of humanity. The battle for this, which may truly be called 'jehad' continues. This will, assuredly, support the judgement of the supreme court in shah Bano's case."

Women's Liberation Movement চলছে, কিন্তু বর্তমান ভারতের নারীসমাজ এখনও পুরুষের সাহায্য ছাড়া জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার সামর্থ বা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নি বা আত্মনির্ভরশীলা হয়ে উঠতে পারেননি। বিবেকানন্দের বাণী "নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।"[১৩] আমরা সেই যোগ্যতা অর্জন করানোর দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালন করতে পারিনি বলেই হাজার হাজার শাহাবানু আজও আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন বা হচ্ছেন আইনগত অধিকারের দাবী নিয়ে। সেই 'স্ত্রী'-ই criminal procedure code এর ১২৫ ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত করতে পারেন যিনি "unable to maintain herself"—হাজার হাজার শাহাবানু নিশ্চয়ই নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা ও শক্তি অর্জন করতে পারেননি আজও—যদি পারতেন তাহলে ঐ ধারা তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতোনা বা প্রয়োজনও থাকতো না। দেশের সমস্যা সমাধানের জন্যে আইন হচ্ছে হোক,—অনেক সময়ে এর প্রয়োজনীয়তাও হয়তো আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শিক্ষার বিস্তার। স্বামীজী বলেছেন "এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।" ☐

☐ প্রসঙ্গ সূত্র পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গ সূত্র ঃ

১. বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫
২. বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২২১
৩. বাণীও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯
৪. Hindu widow's remarriage Act 1856
৫. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, পৃষ্ঠা-২৫৯
৬. ঐ, পৃঃ ২৫৭
৭. শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৭৪
৮. See2 (a)
৯. Whoever, being a male above eighteen years of age and below twenty-one, contsant a child marriage shall be punishable imprisonment which may extend to fifteen days, or with fine with simple which may extend to one thousand rupees, or with both See. 3.
১০. whoever, being a male above twenty-one years of age, contracts a child marriage shall be punishabie with simple imprisonment which may extend to three months and shall also be leable to fine. See. 4.
১১. Provided that no woman shall be punishable imprisonment.
১২. বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫
১৩. বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯



□ প্রসঙ্গ : আশ্রমিকী ও বিজ্ঞাপন পর্ব



আশ্রমের মন্দিরের অভ্যন্তরে



ভক্ত সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক



যুব সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজমঞ্চে উপবিষ্ট শ্রীমৎ স্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজ। শ্রীমৎ স্বামী অনন্তানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অনঘানন্দজী মহারাজ





শ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম আবির্ভাব বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব প্রাঙ্গণের মূল মঞ্চে আলোচনা সভায় বক্তৃতা করছেন ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রীমৎ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী মহারাজ, সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ড. তাপস বসু, শ্রীমৎ স্বামী কমলেশানন্দজী মহারাজ



শ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে চিত্র প্রদর্শনী মণ্ডপের একাংশ



শ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় মণ্ডপের একাংশ



শ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম আবির্ভাব বার্ষিকীতে আয়োজিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি ঃ অর্ধশতাব্দীর প্রেক্ষিত জুড়ে

গৌরগোপাল সাহা

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তদানীন্তন নবদ্বীপের কতিপয় ভক্ত ও সেবকবৃন্দের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী বর্ষে বাংলা ১৩৪৩ সালে, শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে এই সমিতির শুভ সূচনা। গোকুলানন্দ ঘাট রোডের এক ভাড়া বাড়িকে কেন্দ্র করে এই সমিতির যাত্রা শুরু। রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মায়ের মন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নবদ্বীপ ধাম পরিদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নবদ্বীপের ঘাটে নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রেমের রসঘন মূর্তি নিতাই গৌরের মানস দর্শন লাভ করে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। বাংলার দুই প্রেমের ঠাকুর পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরোক্ষ আশীর্বাদেই ভক্ত সদস্যগণের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মহাসৌভাগ্যবতী রাণী রাসমণির স্মৃতি বিজড়িত ডাঙ্গা প্রাচীন মায়াপুরে একবিঘা জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় বাংলা ১৩৫৭ সালে (ইং-১৯৫০)।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম শ্রীঅক্ষয় কুমার মোদকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁর বৈবাহিক শ্রীনিতাই চরণ মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে মন্দির গৃহে ঠাকুরের মর্মর মূর্তি সংস্থাপিত হয় বাংলা ১৩৫৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে সেজন্য উক্ত দাতা ভদ্রেশ্বরে অবস্থিত একটি গৃহ-দালানও প্রদান করেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত নিমদহ নিবাসিনী শ্রীযুক্তা রাধারাণী ঘোষ মহাশয়া সমিতিকে প্রায় বিশ বিঘা জমি প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মূল ঠাকুর ঘরের সংলগ্ন গৃহ খানি নিমার্ণে ব্যয়ভার গ্রহণ করেণ শ্রীযাদব চন্দ্র রায় মহাশয়। সমিতির সভাপতি রেঙ্গুনের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মণিলাল কুণ্ডু মহাশয় বাংলা ১৩৬৪ সালে দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি চিকিৎসা ভবন নির্মাণ করে উহা সমিতিকে দান করেন। শ্রীমন্দিরে শাস্ত্র মতে যেমন ঠাকুরের নিত্যপূজার ভোগ, আরতি ইত্যাদি হয় তেমনি শ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমিতি আর্ত সেবার উদ্দেশ্যে একটি অ্যালোপ্যাথিক বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। উদার হৃদয় দানশীল ভক্তবৃন্দের অর্থানুকুল্যে ঠাকুর মন্দিরের সামনে একটি নাট মন্দির ও বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর জন্য গৃহনির্মিত হয়। ১৯৬৭ সালে দুঃস্থদের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও স্থাপিত হয়। অদ্যাবধি তা চলছে।

সমিতির আদি পর্বে শ্রদ্ধেয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিলেন সর্বশ্রী তুলসীদাস রায়, পূর্ণচন্দ্র বাগচী, সদানন্দ ভট্টাচার্য্য, অক্ষয় কুমার মোদক, শচীনন্দন গোস্বামী, নলিনী দেবী, শচীন্দ্র মোহন নন্দী, জগবন্ধু সান্যাল, রমেন্দ্র নাথ সান্যাল, বিনোদ বিহারী সাহা, অবনী নাথ ভাদুড়ী, করুণা চৌধুরী, ঈশানন্দ ব্রহ্মচারী, সুধাময় সেন, গঙ্গেশ ভট্টাচার্য্য, সতীশ চক্রবর্তী, নিতাই অধিকারী, গোকুল পোদ্দার, বুড়োদা, পশুপতি বিশ্বাস প্রমুখ।

আর্তের সেবার জন্য ঐ সময় একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। ডাঃ বলরাম প্রামাণিক মহাশয় বিনা পারিশ্রমকে ডাক্তার হিসাবে ও কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে দীর্ঘকাল সমিতির সেবা করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা ছাড়া সমিতির সেবামূলক কাজের মধ্যে প্রধান ছিল অসহায় অসুস্থ রোগীর সেবা করা। প্রয়োজন বোধে তাদের কলিকাতা বা অন্য

কোন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা। মেলা উপলক্ষে সমবেত লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা ও মৃতদেহ সৎকার করা। নবদ্বীপের কৃতি সন্তান সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীবিজয় কুমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত অ্যাম্বুলেন্সখানি রোগী বহন এর কাজে বিশেষ উপকারে আসে। বাংলা ১৩৪৪ সালে (ইং-১৯৩৭) বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, জেলা পরিদর্শক ও স্থানীয় পৌরসভার কাছ থেকে যে আর্থিক সাহায্য পেতেন তার সমুদয় অংশই বিদ্যালয়ের স্বার্থে ব্যয় করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ঐ সময় এক মাত্র অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। আজও ঐ বিদ্যালয় গোকুলানন্দ ঘাট রোডে অবস্থিত।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে শ্রীশ্রী ঠাকুর ও মায়ের অনুরাগী ভক্ত শিষ্যদের অনেকেই এই সমিতির সংস্পর্শে আসেন। সক্রিয় সহযোগী রূপে সর্বশ্রী মন্মথ নাথ রায়, স্বামী চিন্ময়ানন্দজী, জীতেন্দ্র মোহন সাহা, জ্ঞানেন্দ্র মোহন রায়, ডাঃ যোগেশ ভৌমিক, ডাঃ নরেন্দ্র মোহন সাহা, কিশোরী মোহন সাহা, ডাঃ প্রমথ নাথ গুহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উভয় বাংলার সহৃদয় কর্মী-দাতা-ভক্তগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বিশেষতঃ স্থানীয় সন্ন্যাসী চিন্ময়ানন্দজীর পরামর্শে এক সম্পাদক শ্রীমন্মথ নাথ রায়-এর উদ্যোগে ও তুলসী দাস রায় মহাশয়ের সমর্থনে সমিতির আর্থিক সংগতি ও সদস্য সংখ্যা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিপূর্বে বেলুড় মঠের ঈশানন্দ ব্রহ্মচারী সারদাচৈতন্য ও পরবর্তীকালে শ্রীমদন চন্দ্র রায় মহাশয় দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের সেবার কাজ করে সকলের শ্রদ্ধা ভাজন হ'ন। শ্রীদিগম্বর মণ্ডল, শ্রীঅমরেশ চন্দ্র দাস, শ্রীঅনিল প্রামাণিক প্রমুখ কর্মীরূপে দীর্ঘকাল এই সমিতির সেবা করেছেন বা করছেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় ও নির্দেশে—শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশোতম আবির্ভাব বর্ষ ও শ্রীরামকৃষ্ণের একশ পঞ্চাশতম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে ৮ই মার্চ, ১৯৮৬ থেকে ২১শে মার্চ ১৯৮৬—পর্যন্ত চোদ্দ দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও ভাবাদর্শ সম্পর্কিত চিত্রপ্রদর্শনী, চিকিৎসা শিবির, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি আয়োজিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিন আলোচনা, পাঠ ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী পরেশানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী কমলেশানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী মেধসানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী অনঘানন্দজী মহারাজ, ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ড. গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় ড. সচ্চিদানন্দ ধর, সাংবাদিক শ্রী প্রনবেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রী তাপস বসু প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কীর্তন ও ভজন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নবদ্বীপে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। ১০ই জুন' ৮৬ তারিখে সারাদিন ব্যাপী এক মহতী ভক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের উপস্থিতিতে। যুব সম্মেলনও গত ৭ই সেপ্টেম্বর' ৮৬তে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়েছে শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের উপস্থিতিতে।

নানান ঘাত প্রতিঘাত, উত্থান পতন-এর মধ্য দিয়ে সেবা সমিতি আজ 'সুবর্ণ-জয়ন্তী' বর্ষে পদার্পন করেছে। আরও বিভিন্ন উন্নয়ণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার চেষ্টা চলছে এই উপলক্ষে। এই সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সমিতি একটি স্মরণিকা প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, সর্বক্ষেত্রে সমিতি বেলুড় মঠের পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বন্যাজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ আশ্রম পরিদর্শনে সম্মতি দিয়েও আসতে পারেন নি। খুব শিগ্‌গীর তিনি আশ্রম পরিদর্শনে আসবেন, আমরা আশাকরছি। আমাদের এখন প্রতীক্ষা সেইদিনের জন্য। □

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি

প্রাচীন মায়াপুর। নবদ্বীপ। নদীয়া

বর্তমান পরিচালন সমিতি

□ **সভাপতি** □

শ্রীগৌরগোপাল সাহা

□ **সহঃ সভাপতি** □

ডাঃ সাগরবাসী সাহা শ্রীনিমাইচাঁদ মল্লিক

□ **সম্পাদক** □

শ্রীরামনারায়ণ ঘোষ

□ **সহঃ সম্পাদক** □

শ্রীঅমরেশচন্দ্র দাস

□ **কোষাধ্যক্ষ** □

শ্রীগোবিন্দহরি বসাক

□ **কার্যকরী সদস্য** □

ডাঃ কানাইলাল সাঁই, ডাঃ বলরাম প্রামাণিক, শ্রীবিমলবরণ সাহা, শ্রীনন্দলাল সাহা, শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত, শ্রীবিশ্বনাথ পোদ্দার শ্রীনিমাইচাঁদ সিংহ, শ্রীঅখিলচন্দ্র সাহা, শ্রীউমাপদ সাহা, শ্রীশ্যামসুন্দর মোদক, শ্রীতারকনাথ মুখার্জী, শ্রীবরুণচন্দ্র সাহা, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পোদ্দার, শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা, শ্রীমদনচন্দ্র রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

□ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়।

□ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৩।

□ অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা-১৪।

□ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর।

□ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি।

□ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা-২৬।

□ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, কলকাতা-২৯।

□ নবদ্বীপ পৌর প্রতিষ্ঠান।

□ নবদ্বীপ আরক্ষা বাহিনী।

□ গিরীন্দ্রনাথ দাস, রাণাঘাট, নদীয়া।

□ পুস্তক বিপণি প্রকাশন সংস্থা, কলিকাতা-৯।

□ রত্নাবলী প্রকাশন সংস্থা, কলিকাতা-৬।

□ বিজ্ঞাপন যাঁরা দিয়েছেন।

এবং

□ যাঁরা আমাদের নানাকাজে সাহায্য করেছেন বা করছেন।

পৌর-বিজ্ঞাপন

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও অকৃপণ সহায়তায় রাজ্যের পৌরসভা ও পঞ্চায়েতগুলো আগের তুলনায় অনেক বেশী জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত পৌরসভা তাদের ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছে নবদ্বীপ পৌরসভা তার মধ্যে অন্যতম।

জনগণের সার্বিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে যে উন্নয়নমূলক কাজ এই পৌরসভা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল : যেমন—

১. বহু রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার।
২. বহু টিউবওয়েল স্থাপন ও পুনঃস্থাপন।
৩. খাটা পায়খানার পরিবর্তে স্যানিটারী পায়খানা নির্মাণ। (পোর-ফ্লাশ)
৪. হরিজন কোয়ার্টার নির্মাণ।
৫. বিশাল বাস টার্মিনাস নির্মাণ।
৬. এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়,
৭. অফিস গৃহের সম্প্রসারণ।
৮. মাথাপিছু রেশন কার্ড বণ্টন।
৯. স্টেডিয়ামের জন্য জমি ক্রয়।
১০. টাউন হলের জন্যে জমি সংগ্রহ প্রভৃতি।

এছাড়াও সুপার-মার্কেট, আবাসিক গৃহ প্রকল্প, গভীর নলকূপ দ্বারা পানীয় জলের সুব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে যেগুলোর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে সর্বস্তরের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত কাম্য।

পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধে নবদ্বীপবাসীর সেবায়—

দি নবদ্বীপ কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৯)

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার আয়ত্তাধীন ইন্‌সিওর্ড ব্যাঙ্ক।

- বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় ও লাভজনক স্থায়ী, পৌনঃপুনিক (Recurring) সঞ্চয় প্রকল্প রয়েছে।
- আমানত বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে আমানত এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মতই সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা সহ সব রকম ব্যাঙ্কিং কাজ-কর্ম করা হয়।
- সম্পত্তি বন্ধক, স্বর্ণালঙ্কার ও Govt Approved Security আবদ্ধ রেখে কর্জ্জ দেওয়া হয়ে থাকে।

'যার বিশ্বাস আছে, তার সব আছে।
যার নেই তার কিছুই নেই।'

—শ্রীরামকৃষ্ণ
